

হোমান্সিমা

ডো না ল্ড সা সু ন

‘অসাধারণ ... আমি বইটি পড়ে একেবারে মুগ্ধ
এবং বিনোদিত হয়েছি ... খুবই উচ্চমানের’

—সানডে টাইমস বুকস অব দি ইয়ার

অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন



কায়রোতে জন্ম নেয়া ডোনাল্ড
সাসুন-এর শিক্ষাজীবন
কেটেছে প্যারিস, মিলান,
লন্ডন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।
বর্তমানে তিনি লন্ডনের কুইন
মেরি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা
করছেন। তাঁর অন্যান্য
বইয়ের মধ্যে কনটেম্পোরারি
ইটালি: পলিটিক্স, একোনমি
এ্যান্ড সায়েন্স-১৯৪৬ এবং
ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ারস অব
সোশালিজম উল্লেখযোগ্য।
তাঁর মোনালিসা ২০০২ সালে
সানডে টাইমস্-এর বর্ষসেরা
বই নির্বাচিত হয়েছিলো।



হোমান্সিমা

ডো না ল্ড সা সু ন

অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন



বাতিঘর প্রকাশনী

মোনালিসা

মূল : ডোনাল্ড সাসুন

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

MonaLisa

copyright©2006 by Donald Sasun

অনুবাদস্বত্ব © ২০০৬ বাতিঘর প্রকাশনী

তৃতীয় সংস্করণ : মার্চ ২০০৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৬

প্রচ্ছদ : ডিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা),
ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ :
একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-
১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০;
কম্পোজ : তিথী

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

এই বইয়ের আইডিয়াটি ১৯৯৮ সালের ত্রিসমাসে আমার বন্ধু হিলারি বোকার এবং বাসেম আবদাল্লাহর বাড়িতে ডিনার খাওয়ার সময় আলোচিত হয়েছিলো। শুরুতে আমার মনে হয়েছিলো এই বিষয় নিয়ে একটি টেলিভিশন ডকুমেন্টারি নির্মাণ করবো। আনা কুটের উপদেশ শুনে এটাকে একটা বইয়ে রূপান্তরিত করে ফেললাম। যথারীতি তার ধারণাই ঠিক প্রমাণিত হলো। খসড়া পাণ্ডুলিপি দেখে দেখার জন্য তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

বইটির রূপরেখা ১৯৯৯ সালে লন্ডনের ইটালিয়ান কালচারাল ইন্সটিটিউট-এ লেকচার হিসেবে 'পরীক্ষা' করা হয়েছিলো। ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টরের কাছে এজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আমাকে অসংখ্য পত্রপত্রিকার ক্রিপিংস, পোস্টকার্ড এবং অন্যান্য প্রমাণ পত্র সংগ্রহ করে দেবার জন্যে আমি আমার বন্ধুবর্গ এবং আত্মীয়স্বজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি : বিল বার্টলার, রুবি কুট, এ্যানি ডেভিস, বিয়েত্রিচ দ্য গালোর্নি, ইলারিয়া ফাব্রেস্তো, জিল ফর্বস, সারা গ্যালভি, জামিলা গ্যাভিন, নাতাশা গোম্যান, পিয়া লোকচেল্লি, সিলভানা সিদেলি মেন্চি, টোবি মান্ডি, এ্যান শোট্যাক সাসুন, জো এবং জেরিস সাসুন, অনিয়া সাসুন, ভেলেন্তিনা তান্দের্লি, সারাহ টাকার, মনিকা ব্রেকফেল, গ্যাব্রিয়েলা তুরনাতুরি এবং লরা ভোগ্‌রা।

আমি আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার পুরনো বন্ধু, ইতালির প্রখ্যাত Psephologist রেনাতো ম্যানহাইমারকে, আমার জন্যে বিখ্যাত পেইন্টিংয়ের ব্যাপারে ইতালিয় ধারণার ওপর জরিপ আয়োজন করেছে সে। লুভর মিউজিয়ামের সাহায্য ছাড়া আমি এই বইটি লিখতেই পারতাম না। আমি এর ডিরেক্টর জ্যাক ফোকার্তকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। আরো অসংখ্য ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কাছে আমি ঋণী, যা বলে শেষ করা যাবে না। তাদের সবার কাছেই আমি অশেষ কৃতজ্ঞ।

ডোনাল্ড সাসুন

লন্ডন, নভেম্বর ২০০০

তৃতীয় সংস্করণে অনুবাদকের কথা

প্রথমেই আমি আমার সম্মানিত পাঠবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি দ্য দ্য ভিক্স কোড-এর বাংলা অনুবাদ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করার জন্যে। পাঠকের অভূতপূর্ব সাড়া আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

নিয়মিত অনুবাদ ক'রে থাকলেও আমি প্রথমত একজন পাঠক। চেষ্টা করি বিশ্বমানের সৃষ্টিগুলো পড়ার। ডোনাল্ড সাসুনের *মোনালিসা* প'ড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এ রকম একটি বই এ দেশের পাঠকের কাছে পৌছানোর জন্যে এবং নিজের মনে লালায়িত একটি স্বপ্নপূরণের অংশ হিসেবে *মোনালিসা* অনুবাদ করেছি, কেননা চিত্রশিল্পী হবার ইচ্ছে নিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছিলাম। নানা কারণে সেই পাঠ চুকানো সম্ভব হয় নি; শেষ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করি।

শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে চিত্রকলার প্রতি আমার দুর্বলতা রয়েছে স্বাভাবিক কারণেই, যে জন্যে অনুবাদের পাশাপাশি *ডিলান ছদ্ম* নামে বইয়ের প্রচ্ছদ ক'রে আসছি নিয়মিত।

আমার বিশ্বাস ডোনাল্ড সাসুনের *মোনালিসা* পাঠকের ভালো লাগবে। সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

২৮.০৩.২০০৯

ঢাকা

উৎসর্গ :

আনা এবং তার হাসিকে

সূচী

- প্রথম অধ্যায় : মোনালিসা, হাসি এবং লিসা /১১
- দ্বিতীয় অধ্যায় : একটি বৈপ্রবিক চিত্রকর্ম /৪৩
- তৃতীয় অধ্যায় : লিসার নুভরের প্রবেশ /৫৭
- চতুর্থ অধ্যায় : লিওনার্দো ভক্তি /৭২
- পঞ্চম অধ্যায় : রহস্যময়ী হয়ে উঠলো মোনালিসা /১০৫
- ষষ্ঠ অধ্যায় : যুগের দৃশ্যগত রুচি হিসেবে মোনালিসা /১৩৯
- সপ্তম অধ্যায় : মোনা অপহরণ /১৬৬
- অষ্টম অধ্যায় : চুরির ঘটনা কাজে লাগানো /১৮৫
- নবম অধ্যায় : পপ সংস্কৃতিতে লিসা /২০৬
- দশম অধ্যায় : লিসার বিশ্বযাত্রা /২২১

নোট /২৫১

প্রথম অধ্যায়

মোনালিসা, হাসি এবং লিসা

এক তরুণী বসে আছে, তার ডান হাত রয়েছে বাম হাতের কজির ওপর আর কাঠের চেয়ারের হাতলের প্রান্ত ধরে আছে বাম হাত। চেয়ারের হাতলটা আছে ছবির ফ্রেমের সমান্তরালে, তরুণীর দেহের নিম্নাংশ দেখা যাচ্ছে না। সে যদি সোজা হয়ে বসতো, তবে আমরা কেবল তার উর্ধ্বাংশই দেখতে পেতাম। কিন্তু সে চেয়ে আছে আমাদের দিকে, তার উর্ধ্বাঙ্গের তিন-চতুর্থাংশ দেখা যাচ্ছে। সাদা মুখটা প্রায় সরাসরি আমাদের দিকে ফেরানো। তার বাদামি চোখের দৃষ্টি ডান দিকে। তার অদৃশ্য ভুরু প্রশস্ত কপালটাকে আরো বড় করে তুলেছে। তার গণ্ডদেশ ভরাট। কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা কেশরাশি ঈষদচ্ছ অবগুষ্ঠনে আবৃত। তার পরনে গভীর গাঢ় বর্ণের পোশাক। বাম কাঁধ পুরু ভাঁজওয়ালা আঙুরাখায় সজ্জিত। কণ্ঠরেখার দিকে দেখা যাচ্ছে তার স্তনের আভাস।

সে কোনো গয়না পরে নি।

সে মুখ টিপে হাসছে।

যে বেলকনির উপর সে আছে সেটা কোনো খাদের কিণারায় ঝুলছে বলে মনে হয়। তার ঠিক পেছনেই, নিচু পাঁচিলের পেছন দিকে উদ্ভাসিত হয়েছে একটা জটিল, অদ্ভুত আর দূরবর্তী ভূদৃশ্য : পাথুরে গঠন, পার্বত্য চূড়া, পাহাড় এবং উপত্যকা; বাম দিকে একটা হ্রদ আর আঁকাবাঁকা একটা পথ; ডান দিকে একটা নদী, নদীর ওপর একটা সেতু, নিষ্ফলা ভূমিতে জনমানবহীনতার পরিত্যক্ত চিহ্ন।

এক ঋণ পপুলার কাঠের ওপর তেল রঙে এই ছবিটি আঁকা হয়েছে। জিনিসটা ছোটো : ৭৭ সেন্টিমিটার উঁচু আর ৫২ সেন্টিমিটার চওড়া। লুভার জাদুঘরের সংগ্রহশালায় এই ছবিটার নম্বর দেয়া হয়েছে ৭৭৯, বর্তমানে সেখানে সংরক্ষিত ৬ হাজার তৈলচিত্রের মধ্যে অন্যতম এটি। কিন্তু শুধু এটার

বেলাতেই বিশেষ একটি প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটা বসানো হয়েছে কংক্রিটে এবং সুরক্ষিত দুই খণ্ড বুলেট প্রফ ট্রিপল-লেমিনেটেড কাঁচের পেছনে, কাঁচগুলো পরস্পর থেকে ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থিত। ১৯৭৪ সাল থেকে তৈলচিত্রটি এই বাক্সের মধ্যেই রয়েছে।

প্রতি বছর একবার এটা পরখ করে দেখা হয়; তাপমান ঠিক রাখতে পাল্টানো হয় ব্যবহৃত সিলিকা জেল; সংকুচিত বা প্রসারিত হয়েছে কি না তা জানতে কাঁচগুলো পরীক্ষা করা হয় নিয়মিত।

২০০৩ সালে, এর পাঁচশ' বছর পূর্তির সময় ৭৭৯ নম্বর তৈলচিত্রটির জন্য একটা আলাদা কক্ষ বরাদ্দ করা হয়, সেখানে আর কোনো ছবি নেই। তার আগে পর্যন্ত সেটা ছিলো অন্যান্য ভেনিসিয় তৈলচিত্রের সঙ্গে, যেগুলোর মধ্যে ছিলো তিতিয়ানের ১০টি, ভেরোনেজের বিশাল ম্যারিজ অ্যাট কানাসহ ৮টি এবং তিনতোরেস্তোর ৫টি তৈলচিত্র। ঠিক বাইরেই, গ্র্যান্ড গ্যালারি'র দেয়াল জুড়ে লিওনার্দো দা ভিন্সির পাঁচটা তৈলচিত্র—এই গ্যালারিটাই শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর জন্য ইউরোপের সবচেয়ে দীর্ঘতম করিডোর হিসেবে বিখ্যাত। লিওনার্দো দা ভিন্সি ছাড়া এখানে আছে রাফায়েল, ব্রনজিনো, করেজ্জিও, ফ্রা আনজেলিকো এবং কারাভাজ্জিওর বিভিন্ন তৈলচিত্র। দর্শনার্থীরা আরও খুঁজে পাবে ডেলাজকুয়েজ, দ্যুরার, ভ্যান আইক, ভারমিয়ার প্রমুখের ছবি—রুবেন্স, পোসাঁ, রেমব্রান্ট ও গয়া'র কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।

গ্রীষ্মের ভর-মওসুমে প্রতি বছর যে ৫৫ লাখ দর্শক লুভর পরিদর্শনে আসে, তাদের যে কেউ সবচেয়ে প্রশংসিত পশ্চিমা শিল্পগুলোর মধ্যে এইসব কাজ অবসরে নিবিষ্ট মনে অবলোকন করতে পারে। সবগুলোই, শুধু ৭৭৯ নম্বর তৈলচিত্রটি বাদে, ফরাসি ভাষায় যেটা লা জোকোন্দে (*La Joconde*) এবং ইতালিতে লা গিওকোন্দা (*La Gioconda*) আর দুনিয়াব্যাপী মোনালিসা (*Mona Lisa*) নামে পরিচিত। ধারণা করা হয় এটি ফ্লোরেন্সের একজন লেডি ও ধনী সওদাগর ফ্রানসেস্কো দেল জিওকোন্দোর স্ত্রী লিসা গেরার্দিনির প্রতিকৃতি। তাকে মোনালিসা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারতো, কারণ Monna হচ্ছে Madonna mia donna-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, যার অর্থ my lady. Mona বানানটা আসলে ভুল, তবে ইংরেজি ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, সুতরাং আমি আগাগোড়া এ বানানই ব্যবহার করবো।

দূর থেকে এই প্রতিকৃতি নিবিষ্ট মনে অবলোকন করার সমস্যা হলো প্রচণ্ড ভীড় (গ্রীষ্মকালে পঞ্চাশের বেশি), সবাই প্রতিকৃতিটা এক নজর দেখার চেষ্টা করে আর ছবি তুলতে চায়। ক্যামেরার ফ্ল্যাশের প্রতিফলন এতো ঘন ঘন

কাঁচের গায়ে লেগে ঠিকরে আসে যে তাতে শিল্পকর্মটি খুঁটিয়ে দেখা আরও অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় অপ্রস্তুত কোনো দর্শনার্থী ওই কামরায় প্রবেশ করে এমন ভীড় দেখে ধারণা করতে পারে, এই উত্তেজনার উৎস কোনো তৈলচিত্র নয় মোটেও; নিশ্চয় সিনেমা, টেলিভিশন, ফ্যাশন বা সঙ্গীত ভূবনের কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির কারণেই এ হৈচৈ। কিংবা রাজপরিবারের বড় কোনো সদস্য। মিউজিয়ামের নিয়ম হলো কোনো একক তৈলচিত্রের সামনে ৩০ জনের বেশি দর্শক দাঁড়াতে পারবে না, কিন্তু এ নিয়ম মোনালিসার বেলায় সব সময়ই উপেক্ষিত হয়। অন্য তৈলচিত্রগুলোর ক্ষেত্রে এ নিয়ম খুব কমই প্রয়োজন হয়। পর্যটকরাও ফ্যাশ ফটোগ্রাফি ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে। মনে হয় যেনো তাদের প্যারিস ভ্রমণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মোনালিসার একটা ছবি তোলা। এর জন্য তারা রক্ষীদের অগ্রাহ্য করতেও প্রস্তুত থাকে, আর রক্ষীরাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের থামানোর চেষ্টা থেকে বিরত থাকে।

অন্য কোনোও তৈলচিত্রের বেলায় এমনটা ঘটে না। শূভরের আর কোনো শিল্পকর্ম এমন কৌতূহল আর ভক্তির বিষয় হতে পারে নি, এমন কি ভেনাস দ্য মিলো এবং ভিষ্টরি অব স্যামোথ্রেস হিসেবে পরিচিত গ্রিক ডায়র্কর্ষও—যদিও এগুলো মিউজিয়ামের টুরিস্ট ম্যাপে ও সাইনপোস্টে মোনালিসার সঙ্গে অবস্থান ভাগাভাগি করে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে, অবশ্য সুযোগ শব্দটা যদি উপযুক্ত হয়। বিশ্বের আর কোনো বড় মিউজিয়াম এমন আর কোন ছবি প্রদর্শন করতে পারে না জনপ্রিয়তায় যা অন্যসব ছবিকে ছাড়িয়ে যায়। এমন কি ফ্লোরেন্সের উফিজিতে বসিচেল্লি *Birth of Venus*, আমস্টারডামের রিক মিউজিয়ামে রেমব্রান্টের *Night Watch*, অথবা মাদ্রিদের প্রাদোয় ভেলাজকুয়েজের *Las Meninas* ইত্যাদিও এমন মর্যাদা পায় না। এমন কি ভ্যাটিকানে সিস্টিন চ্যাপেলের ধনুকাকৃতির ঝিলানে সৃষ্টি, মহাপ্রাবন ও শেষ বিচার বিষয়ক মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর অতি চমৎকার কাজও এই গম্ভীর পোশাক পরা অপরিচিত নারীর প্রতিকৃতিটির ব্যাপক কল্লনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

মোনালিসা কেন সারা দুনিয়ায় সবচেয়ে সুপরিচিত তৈলচিত্র? তার অবয়বের কিছু অংশ এক নজর দেখেও যেমন তার সিলুয়েট, তার চোখ, হয়তো তার হাত দুটোই—যে কোনো মানুষ তৎক্ষণাৎ চিনতে পারে, যাদের এই তৈলচিত্রটির প্রতি আকর্ষণ নেই তারাও। বিজ্ঞাপনে এর বাণিজ্যিক ব্যবহার যে কোনো শিল্পকর্মের চেয়ে বহু দূর ছাড়িয়ে গেছে।

শিল্পের ইতিহাসবিদ, কবি ও অনুরাগীরা সহজাত বিচারের মান উল্লেখসহ

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে মোনালিসা'র স্থান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তারা যুক্তি দেখান এই তৈলচিত্রটির ভেতরে এমন কিছু আছে যা আমাদের সবার সাথে কথা বলে, যা উন্মোচিত করে অনুভূতি, আবেগ ও স্বীকৃতি। এই আইডিয়ার উদ্ভব উনিশ শতকের শুরুর দিকের রোমান্টিকদের কাছ থেকে, যদিও এর নজির ছিলো। এখনও অনেক আধুনিক, এমন কি 'উত্তর-আধুনিক' শিল্প-সমালোচকের অবস্থান এখানেই।

শিল্পের ইতিহাসবিদ কেনেথ ক্লার্ক ১৯৭৩ সালে লিখছেন, অন্য আর সবকিছুর চেয়ে বরং অভ্যন্তরীণ গুণের জন্যই মোনালিসা এমন বিখ্যাত এই মত তিনি মানতে পারেন না। কোটি কেটি মানুষ আছে, তিনি ব্যাখ্যা করেন, যারা জীবনে শুধু একটিমাত্র ছবির নামই জানে—সেটি মোনালিসা। এটা ব্যাপক প্রচারণার কারণে ঘটে নি, তিনি যুক্তি দেখান। এর অর্থ হলো, এই অদ্ভুত ভাবমূর্তি এমন এক শক্তিতে অবচেতনে আঘাত করে যা একক কোনো শিল্পকর্মে ভীষণভাবে দুর্লভ। অবচেতন থেকে উঠে আসে প্রাচীন সব প্রতীক আর অব্যাহতভাবে এটা স্পর্শ করে চলে। মোনালিসা তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিককালের সৃষ্টি যার রয়েছে অতিপ্রাচীন শিল্পকর্মের ঐন্দ্রজালিক শক্তি।^২

কেনেথ ক্লার্কের শিল্প-ইতিহাসের ধারণা এখন এক রকম পুরনো কেতার ব'লে বিবেচিত হয়। 'উত্তর-আধুনিক' পল বারোল্‌স্কির ক্ষেত্রে বিষয়টা আরেক রকম। ১৯৯৪ সালে তিনি মোনালিসা'র যে জিনিসটা আমাদের ধরে রাখে তার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে শিল্পী লিওনার্দোর প্রকরণের উল্লেখ করেন, যা অঙ্গ বিন্যাস ও নিগূঢ়তার বোধ তৈরি করে।^৩ শিল্পী, তিনি যোগ করেন, বর্ণনা করেন 'মডেলের অন্তর্মুখীতা, তার মন কিংবা আত্মার...বোধ, তার সঞ্জীবনী।' এ সবকিছু অর্জিত হয়েছে তার নিঃশব্দ হাসি আর দৃষ্টিপাতের শক্তিতে। তার শান্ত হাসি তাকে এমন স্থানে বসায় যা দর্শকের চেয়ে উচ্চতর। আমরা তাকাই তার দিকে। তার উচ্চতর অবস্থান আরও বেড়ে যায় পটভূমির ভূদৃশ্যের কারণে। যদিও পাহাড়-পর্বত তার চেয়ে অনেক বেশি বড়, তবুও মোনালিসা অবস্থান তার চেয়েও বড় ব'লে মনে হয়। ছোটো হলেও, যেমনটা মন্তব্য করা হয়েছে প্রায়ই, এটা একটা মনুমেন্টাল ছবি। অন্যদিকে অসংখ্য উনিশ শতকী ভাস্কর্যকারের মতো বারোল্‌স্কিও মনে করেন, 'স্বর্গীয় মহিমাময় ব্যক্তির মতোই প্রগাঢ় তার স্থির দৃষ্টি।' মোনালিসা'কে মাঝে মাঝে যে ধর্মনিরপেক্ষ *Madonna* বলা হয়েছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।^৪ আমাদের সংস্কৃতিতে এই নির্দিষ্ট তৈলচিত্রটির কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান এভাবে একটা সরল কিন্তু বিপুল সম্ভারক পন্থায় ব্যাখ্যা করা যায়, মোনালিসা কর্তৃত্বপূর্ণ কারণ সে

কর্তৃত্ব করে দর্শকের উপর। আমরা যতো না তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাই তার চেয়ে অনেক বেশি স্থির দৃষ্টিতে সে আমাদের দিকে থাকায়। সে যতোটা না আমাদের মনোযোগের বিষয় তার চেয়ে আমরা অনেক বেশি তার মনোযোগের বিষয়।

মোনালিসা'র দিকে তাকিয়ে থাকা লোকজনের ভিড়ের দিকে কয়েক ঘন্টা তাকিয়ে থেকেছে এমন যে কোনো ব্যক্তি এ ব্যাপারে একমত হবে। তার বস্ত্রের ভেতর, কাঁচ ও দেহরক্ষীদের দ্বারা সুরক্ষিত, তার দর্শনার্থীদের অদ্ভুত আচরণ এবং তাকে ভালোভাবে দেখার জন্য তাদের বিশৃঙ্খলা ঠেলাঠেলি থেকে তাকে অচঞ্চলভাবে পৃথক ও পরিহাসময় মনে হয়। আমার মনে হয় পুরাণের মায়ায় অভিভূত হওয়ার ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া উচিত। প্রতিটি মাস্টারপিসের মধ্যেই একটা আইডিয়া থাকে যা শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে জীবন্ত থাকে আর অনির্ণেয় কিছু কথা বলে আমাদের কাছে যা বলে এসেছে পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছেও। এটা কল্পনা করা অবশ্যই প্রচণ্ডভাবে সুখকর যে, যখন আমরা অন্য আর কিছুই নয় শুধু আমাদের 'সহজাত' শৈল্পিক ভাবপ্রবণতা নিয়ে লিওনার্দো, রাফায়েল ও অতীত যুগের অন্যান্য মহান শিল্পীর কাজের দিকে মুখ ফেরাই, কিংবা যেমন আমরা ভিড়ের মধ্যে কিন্তু একা একটা কনসার্ট হলে বসি আর সুরলহরি গুনি 'স্বর্গীয়' মোজার্টের, তখন একটা রহস্যময় অথচ প্রায় অনুভবযোগ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মৃত মাস্টার জীবন্ত হয়ে ওঠেন, আর কথা বলেন আমাদের সঙ্গে, আমার সঙ্গে, সরাসরি, মধ্যস্থতাহীন, তার মহত্ব আরও একবার দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিপন্ন হয়, কারণ আমি, এতোটা ভিন্নতা ও দূরত্ব সত্ত্বেও, শ্রেণী বর্ণ ভাষা আর সময়ের পার্থক্য সত্ত্বেও, সংযোগ স্থাপন করি এই মহান স্রষ্টার সঙ্গে।

তবুও, মোনালিসা অথবা অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পকর্মের সামনে এসে যারা দাঁড়ায় তাদের অনেকেই খানিকটা অস্থির বোধ করে। বিংশ শতাব্দির কেতা অনুযায়ী সে সুন্দরী নয় আর যৌন-আবেদনময়ী তো নয়ই। এই তৈলচিত্রটি আড়ম্বরপূর্ণ কিছু নয়, অথবা দেলাক্রোয়োর *Liberte guidant le peuple* শীর্ষক তৈলচিত্রটির মতো রাজনৈতিক অনুপ্রেরণাও নেই এর। কোনো রক্তারক্তি নেই, সহিংসতা নেই। এটা কোনো কাহিনীও বিবৃত করে না। শুধুই হাসিমাখা মুখের এক সাদামাটা নারী।

কয়েক সপ্তাহ তার (অথবা এর) দর্শকদের মন্তব্য খেয়াল করে শুনে গভীর এক হতাশা ধরা পড়বে। তারা এটা স্বীকার করে যে এই ফ্লোরেন্টাইন রমণীর বিখ্যাত প্রতিমূর্তিটি আঁকতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োগ করা হয়েছে।

কিন্তু তারা এর নিমার্ণের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক অর্থ স্বীকার করতে চায় না। তথ্যের অভাব বিষয়টাকে আরো চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারে, তারা প্রশ্ন করতে পারে, 'কেন সে?' কেন তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র একটা তৈলচিত্র নিয়ে এমন অবিশ্বাস্য হৈ চৈ হবে?

আরো শিল্পকর্ম আছে যা চিরন্তন হতে পারে, এই চেতনায় যে, সেগুলোকে এখনও ভালোবাসা হয়, উপভোগ করা হয় এবং সেগুলোর ধারণা আত্মস্থ করা হয় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সেগুলো সারা পৃথিবীর লাখ লাখ মানুষের তাত্ক্ষণিক স্বীকৃতি লাভ করে। সেগুলো শুধু নিজেদের কালের কথাই বলে না—তুলনামূলকভাবে তাদের সময়কার অতি মুষ্টিমেয় দর্শকদের কথা যাদের জন্যই সেগুলো ধারণ করা হয়েছিলো—বরং আরও পরের বিশ্বের কথাও বলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বলে, আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে সংযুক্ত গণসমাজের কথা বলে, যে সমাজের কথা সেগুলোর স্রষ্টারাও ভাবতে পারে নি।

এটা অবশ্যই মূল্যবান, কারণ এমন চিরন্তন আবেদন সেই পদ্ধতি থেকে পৃথক করা যায় না যা মহান শিল্পকর্মের বিস্তারণ ঘটায় এবং সেগুলোর অনুরণন ছড়িয়ে দেয় যে কেউ বলতে পারে এসব শৈল্পিক কাজের সাফল্য নিশ্চিত আছে একমাত্র, অথবা প্রধানত, কাজের মধ্যে এসব অসংখ্য মাস্টারপিসের পশ্চিমা উৎস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভের এবং সেগুলোর যথাযথ রাজনৈতিক আদর্শগত ও প্রায়ুক্তির সহযোগিতা দরকার হয়।

এই অবলোকন ব্যতিক্রমহীন। আমরা জানি মোজার্ট শুধু ভিয়েনাতেই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তাই নয়, বরং তাকে প্যারিস, লন্ডন এবং প্রাগেও মহিমামণ্ডিত একজন হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আজকের মতো তিনি এতোটা ব্যাপকভাবে পরিচিত হতে পারতেন না যদি রেকর্ডিংয়ের যন্ত্রপাতি, ফিল্ম, মিউজিক, বিজ্ঞাপনী জিঙ্গেল ইত্যাদির উদ্ভব না হতো এবং তাকে নিয়ে নাটক এবং চলচ্চিত্র তৈরি করা না হতো। পর্যাপ্ত প্রায়ুক্তিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা ছাড়া মোজার্ট মহান বিশ্বজনীন শিল্পী 'মোজার্ট' হতে পারতেন না।

মহৎ শিল্পকর্মের মার্কেটিং প্রয়োজন—এই ধারণার বিরোধিতা বোধগম্য। মার্কেটিং শব্দটা শুনতে যেমন অস্বস্তিকর, তেমনি মনে হয় এর মধ্যে একটা ষড়যন্ত্রও আছে। একদল লোককে এটা প্রভাবিত করে যারা অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থে পণ্য অথবা মানুষকে সুপরিচিত করে তোলার দায়িত্ব নেয় এবং প্রশংসা আর গুণকীর্তনে মগ্ন হয়ে পড়ে। এতে প্রতীয়মান হয় যে লোকজনকে নিজের পক্ষে সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা বা তাদের রুচি নির্ধারণ করে দেয়া যায় এবং সবচেয়ে তুচ্ছ শিল্পকর্মকেও রূপান্তরিত করা যায় বিশ্বজনীন মাস্টারপিসে।

আমি এটা বিশ্বাস করি না। মার্কেটিংয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজন সেটাই বেছে নেয় যা ইতিমধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছে, বড়জোর তারা সেই খ্যাতি আরো বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারে। তারা সুদৃঢ় করে তবে তা নতুন করে প্রবর্তনার মতো কোনো ব্যাপার নয়। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতো আমিও এই ধারণা করি যে, কোনো মাস্টারপিসের প্রসিদ্ধি নির্ভর করে একটা জটিল ঐতিহাসিকদের স্থির ঘটনার উপর, বিভিন্ন ঐতিহাসিক সংস্থার (যেমন লোকজন, প্রতিষ্ঠান, প্রক্রিয়া) অংশগ্রহণ ভিন্ন ভিন্ন পরিসমাপ্তির জন্য ব্যাপকভাবে অপরিকল্পিত কিংবা অসচেতনভাবে কাজ করে। আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো কিভাবে এমন সব শক্তি মোনালিসাকে বিশ্বের সুপ্রসিদ্ধ তৈলচিত্রে পরিণত করেছে। শৈল্পিক খ্যাতির প্রতিযোগিতায় একটা কাজ কিভাবে জিতে যায় সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে এই বই।

মোনালিসা এই অবস্থান দাবি করে কি না সে বিচারের ভার আমি সানন্দে পাঠকের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। আমার কাজ হলো কেন নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা ঘটলো আর অন্যগুলো ঘটলো না তা ব্যাখ্যা করা। কোন্টা কোন্টার চেয়ে ভালো এবং কেন তা প্রতিষ্ঠা করা আমার কাজ নয়।

উনিশ শতকেই মোনালিসা সাংস্কৃতিক অভিজাতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শৈল্পিক প্রবাহের অংশ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আগে যা ছিলো মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জানা ও দেখার বিষয়, বিংশ শতাব্দীতে এসে তা পরিণত হলো কোটি কোটি মানুষের সম্পদে। গণমাধ্যমের উন্নতি, সাময়িক পত্রিকা, চলচ্চিত্র, বেতার, টেলিভিশন এবং বিজ্ঞাপন শিল্পের সহগামী সম্প্রসারণ এই উঁচু সংস্কৃতিকে নজিরবিহীনভাবে পরিকীর্ণ করে তুলেছে—এবং সে কাজ করতে গিয়ে এটাকে বদলেও ফেলেছে। সিনেমা এবং টেলিভিশন উপন্যাসের কাহিনী রূপায়ন করেছে সরাসরি—বিশেষ করে উনিশ-শতকী লেখকদের উপন্যাস, যেমন ভিক্টর হুগো, বালজাক, জেন অস্টেন, চার্লস ডিকেন্স, ম্যানজোনি, মেলভিল, তলস্টয়, গ্যোয়েতে—কিংবা সেগুলোর পুট অবলম্বন করেছে।

অন্যদিকে বিজ্ঞাপনের কল্যাণে রেনেসাঁ যুগের মাস্টারপিস, ইমপ্রেশনিষ্ট আর পোস্ট-ইমপ্রেশনিষ্ট শিল্পকলা এবং পিকাসো থেকে দালি এবং ওয়ারহল পর্যন্ত আধুনিক শিল্পের এক নতুন দর্শক শ্রেণী গড়ে উঠেছে। তেমনি মোজার্ট, বাখ, ভের্দি, রসিনি ও বিথোফেনের সঙ্গীত বিজ্ঞাপনী জিসেলে ব্যবহৃত হওয়ায় তা অসংখ্য নতুন শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

মোনালিসার বিশ্বব্যাপী পরিচিতি এটাকে গণসংস্কৃতির অংশে পরিণত করেছে। যদিও প্রশ্নাতীত যে, একটা উঁচু সংস্কৃতিজাত এই তৈলচিত্রটি

এঁকেছেন রেনেসাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন শিল্পী, এটা কিনেছেন ফ্রান্সের রাজা, আর সারা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ একটি নগরীর সবচেয়ে বিখ্যাত মিউজিয়ামে এটা শোভা পাচ্ছে।

সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়িয়ে গেছে এই শিল্পকর্মটি। ১৫৬৮ সালে এটাকে একটা মাস্টারপিস হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন লিওনার্দোর সমকালীন চিত্রকর ও ইতিহাসবিদ গিওর্গিও ভাসারি : ‘শিল্পের মাধ্যমে প্রকৃতিকে কতোটুকু অনুকরণ করা যায় তা জানতে যিনি ইচ্ছুক, এই মুখটার দিকে তাকালে তৎক্ষণাৎ তিনি সেটা জানতে পারবেন...প্রত্যেকেই স্বীকার করবে এই তৈলচিত্রের কর্মসম্পাদন সবচেয়ে শক্তিশালী শিল্পীকেও ভয়ে কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।’^৬ সাড়ে চার শতাব্দী পর এ ছবির প্রশংসায় শিল্প-ইতিহাসবিদ আর্নস্ট গমব্রিচ লেখেন : ‘একটা জীবন্ত (মোনালিসা) সত্তার মতো মনে হয়, সে আমাদের চোখের সামনেই বদলে যায় আর যতোবার আমরা তার কাছে ফিরে আসি ততোবারই তাকে একটু আলাদা ব’লে মনে হয়...এসব কথা হয়তো রহস্যময় শোনাবে, আসলেই তাই; মহান শিল্পকর্মের ক্রিয়া সচরাচর এ রকমই হয়।’^৭

যারা সভ্যতা সংস্কৃতির আসন্ন সমাপ্তি নিয়ে উচ্চস্বরে বিলাপ করে তারা এখানে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে। নিখুঁত সাংস্কৃতিক প্রত্যয়যুক্ত শিল্পকর্ম অত্যন্ত জনপ্রিয় হতে পারে। এই বইয়ের জন্য ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইতালিতে একটা জরিপ চালিয়েছিলো ইন্সটিতুতো পের গ্লি স্তাদি সাল্লা পাবলিকা ওপিনিওনে। তাতে যা অনুমান করা হয়েছিলো তার চেয়ে বেশি মাত্রার জনপ্রিয়তা প্রকাশ পায়। এ জরিপ চালানো হয় এমন এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে, বিশ্বের মহোত্তম আর সুপরিচিত কিছু শিল্পকর্মের মধ্যে যাদের বসবাস।^৮ তাদের কাছে খোলামেলা প্রশ্ন ছিলো, ‘বিশ্বের সবচেয়ে সুপরিচিত তৈলচিত্র কোনটি ব’লে আপনি মনে করেন?’ যারা উত্তর দিয়েছে তাদের মধ্যে ৮৫.৮ শতাংশ বলেছে মোনালিসা। ৩.৮ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে ভ্যান গগের সানফ্লাওয়ার্স; তৃতীয় স্থান পেয়েছে বস্তুচেল্লির স্প্রিং (২.১ শতাংশ)। চতুর্থ স্থানের ক্ষয় (২.০১ শতাংশ)।

১৯৭৪ সালে ফ্রান্সে চারুকলার ছাত্রদের মধ্যে একটা জরিপ চালানো হয়। দশটা নির্বাচিত তৈলচিত্রের মধ্যে ‘সেরা’টি বেছে নিতে বলা হয় তাদের। এবার মোনালিসা’কে বাদ দেয়া হ’লে ভ্যান গগ শীর্ষে উঠে আসেন, তারপর যথাক্রমে পিকাসো এবং গৌইয়া।^৯

১৯৮৪ সালে প্যারিস-ম্যাচ পত্রিকা লুভর মিউজিয়ামের তৈরি করা একটি তালিকা থেকে লুভরে সংরক্ষিত কোন্ তৈলচিত্রটি তাদের প্রিয় তা নির্বাচন করতে বলে তার পাঠকদের। এতে শীর্ষে স্থান পায় *Joconde*, এর পরের স্থানটি পায় রাফায়েলের *বালদিসারে কাস্তিলিওনে* (যার ভঙ্গিমাটা *মোনালিসা*’র দ্বারা অনুপ্রাণিত)।^১ ১৯৮৯ সালে হামবুর্গের দৈনিক *হামবুর্গার অ্যাপেনড্রাট* জনগণের প্রিয় তৈলচিত্রের ওপর একটা জরিপ চালায়; এই জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৩২ শতাংশ *মোনালিসা*’কে রাখে সবচেয়ে আগে, তারপর যথাক্রমে কার্ল স্পিৎসভেগের *ডের আর্মে পোয়েট* (দরিদ্র কবি, ১৮৩৯), এ ছবিটিতে দেখা যায় বিছানায় শুয়ে এক লোক ছাতা দিয়ে ছাদের একটা ছিদ্র দিয়ে পানি পড়া থেকে নিজেকে রক্ষা করছে (২৭ শতাংশ) এবং এর পরেই *দ্যুরারের ফেন্ডহাসে* (খরগোশ, ১৫০২)-এর অবস্থান।^২

‘*Joconde*’ কোথায়? লুভরের তথ্য ডেস্কে সবচেয়ে বেশি ও সচরাচর এ প্রশ্নটি করা হয়—২০০০ সালের ৬ ফেব্রুয়ারিতে পরিচালিত এক জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। প্রশ্নটি করা হয়েছিলো ৭৬ বার। ‘আমি কোথায়?’ প্রশ্নটির অবস্থান ছিলো এর পরেই (৫ বার)। ‘*ভেনাস দ্য মিলো কোথায়?*’ প্রশ্নটি করা হয় মাত্র একবার। নির্দিষ্ট কোনো তৈলচিত্র বা ভাস্কর্য সম্পর্কে আর কিছুই জানতে চাওয়া হয় নি।

মোনালিসা’র খ্যাতি সেই মিউজিয়ামকে আরো বেশি মর্যাদা এনে দিয়েছে আগে থেকেই যার বিপুল মর্যাদা ছিলো। এই বিশ্বব্যাপী উন্মাদনা—যার উদ্ভব ও বিকাশের মানচিত্র আঁকবো আমি—লুভরের জন্য কিছুটা সুবিধা তৈরি করেছে বটে, কিন্তু কিছু সমস্যাও যোগ হয়েছে। সুবিধাগুলো খুবই স্পষ্ট। *মোনালিসা*’র খ্যাতি লুভরের প্রতি এমন লোকজনকেও আকৃষ্ট করেছে যারা এই তৈলচিত্রটি না থাকলে কখনও এই মিউজিয়ামে যাওয়ার কথা ভাবতো না। আর প্রবেশমূল্য দিয়ে একবার ভেতরে ঢুকলে অন্য শিল্পগুলোও তারা দেখবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

অন্য দিকে লুভরের সমস্যা হলো, *মোনালিসা* গণসংস্কৃতির একটি আকর্ষণে রূপান্তরিত হওয়ায় উপযুক্ত কৌশল গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ। এর কিউরেটদের পেশাদারিত্ব বজায় রাখতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে। তারা হয়তো ভাবতে পারে কিছু কাজ অন্যগুলোর চেয়ে ভালো, কিন্তু ‘সেরা’ তৈলচিত্রের মতো কোনো বস্তুর ধারণা তাদের পছন্দ নয়, যেনো শিল্পের ইতিহাস বিশ্বমানের মতো কোনো টুর্নামেন্ট। আরো যা তাদের বিরক্ত করে তা হলো *মোনালিসা*’র নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে তারা। আধুনিক মিউজিয়াম সাধারণত

বিপুলভাবে সরকারি অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, ফলে রাজনীতিবিদদের কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। বাস্তবে রাজনীতিকরা বিশেষজ্ঞদের ওপর এ ধরনের ক্ষমতা ব্যবহার করে আনন্দ পায়। কোথায় ভারমিয়ার কিংবা রুবেন্সের শিল্পকর্ম টাঙানো হবে অথবা শিল্পকর্ম কেনার ক্ষেত্রে টাকা কিভাবে খরচ করা হবে এমন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তারা কখনই হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু মোনালিসার বেলায় সম্পূর্ণ অন্যরকম। অত্যন্ত ভঙ্গুর হওয়া সত্ত্বেও এই তৈলচিত্রটি রাজনৈতিক কারণে ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এবং ১৯৭৪ সালে জাপানে পাঠানো হয়েছিলো—লুভরের বিশেষজ্ঞদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ফরাসি সরকার সেদিন একটি শর্তে বিজয়ী হয় যে, তৈলচিত্রটি আর কখনও বাইরে পাঠানো হবে না (কাঁঠের উপর অংকিত তৈলচিত্র দেশের বাইরে না পাঠানোর ব্যাপারে একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়)। কিন্তু যা করা যায় তা করা যায়ও না। হতে পারে মোনালিসা পাঁচশ' বছর টিকে আছে, কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজনীতি স্বল্পমেয়াদী। মোনালিসাকে 'সাধারণ' মাস্টারপিসের মতো ব্যবহার করা যায় না। একটা বিশেষ বাস্তবের মধ্যে এটি প্রদর্শিত হচ্ছে। একটা তৈলচিত্রের ক্ষেত্রে যেমনটা করা হয় তেমনি সব স্বাভাবিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অবশ্যই করতে হবে এমনভাবে যেনো কখনও দর্শনার্থীদের দৃষ্টি থেকে সরাতে না হয়। মঙ্গলবার লুভর বন্ধ থাকে। কাজেই মোনালিসার যে কোনো কাজ করা উচিত সোমবার সন্ধ্যা এবং বুধবার সকালের মধ্যে। বহুদূর থেকে এই তৈলচিত্রটি দেখতে আসা দর্শনার্থীদের হতাশ করার ঝুঁকিও বিরাট।

মোনালিসাকে মেরামত করা যাবে না। এমন কি পরিষ্কার করাও যাবে না, দেখে সেটাই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা খুবই অপচ্ছিন্ন, এর আংশিক কারণ কালের প্রবাহ আর আংশিক কারণ ষোলো শতাব্দীতে যে বার্নিশ লাগানো হয়েছিলো তা কালচে হয়ে এসেছে। ১৯৮৮ সালে শিল্প সমালোচক ফেদেরিকো জেরি শিল্পকর্মটি আগাগোড়া পরিষ্কার করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেন মোনালিসার প্রহেলিকার আসল কারণ এর ঈষৎ কালো ছোপ। পুণরুদ্ধার করলে প্রহেলিকা উন্মোচিত হবে। যা হোক, এখনও পর্যন্ত কোনো কিউরেটর মোনালিসার মুখ থেকে হাসি মুছে ফেলার দায়ি ব্যক্তি হিসেবে ইতিহাসে নিজের নাম লেখানোর ঝুঁকি নিতে চায় নি।^২

ভীড় এমনই লেগে থাকে যে মোনালিসার জন্য তার নিজস্ব একটি কামরা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো। যে সব কিউরেটর চেয়েছে 'স্বাভাবিক' মাস্টারপিস হিসেবে ইতালিয় রেনেসাঁর অন্যান্য কাজের পাশাপাশি এই তৈলচিত্রটিকে একত্রেই রাখা হোক তারা পরাজিত হয়েছে, আবার শুধুমাত্র

লিওনার্দোর জন্যই যারা একটি কামরা আশা করেছিলো তারাও পরাজিত হয়েছে। লিসার কামরার জন্য তহবিল জুগিয়েছে জাপানের নিশ্বন টেলিভিশন (এনটিভি)—এই টিভি নেটওয়ার্কই ১৯৮২-৮৫ সালের সিস্টিন চ্যাপেল পুনরুদ্ধারের পৃষ্ঠপোষক ছিলো। তাতে খরচ হয়েছিলো ২০ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড। মোনালিসার মোহাবিষ্টতা যে সত্যিই বৈশ্বিক, এ হলো তার আরো একটি নিদর্শন।

আইডিয়াটা নতুন নয়। ১৯৩৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর ফ্রান্সের শিল্পকলার বাজেটের উপর এক সংসদীয় বিতর্ক চলাকালে সিনেটর জঁ বশ মোনালিসার পৃথক কামরার প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। তিনি যুক্তি দেখান, শিল্পকর্মটি চুষকের মতো বিদেশীদের আকৃষ্ট করে, সবাই এটা দেখতে চায়। ১৯৯১ সালের পর এ আইডিয়াও একবার পরীক্ষা করা হয়। শেষ পর্যন্ত এই স্কিম অনুমোদিত হয় যে, *Salle des Etats*-এর আয়তন কমানো হবে। ভেনিসীয় কাজগুলো রাখা হবে সেখানে আর ভেরোনেজের দ্য প্যারিজ অ্যাট কানার পেছন দিকে নতুন একটা কামরা তৈরি করা হবে। দর্শনার্থীরা লিফট থেকে লিসার কাছে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে, গ্র্যান্ড গ্যালারির ভেতর দিয়ে না হেটেই বা লিওনার্দোর আরো পাঁচটি কাজ না দেখেই আবারো ফিরে আসতে পারবে।

লুভর এবং ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় মোনালিসা শিল্পের উন্নয়নে পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রীয় মিউজিয়ামের সমস্ত তৈলচিত্রের অসাধারণ ডাটাবেজকে বলা হয় *Joconde*; লুভর যে সাময়িক পত্রিকা বের করে সেটার নামও ওই। মিউজিয়ামের ওয়েবসাইটে ছবির গ্যালারির সংগ্রহ সম্পর্কে তথ্যের জন্য আপনাকে যে আইকনে দু'বার ক্লিক করতে বলা হয়, সেটা মোনালিসার একটা প্রতিচ্ছবি। এমন কি লুভর পিরামিডের নিচে ক্যাফে ম্যাফিনে হাতে ম্যাফিন ধরা মোনালিসার একটা পোস্টার রয়েছে।

যে দর্শকরা এই তৈলচিত্রটির সামনে ঠেলাঠেলি করে তারা জানে, এটা বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পকর্ম, তাই তারা এখানে এসেছে। তাদের কয়েকজন জানে কেন। অনেকেই ভাবে মোনালিসার হাসির রহস্য নিয়ে কিছু করা যায় কিনা।

এই 'রহস্য' আরোপিত হয়েছে উনিশ শতকে। তার আগে, এই হাসি খুব সামান্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। সে সময় এই হাসিকে প্রহেলিকাপূর্ণ বা রহস্যময় হিসেবে বিবেচনা করা হতো না। গিওর্গিও ভাসারি মোনালিসার উপর প্রথম সমালোচনামূলক গ্রন্থে এর একটা গতানুগতিক ব্যাখ্যা দেন। লিওনার্দো যখন মডেলকে আঁকছিলেন, তখন ওই মডেলের মনোরঞ্জন

করছিলো গায়ক, ভাঁড় এবং অন্যান্য শিল্পীরা আর মজা পেয়ে মডেল হাসিছিলো।^{১০} যাই হোক, রেনেসাঁ যুগের শিল্পকর্মে এমন হাসি মোটেও বিরল নয়, গ্রিক ভাস্কর্যেও এর প্রাচুর্য রয়েছে। লিওনার্দোর নিজের শিক্ষক ভেরোক্কিও'র কাজে প্রায়ই সুস্থ হাসিযুক্ত অবয়ব দেখা যায়। লিওনার্দোর কয়েক দশক আগে দোনাতেল্লো তার শিল্পকর্মের এমন হাসি উপস্থাপন করে গেছেন,^{১১} আর আন্তোনেল্লো দা মেসিনা, যিনি ইতালিয়দের তেলরঙের ব্যবহার শিখিয়ে গেছেন বলে মনে করা হয়, হাস্যোজ্জ্বল মুখের এক ব্যক্তির চমৎকার একটি প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন তিনি, যে ব্যক্তি সরাসরি তাকিয়ে আছে দর্শকের দিকে (২ নম্বর ছবিটি দেখুন)।

আমরা তার এই দুষ্টমিপূর্ণ হাসির উৎস জানি না, আর এ নিয়ে খুব কম লোকেরই মাথাব্যথা আছে। এর কারণ কি এই যে, লিওনার্দোর মতো খ্যাতিমান নন আন্তোনেল্লো দা মেসিনা? সেটা কি এই কারণে যে (সাধারণত পুরুষ) টীকা-ভাষ্যকাররা একজন পুরুষের হাসিতে রহস্য বোধ করে না? সেটা কি এই কারণে যে 'অজানা পুরুষ' মানুষটির প্রতিকৃতিটা টাঙানো আছে বহু দূরবর্তী ও প্রাত্যস্তিক সিসিলির কাফেলু নামক জায়গায় মুসিও মান্দ্রালিস্কা জাদুঘরে এবং প্যারিসের কেন্দ্রে নয় বলে? আর শিল্পী ও স্থান যদি নির্ধারক হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য লিওনার্দো-সুলভ হাসির দিকে মনোযোগ যাচ্ছে না কেন? এসব আসলে অসাধারণ বিষয় থেকে অনেক দূরে। লুভরে লিওনার্দোর *La Belle Ferronniere* হয়তো হাসিমণ্ডিত নয়, কিন্তু মোনালিসা থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে তাঁর *Bacchus*, *St. John* এবং *St. Anne* এবং ক্রাকোভের চার্তোরিস্কি মিউজিয়ামে (লিওনার্দোর পৃষ্ঠপোষক লোদোভিকো ফ্লোজার একজন রক্ষিতা) সিসিলিয়া গ্যালেরানির প্রতিকৃতি একইভাবে হাসছে।

প্রকৃতপক্ষে রেনেসাঁ যুগের তৈলচিত্রে যা ব্যতিক্রমী ছিলো তা হলো বিষণ্ণ মুখের ছবি। ১৪৭৫ সালে আরো একটা এঁকেছিলেন লিওনার্দো : *Ginevra de Benci* সেটার নাম। (৭ নম্বর ছবিটি দেখুন), এ ছবির বিষণ্ণ মুখটা দেখা যাবে ওয়াশিংটনে। তবু সুন্দরী জিনেভার এই বিষণ্ণতা লিসার হাসির আকর্ষণে এতোটুকু চিড় ধরাতে পারে নি।

উৎসের নির্মাণ কৌশলের জন্য লিসার হাসির রহস্য অস্ফুট। এর সন্তোষ জনক সমাধানের কোনো পথ নেই। এটা হয়তো ততোক্ষণই স্থায়িত্ব পেতে পারে যতোক্ষণ তৈলচিত্রটি প্রতি আগ্রহ থাকে। যাই হোক, বিশ্বের কাছে যে-কোনো ব্যক্তি নিজেকে হাসির মাধ্যমে পার্থিব হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে।

কারো সঙ্গে আমাদের দেখা হলে আমরা হাসি, যখন আমাদের পরিচিত কারো দিকে হাত নাড়ি তখন হাসি। আমাদের বাচ্চাকাচ্চা, বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের উদ্দেশে আমরা হাসি। নির্বাচনী প্রচারণার সময় হাসেন রাজনীতিবিদরা, কণ্ঠশিল্পীরা গান গাওয়ার সময়। নৃত্যশিল্পীরা নাচার সময় হেসে থাকেন, একই কাজ করেন টেলিভিশন উপস্থাপকরাও। আর ফটো তোলার সময় হাসি তো রীতিমতো অপরিহার্য।

কোনো আবেগের দর্শনযোগ্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়ভাবেই সেটার হেতু উন্মোচিত রাখা হয়, যদি না উপস্থাপনায় তা সংযুক্ত থাকে। অশ্রুযুক্ত কোনো নারীর মুখে কোনো রহস্য থাকে না শিল্পী যদি তাকে মৃত শিশু কোলে নেয়া অবস্থায় না আঁকেন। কিন্তু এক প্রকার সংজ্ঞার মধ্যেই পড়ে যে, কোনো আবেগের অলংকরণে যদি ওই হেতুটা পরিস্ফুট না থাকে, দর্শকরা তাহলে স্বাধীনভাবে সেটা নিয়ে কল্পনা করতে পারে, অবশ্য সে ছবির প্রতি যদি তাদের আগ্রহ জন্মায়। এ হলো সে জিনিস যাকে বলা হয় 'উন্মুক্ত' কাজ, সেটা হতে পারে একটা তৈলচিত্র (অথবা একটা টেক্সট, অথবা একটা সঙ্গীত) যা গ্রহণকারী/ ব্যাখ্যাদাতাকে (দর্শক, পাঠক অথবা শ্রোতাকে) এর অর্থ সন্ধান করে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়।^{১৫} যা প্রদর্শিত হচ্ছে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে যদিও দর্শকদেরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তারপরও বলা যায়, রচনাকারীর কাজের বর্ণনা প্রাসঙ্গিকতা দিয়ে এই স্বাধীনতার একটা সীমানা বেঁধে দেয়া যায়। অন্য কথায়, কোনো কাজই কখনও পুরোপুরি 'উন্মুক্ত' (অথবা পুরোপুরি 'রুদ্ধ') হয় না। একটা তৈলচিত্র—ধারা যাক *Portrait of an Unknown Mother—Virgin Mary with Child* শিরোনামযুক্ত ছবিটার চেয়ে বহুগুণ বেশি 'উন্মুক্ত'। একটা কাজের প্রতীকি ও আইকনোগ্রাফিক আধেয় সম্পর্কে সচেতন দর্শকরা তাদের ব্যাখ্যামূলক স্বাধীনতার জায়গাটি সীমাবদ্ধ দেখতে পাবে : ছবিতে যা উপস্থাপিত হয়েছে তা শিশুসন্তানসহ যেনতেন কোনো নারী নয়, সে মানব শিশুরূপে আবির্ভূত খৃস্টীয় ঈশ্বরের মা—এই আধেয় গ্রহণ না করার কোনো উপায় নেই দর্শকদের। পশ্চিমা শিল্পকলা এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত টেক্সট থেকে সরে এসেছে তথাকথিত 'polysemic' ধারার কাজের দিকে। এর বৈশিষ্ট্য হলো অর্থের দিকটি উন্মুক্ত রাখা। উদাহরণস্বরূপ, অ্যামিগোনি'র আঁকা রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রতিকৃতির চেয়ে জ্যাকসন পোলকের আঁকা ছবি আমাদের অনেক বেশি ব্যাখ্যার স্বাধীনতা দেয়। মোনালিসাকে বিবেচনা করা যেতে পারে দুই পর্বে ভাগ করে : এক পর্বে শিল্পীর বন্ধনমুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চিমা শিল্পের বিনির্মাণে, অন্য পর্বে দর্শকদের।

দর্শকরা দুটো সম্ভাবনার দ্বন্দ্ব আপেক্ষিকভাবে একটা উন্মুক্ত টেক্সটের মুখোমুখি হচ্ছে। নিজেদের মতো ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর স্বাধীনতার পূর্ণ সম্ভাবহার করতে পারে তারা। বিকল্প দিকে, সম্ভাব্য অর্থের ব্যাপকতা যদি ভারবহ হয়ে ওঠে, অথবা অর্থ উদ্ধারের ইচ্ছা বা সামর্থ্য না থাকে, তাহলে তারা কোনো স্বীকৃত পাঠোদ্ধারকারীর (বা শিল্প সমালোচকের) প্রতিষ্ঠিত অর্থের অনুকূলে তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা পরিত্যাগ করতে পারে।

মোনালিসার হাসি ফুটে উঠেছে মুখের বাম কোণে, অতি সামান্য উঁচু হয়ে। লিওনার্দো নিজেই তার *Treatise on Painting*-এ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুখের কোণ উঁচু করে উচ্চহাস্য করে সে শিশুদের মতো, যারা জানে কার মুখ হাস্যোজ্জ্বল।'^{১৬} উচ্চহাসি বা laugh আর মৃদুহাসি বা smile-এর মধ্যে ব্যবধান যেমন আছে তেমনি রেনেসাঁ যুগের শিল্পকর্মে এই উচ্চহাসি অত্যন্ত দুর্লভ, এবং অভিজাত্য আর উঁচু শ্রেণীকে আঁকার সময়ে এটা কখনই ব্যবহার করা হয় নি। মোনালিসা উচ্চহাসি (অর্থাৎ laugh) হাসে না; সে সংযম আর শোভনতা অনুশীলন করে। মৃদু হাসি (বা smile) নিম্নতম স্তর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ফরাসি ভাষায় *Sou-rire* অর্থাৎ under-laugh—এবং এর ল্যাটিন উৎস *Subridere* থেকে সে কথাই স্পষ্ট হয়। পনেরো শতাব্দীর ইতালিয় অভিজাত জীবনের উচ্চতর আচরণবিধির জগতে মৃদু হাসি কোনো ব্যক্তিগত বিষয় ছিলো না। যারা প্রকৃত আচরণবিধি শিখতে চাইতো তাদের জন্য এ বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়েছিলো। সেসবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বইটি ছিলো বালদাসারে কাস্তিগ্লিওনের *Il Cortigiano* (The Courtier), বইটি প্রকাশিত হয় ১৫২৮ সালে এবং পরে সেটি ইংরেজিতে অনূদিত হয় ১৫৬১ সালে। ইতালিয় আচরণবিধিকে মনে করা হতো একটা সর্বজনীন আদর্শ হিসেবে যা সকলের পক্ষেই অনুসরণযোগ্য। কাস্তিগ্লিওনে তার পাঠকদের পরামর্শ দিয়েছেন :

যতো ক্ষতিই হোক না কেন কৃত্রিম আচার আচরণ থেকে সরে থাকতে হবে। যেনো তা বন্ধুর ও বিপক্ষজনক শৈলশ্রেণী; সব কিছুতেই একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি ব্যবহার করতে হবে—চর্চা করতে হবে একটা নির্দিষ্ট *Sprezzatura*, আর সেটা করতে হবে সমস্ত কারুকার্য গোপন রাখার জন্যে, কারো কথা বা কাজকে আদৌ হিসেবের মধ্যে না আনার জন্যে।^{১৭}

আক্ষরিকভাবে *Sprezzatura* শব্দটির অর্থ তাচ্ছিল্য করা এবং নির্লিপ্ততা। নির্দিষ্ট একটা পন্থায় নিজেকে উপস্থাপনের যে চেষ্টা তা নিয়ন্ত্রণে রাখার একটা শিল্প। ইতালিতে বিরক্ত না করার বা মনোযোগ না দেয়ার ডান করার বিপুল চেষ্টা চালানো হতো। এই অবস্থাটা বেশিদিন টেকে নি (বহু পরে এর পুনরাবির্ভাব ঘটেছিলো ইংরেজ বুর্জোয়াদের মধ্যে, তাও খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য), কিন্তু ষোলো শতাব্দীর মধ্যভাগেও এটা চালানোর পক্ষে তদবির করে যান ইতালিয় লেখক অ্যাগনোলো ফিরেনজুওলা (১৪৯৩-১৫৯৩) নারীসুলভ সৌন্দর্য ও আচরণের ওপর তার প্রবন্ধগ্রন্থ *Della perfetta bellezza d'una donna* (নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য প্রসঙ্গে, ১৫৪১), যা কিনা তিন শতাব্দী পরেও সুপরিচিত ছিলো। সুইস ইতিহাসবিদ জ্যাকোর বার্কহার্ট তার *The Civilization of the Renaissance in Italy* (১৮৬০) গ্রন্থে সেই কালের সিদ্ধান্তমূলক ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন এবং লিওনার্দো বা মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর চেয়ে ফিরেনজুওলাকে বেশি জায়গা দিয়েছেন।^{১৮} ফিরেনজুওলা নির্দেশ করেছেন, সংযত আর অনুচ্চ আচরণবিধির মধ্যে মৃদুহাসিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তিনি লিখেছেন, কেউ এক্ষেত্রে উপরের সারির ছয়টা বেশি দাঁত দেখাতে পারবে না (এতেই যথেষ্ট প্রশস্ত হাসির সুযোগ থেকে যায়)।^{১৯} ভদ্রমহিলাদের মুখের ডান পাশ চাপা রাখতে হবে আর বামপাশ কোমল ও প্রাণবন্তভাবে খুলতে হবে, বেনো গোপনে মৃদু হাসছে। এই বিষয়টা মোনালিসার সঙ্গে এমনভাবেই মিলে যায় যে, ফিরেনজুওলা ওই প্রতিকৃতিটা মাথায় রেখেই তার উপদেশাবলী রচনা করেছিলেন বলে ধারণা করা সম্ভব।^{২০}

মোনালিসার হাসি আজ এতোটাই বিখ্যাত যে, সেটার দিকে না তাকানো প্রায় অসম্ভব। আর্নস্ট গমব্রিচ যেমন লিখেছেন, 'বিবরণ হতে পারে আসঞ্জনশীল। একবার আমরা সেগুলো পড়ে যদি স্মরণ করি, আমরা দেখবো ছবিটা বদলে গেছে নিগূঢ়ভাবে।'^{২১}

বিষয়টার প্রতি ব্যাপক কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর শিল্প-ইতিহাসবিদেরা মোনালিসার হাসির ব্যাপারটা সৌখিন গবেষকদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছেন মোনালিসার ভঙ্গিমার ওপর, যা সম্ভালনের ধারণা তৈরি করে; কৌশলের ওপর, যা গভীরতার উপলব্ধি জাগায়; তৈলচিত্রটির ইতিহাসের ওপর এবং সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, মডেলের পরিচয়ের ওপর। যদিও মোনালিসার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ও বিখ্যাত উপাদান তার হাসি, কিন্তু আজকের দিনের শিল্প-ইতিহাসবিদেরা তা নিয়ে কখনই গুরুগম্ভীর কোনো আলোচনা করেন নি।

হাসির ব্যাপারে প্রথম গুরুগম্ভীর বিশ্লেষণ পাওয়া যায় ১৯৩৩ সালে রেমন্ড বেয়ারের *Leonard de Vinci: La Grace* নামক গ্রন্থে। বেয়ার দেখান, একটু মৃদুহাসি পুরো মুখটাই আলোকিত করে তুলতে পারে। এ হলো গণদেশ, চিবুক আর চোখের খেলা। এ হলো আলোর প্রশ্ন।^{২১} মোনালিসার মৃদুহাসি হচ্ছে অর্ধ-মৃদুহাসি, *half-smile, un sourire atténue*. বেয়ার বলেন, মুখের উপরিভাগ ঢেকে দিয়ে দেখলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। চোখ বাদে আর সব অংশ ঢেকে দিলেও দেখা যাবে চোখেও সে হাসির উপস্থিতি বিদ্যমান। চোখের পাতায় অবশ্য হাসি নেই। দৃষ্টির মধ্যে নেই কোনো জ্বলে ওঠার ভাব। বরং কেমন শোকাকুল, ধ্যানমগ্ন। মুখের নির্দিষ্ট অংশের ওপর মনোযোগ ঘনীভূত করলে দেখা যাবে প্রসারিত, সেখানে আলো পড়ছে, অন্য দিকে মুখ কিন্তু বন্ধ, অতঃপর এখানেই ফুটে উঠছে অবজ্ঞার ভাবটা। এভাবে বেয়ার বলছেন, এই কাজের বহু প্রকার পাঠ তৈরি হচ্ছে। এটাই হয়তো এই তৈলচিত্রের সাফল্যের ভিত্তি।^{২২}

রহস্যমাখা হাসিটা তৈরি করা। তবে অন্য রহস্যগুলো তা নয়। কবে এবং কোথায় মোনালিসা এঁকেছিলেন লিওনার্দো? কে এই নারী? কে এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলো? লিওনার্দো ছবিটা কেন নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন? কিভাবে সেটা ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়ার সংগ্রহে জমা হলো, অতঃপর ফরাসি রাজ্যে? সমানভাবে এটাও বড় তাজ্জব ব্যাপার যে, লিওনার্দো যে কয়েক হাজার স্কেচ, স্টাডি আর ড্রয়িং রেখে গেছেন সেখানে মোনালিসার ওপর একটাও স্টাডি নেই—যদিও বলা হয়ে থাকে উইন্ডসরে লিওনার্দোর ড্রয়িংগুলোর যে সংগ্রহ আছে তার মধ্যে একজোড়া নারীসুলভ হাতের ড্রয়িংই হচ্ছে মোনালিসার হাতের ড্রয়িং।^{২৩}

এই অনিশ্চয়তা মোনালিসাকে ঘিরে সৃষ্ট প্রহেলিকা ও ইন্দ্রজালে যথেষ্ট অবদান রেখেছে, অতঃপর এর জনপ্রিয়তাও। অধ্যয়নের স্বাতন্ত্র্যসূচক ক্ষেত্র হিসেবে শিল্পের ইতিহাস ও অনুরাগের বিকাশ থেকে অর্থাৎ উনিশ শতক থেকে পণ্ডিতরা আর লেখকেরা মোনালিসাকে ঘিরে তৈরি হওয়া নানা প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছেন। বিশ শতকে, যখন মোনালিসার প্রসিদ্ধি পৌঁছে গেছে বৈশ্বিক মাত্রায়, এই তৈলচিত্রটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিনব হাইপোথিসিস (এমন কি নতুন হিসেবে চালানো পুরনো, বিস্তৃত ধারণাসহ) ব্যাপক মিডিয়া কাভারেজ পেয়েছে, যা রেনেসাঁ যুগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তৈলচিত্র বিষয়ক অনুরূপ ঐতিহাসিক বিতর্ক কখনও পায় নি। প্রতিটি 'সমাধান' ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে আর সেটা অন্যদেরকে নতুন সমাধান দেবার জন্য অনুপ্রাণিতও

করেছে। রহস্য বিক্রি হয়েছে ভালোই। যদিও সে সব অনন্য-অসাধারণ কিছুই নয়। তবে এটাও ঠিক, রেনেসাঁ যুগের শিল্পকর্মের বেশ বড় একটা অংশেরও একই রকম গুণ উৎস রয়েছে। অন্তত মোনালিসার ক্ষেত্রে কখনও সন্দেহ করা হয় নি যে, লুভরের প্রতিকৃতিটা লিওনার্দোর আঁকা নয়। লুভরে সংরক্ষিত লিওনার্দোর অন্য কাজগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু সে রকম নয়। ১৯৪১ সালের বায়েদেকার গাইড টু প্যারিস-এ সেই সময়কার প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। তাতে বলা হয়েছে, *St. Anne with Virgin and Child* (৪ নম্বর ছবিটি দেখুন) ছবি দুটো আঁকা হয়েছিলো শিষ্যদের সহায়তা নিয়ে, আর *Belle Ferronniere* (৯ নম্বর ছবিটি দেখুন) ছবিটা খুব সম্ভবত বোলত্রাফিওর আঁকা, এবং *Bacchus* (৩ নম্বর ছবিটি দেখুন) একটা হারিয়ে যাওয়া তৈলচিত্রের নকল।^{২৫} শুধুমাত্র মোনালিসা নিয়েই এ ধরনের কোনো সন্দেহ কখনও উচ্চারণ করা হয় নি।

সিটার (অর্থাৎ মডেল)-এর পরিচয় উনিশ শতকী লেখকদের অস্থির করে নি। তারা ধরেই নিয়েছিলেন গিওর্গিও ভাসারির বিবরণই সঠিক। ভাসারি সিটারকে চিহ্নিত করেছেন লিসা হিসেবে, যে কিনা আন্তোন মারিয়া দি লোন্দো গেরার্দিনির কন্যা এবং ফ্রান্সেস্কো দি বার্তোলোমিও দি জ্যানোবি দেল জিওকোন্দোর স্ত্রী, এ জন্য তার পদবি হয়েছে জিওকোন্দো (ফরাসিতে *Joconde*)। এই বিবরণ সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন তোলা হয় বিশ শতকে। প্রথম যারা চ্যালেঞ্জ করে বসেন তাদের একজন আন্দ্রে শার্ল কপিয়ে, যিনি ছিলেন *Joconde*-এর একজন প্রখ্যাত খোদাইকারক (তার প্রিন্ট এখনও বিক্রি হয় লুভরে) তিনি মনে করেন সিটার কোনো সাধারণ ফ্লোরেন্টাইন গৃহবধূ হতেই পারে না, বরং বাস্তবিক অর্থে একজন সমভ্রান্ত ব্যক্তি।^{২৬}

শিল্পের ইতিহাসবিদদের কাছে একজন সিটারের পরিচিতি ততোক্ষণই গুরুত্ব বহন করে যতোক্ষণ কোনো শিল্পকর্মের ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ তাদের শৃঙ্খলার কেন্দ্রে অবস্থান করে। নন্দনতাত্ত্বিক গণাবধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব সামান্যই। নতুন কোনো পরিচিতি মোনালিসার সৌন্দর্যের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না; যে কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা, নবপ্রবর্তিত ভঙ্গিমা, মানব প্রতিকৃতি ও পশ্চাৎভূমির মধ্যে রচিত রহস্যময় সংযোগ, ইত্যাদি কোনো কিছুর ওপরই প্রভাব পড়বে না। যদি আবিষ্কৃত হয়, লিসা গেরার্দিনি মোনালিসার মডেল নয় তাতেও জনতার কৌতূহলে ব্যাপক কোনো রূপান্তর ঘটবে না। যদিও 'আসল' গিওকোন্দোর অবিরাম অনুসন্ধান শিল্পকর্মটির ওপর দর্শকদের দৃষ্টি টেনে রাখতে এক রকম সাহায্যই করে।

আমরা যতোই অতীতের অনুসন্ধান করবো, বিশেষ করে দূরবর্তী অতীতের, ততোই পরিচয় আর গুণের প্রশ্ন সম্পর্কিত নিশ্চিতিও কমতে থাকবে। মোনালিসাও এর ব্যতিক্রম নয়। একটা প্রতিকৃতির কোনো সিটার যখন শক্তিদ্র ব্যক্তি হয়—একজন সার্বভৌম, একজন অভিজাত অথবা একজন ধনবান ব্যক্তি—তখন তাকে শনাক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাছাড়া নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সাধারণত ভাড়া করা চিত্রকরদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হোতো, আর্কাইভ সংরক্ষণ করা হোতো, রেকর্ড রাখা হোতো। যারা আঁকতে দিতো তারাই অধিকারী হোতো শেষ করা ছবিটির। তা পরিণত হোতো পারিবারিক সম্পদে, রেকর্ডভুক্ত হোতো, উইলের তালিকায় স্থান পেতো এবং বিভিন্ন সময় তা লিখত চুক্তির পণ্য হয়ে দাঁড়াতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব শৈল্পিক পণ্যের বিবরণ তৈরি করা সম্ভব : কবে আঁকা হয়েছে, কার দ্বারা এবং কার জন্য। শনাক্তকরণে সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন সিটার চেনা জানা কেউ হয় না, সর্বোপরি শিল্পী স্বয়ং নিজের কাছে রেখে দেন সেই প্রতিকৃতি—মোনালিসাকে নিয়ে ঠিক সেটাই করেছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, ফলে একটা রহস্যের জাল সৃষ্টি হয়েছে।

কোনো প্রতিকৃতি চিত্রকরের নিজের কাছেই রেখে দেয়ার ঘটনা সচরাচর ঘটে না, কিন্তু এ কথাও ঠিক লিওনার্দো ছিলেন অসাধারণ শিল্পী। প্রচুর নকশা আঁকলেও তিনি তৈলচিত্র আঁকতেন খুব কম, নিজের অসংখ্য কাজ রেখে দিতেন নিজের কাছেই। তার রেনেসাঁ প্রতিপক্ষ রাফায়েল এবং মাইকেলএ্যাঞ্জেলো যেমনটা করতেন না। উনিশ শতকে লিওনার্দো সম্পর্কে যা জানা গেছে তার বেশির ভাগের ভিত্তিই রেনেসাঁ যুগের চিত্রকর ও শিল্পীদের জীবনের প্রধান সূত্র ভাসারি রচিত গ্রন্থ *Le Vite de' piu eccellenti Architetti, Pittori, et Scultori Italiani* (১৫৫০; পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৫৬৮) থেকে। ভাসারি জন্ম ১৫১১ সালে, লিওনার্দোর মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স আট, তিনি *magnum opus* লেখা শুরু করেন ১৫৪০ সালের দিকে। ৮ লাখ শব্দ সম্বলিত এই বিশাল কাজ এ যাবত কালে রচিত শিল্প ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। এতে আছে প্রায় ১৬০ জন শিল্পীর জীবনবৃত্তান্ত। ভাসারি শুরু করেছেন 'ইতালিয় শিল্পকলার শৈশব' থেকে (কিমাবুয়ে ও গিওত্তো), তারপর এগিয়েছেন পনেরো শতকে (ক্রেনেল্লি, দোনাতেল্লো, মাসাচ্চিও ও পিয়েরো দেল্লা ফ্রান্সেসকা), শেষে পৌঁছেছেন সেই জায়গায় যাকে তিনি বিবেচনা করতেন গ্রহের কক্ষপথের সেই স্থান হিসেবে পৃথিবী থেকে দূরতম যার অবস্থান, সে হলো লিওনার্দোর যুগ, রাফায়েলের

যুগ, সর্বোপরি ঐশী মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর যুগ, সেই মাইকেলএ্যাঞ্জেলো যার স্থান জীবিত ও মৃত সকল মানুষের উপরে এবং যিনি অতিক্রম করে গেছেন তাদের সবাইকে।^{১৭} গ্রন্থটিতে মাইকেলএ্যাঞ্জেলোকে নিয়ে লেখা হয়েছে ৭৫ পৃষ্ঠা, রাফায়েলকে নিয়ে ২২ পৃষ্ঠা আর গিওস্তোকে নিয়ে ১৪ পৃষ্ঠা। চতুর্থ অবস্থানে লিওনার্দো, তাঁর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ১০ পৃষ্ঠা।

মোনালিসা সম্পর্কে ভাসারির বিবরণ লেখা হয়েছিলো সম্ভবত ১৫৪৭ সালে।^{১৮} ততোদিনে লিওনার্দোর মৃত্যুর ২৮ বছর হয়ে গেছে, ফ্রান্সেস্কো ইল গিওকোন্দার মৃত্যু পেরিয়ে গেছে ৮ বছর। তবে তখনও জীবিত ছিলেন লিসা গেরার্দিনি। ১৫২৪ থেকে ১৫৫০ সালের মধ্যে থেকে ফ্লোরেন্সে বাস করতেন ভাসারি, থাকতেন মেদিচি প্রাসাদে, ফ্রান্সেস্কো ও লিসার বাড়ি থেকে অনতিদূরে। এটা সম্ভব তাদের দু'জনকেই তিনি চিনতেন, আর তারা ছিলো তার কতিপয় তথ্যের উৎস।^{১৯} তৈলচিত্রটির সিটারের পরিচয় সম্পর্কিত নিরেট প্রমাণের স্বল্পতার কারণে ভাসারির ভাষ্য আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। মোনালিসা বিষয়ক ষোড়শ শতাব্দীর যে সাক্ষ্য আমরা পেয়েছি, নিচের সংক্ষিপ্ত রচনাংশটি তারই প্রায় পূর্ণাঙ্গ শরীর। সেটা পুরোপুরি এই রকম :

ফ্রান্সেস্কো দেল গিওকোন্দার স্ত্রী মোনালিসার প্রতিকৃতি
আকার কাজটো নেন লিওনার্দো। তিনি এর ওপর চার বছর কাজ করেন, কিন্তু শেষ করেন নি। সেটি এখন রয়েছে ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সেস্কোর কাছে ফভানারিওতে। কতোদূর পর্যন্ত প্রকৃতিকে অনুকরণ করা যায় তা এই মুখটার দিকে তাকালে যে কোনো ব্যক্তির বুঝতে দেরি হবে না, যেহেতু এখানে শৈল্পিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চোখে ঝিলিক এবং আর্দ্রতা, বাস্তব জীবনেও যেটা দেখা যায় সচরাচর। তার চারপাশে লালচে ফুটকি। ভুরু এতোটাই স্বাভাবিক যে, তার বেশি স্বাভাবিকতা সম্ভব নয় : এক স্থানে ভুরু ঘন আর অন্য স্থানে হালকা হয়ে মিশে গেছে ত্বকের সঙ্গে। নাক আর সুন্দর নিঃপ্রভ নাসারন্ধ্র একেবারে জীবন্ত মনে হয়। মুখটা যেনো আঁকা নয়, সত্যিকারের রক্তমাংসে গড়া। কণ্ঠার গর্ত ভালো করে পরীক্ষা করলে স্পন্দনও

অনুব্রব করা যাবে। সবাই স্বীকার করতে হবে, এই তৈলচিত্রটির সম্পাদন সবচেয়ে শক্তিমান শিল্পীকেও ভয়ে কাঁপিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। তিনি দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবিত একটা উপযোগী কৌশলও ব্যবহার করেছেন : যে মহিলাটি ছিলো অত্যন্ত রূপসী সেই মোনালিসাকে আঁকার সময় তিনি গায়ক, বাদক আর ভাড়াদার দিয়ে তার মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে তাকে প্রফুল্ল দেখায় এবং প্রতিকৃতির বেলায় প্রায়ই যেমন অবয়বে বিষন্নতা দেখা যায় তেমনটা না থাকে। এরই ফলাফল হিসেবে লিওনার্দোর এই তৈলচিত্রে মোহময় এক মৃদুহাসি দেখা যায় যা মানবিকের চেয়েও অনেক বেশি স্বর্গীয়; আর যারা তা দেখেছে তারা এর জীবন্ত উৎসের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে চমৎকৃত হয়েছে।



ভাসারি তৈলচিত্রটা নিজের চোখে কখনও দেখেন নি সেটাকে বিবেচনায় নিলে এই বিবরণ মোটের ওপর সঠিক। কিন্তু এতে কিছু বাদ পড়েছে আর ভুলও আছে। তিনি দুটো বিষয়ের উল্লেখ করেন নি যা ওই সময়ে ছিলো অপ্রচলিত : পটভূমির অদ্ভুত ভূ-দৃশ্য এবং সিটারের হাত; প্রতিকৃতিতে যা খুব একটা দেখা যেতো না। তিনি ভুরু বর্ণনা দিয়েছেন, যদিও ভুরু বলতে কিছু নেই—সংস্কারের সময় মুছে গেছে হয়তো—আর দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছেন যে, তৈলচিত্রটি ছিলো অসম্পূর্ণ। এইসব অসঙ্গতির কারণে ভাসারির বিবরণের অবশিষ্ট অংশ নিয়ে কতিপয় ঐতিহাসিকের মনের সংশয় দেখা দেয়। তিনি হয়তো প্রতিকৃতিটার একটা অসম্পূর্ণ কপি দেখে ছিলেন, অথবা এও হতে পারে যে, তিনি কারো কাছ থেকে শুনে ওই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন যে ব্যক্তি প্রতিকৃতিটা অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখেছিলো বা ওভাবেই বর্ণনা করেছিলো তার কাছে। এছাড়াও ভাসারি কম্পোজিশনের তারিখ আমাদের সামনে হাজির করে দাবি করছেন যে, মিলান থেকে ফ্লোরেন্সে ফিরে আসার পর (১৫০০) লিওনার্দো এটার কাজ আরম্ভ করেন আর কাজটা শেষ করতে তাঁর চার বছর লাগে।

বস্তুতঃ ইল মোরো নামেই পরিচিত মিলানের ডিউক লোদোভিকো স্ফোর্জার পৃষ্ঠপোষকতায় মিলানে কাজ করার উদ্দেশ্যে ১৪৮১ সালে ফ্লোরেন্স

ত্যাগ করেন লিওনার্দো। ১৪৯৯ সালের ডিসেম্বর ফরাসিদের হাতে লোদোভিকোর পরাজয় ঘটলে তিনি ফ্লোরেন্সে ফিরে আসেন। ১৫০৬ থেকে ১৫১৩ সালের মধ্যে লিওনার্দো প্রায়ই ফ্লোরেন্স এবং মিলানে যাতায়াত করতে থাকেন (ততোদিনে মিলান পুরোপুরি ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে) ১৫১৩ সালে তিনি যান রোমে এবং নয়া পোপ দশম লিও'র ভাই ফ্লোরেন্টাইন জিউলিয়ানো দে মেদিচির পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন। জিউলিয়ানো মারা গেলে (মার্চ ১৫১৬) ইতালি ছেড়ে লিওনার্দো চলে যান আমবোয়ায়, ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়ার দরবারে, সেখানেই তিনি মারা যান ১৫১৯ সালে।

লিওনার্দো আমবোয়ায় চলে গিয়েছিলেন ইতালিতে তার উচ্চতর যোগ্য পৃষ্ঠপোষক না পাওয়ার কারণে, ইউরোপের প্রধান শিল্পকেন্দ্র হিসেবে ফ্রান্স তখনও ওই জায়গাটিকে ছাপিয়ে যেতে পারে নি। সেখানে প্রতিযোগিতা ছিলো অদম্য। তৎকালীন ইউরোপের সবচেয়ে সমৃদ্ধ আর সর্বাধিক ব্যস্ত বাণিজ্যিক নগরী ভেনিসে তখন তিতিয়ানের একচ্ছত্র রাজত্ব। রোমে কিন্তু লিওনার্দোর খুব বেশি সুবিধা হলো না। পোপ মনে করলেন লিওনার্দো নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ লিওনার্দো তার কোনো কাজই সম্পূর্ণ করেন নি, সুতরাং রাফায়েলকেই বেছে নিলেন পোপ। রাফায়েল তখন তিরিশ বছর বয়সী এক উদীয়মান তারকা। সিস্টিন চ্যাপেলের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের পর মাইকেলএ্যাঞ্জেলো বয়স তখন চল্লিশ, ইতালির মহত্তম শিল্পী হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত হচ্ছেন তিনি, ভাস্কর্য আর তৈলচিত্রে সমানভাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী তিনি। অন্য কথায়, জিউলিয়ানো দে মেদিচির মৃত্যুর পর লিওনার্দো ফ্রান্সে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন কারণ রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়ার কাছ থেকে সবচেয়ে ভালো প্রস্তাবটা চেয়েছিলেন তিনি। সেটাকে বদান্যতাই বলা যেতে পারে : মোটা অংকের বার্ষিক অনুদান এবং একটা আরামদায়ক জমিদারি বাসভবন, কুস-লুসে, সেটা রাজকীয় বাসভবন আমবোয়া দুর্গের সঙ্গে একটা সংকীর্ণ গলিপথ দিয়ে সংযুক্ত ছিলো। এখানে এসে পৌঁছ মানুষটি এক ক্ষমতাবান রাজার সমাদর ভোগ করতে লাগলেন যে রাজা যাবতীয় ইতালিয় জিনিসে মানসিকভাবে আচ্ছন্ন, আর এখানেই তিনি পেলেন লেখা এবং গবেষণার জন্য কাঙ্ক্ষিত শান্তি ও নির্জনতা। রাজ দরবারের শোভায় পরিণত হলেন তিনি যা ছিলো ফ্রাঁসোয়ার পক্ষে মহাগৌরবের বিষয়, তিনি পার্টির আয়োজন করেন, ড্রয়িং আঁকেন, যান্ত্রিক খেলনা উদ্ভাবন করেন, আর তৈলচিত্রের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তার কোনো ফরাসি সহকারি ছিলো না, তিনি ফরাসি কোনো অনুগামীও রেখে যান নি। ফরাসি চিত্রকলার উত্তরকালীন ধারায় তাঁর তেমন প্রভাবও পড়ে নি। তিতিয়ান ও

মাইকেল এ্যাঞ্জেলোকে ফ্রান্সে আনার ব্যর্থ চেষ্টার পর হয়তো লিওনার্দোই ছিলেন ফ্রান্সোয়ার সবচেয়ে সেরা প্রাণ্ডি। না রাজা, না শিল্পী, কারো পক্ষেই সচেতন হওয়া সম্ভব ছিলো না যে, তাদের সম্মিলনে মোনালিসা এমন একটা কিছুতে পরিণত হবে যার সাফল্য অর্জিত হবে পাঁচ শতাব্দী পর, আর লুভরের মুকুটে সেটা হবে একটা অমূল্য রত্ন।

প্রকৃতপক্ষে লিওনার্দো কখন আঁকেন মোনালিসা? ভাসারির দাবি অনুযায়ী, লিওনার্দো দ্বিতীয় দফা ফ্লোরেন্সে অবস্থানকালে (অর্থাৎ ১৫০০ থেকে ১৫০৬ এর মধ্যে)। তাঁর এ দাবি বিপুলভাবে সমর্থিত হয়েছে আমাদের হাতে পাওয়া খুঁটিনাটি বিষয়ে সর্বাধিক সতর্ক ও প্রমাণভিত্তিক বিবরণে। ১১৯৩ সালে এ বিষয়টি উপস্থাপন করেন ফ্রাংক জোলনার—তাতে দেখা যায় মোটামুটি ১৫০৩ সালের মার্চে কাজ আরম্ভ করেছিলেন লিওনার্দো।^{৩১} কাজটা শেষ হয়ে থাকবে ১৫০৬-এর জুন মাসের দিকে, ওই সময় ফ্লোরেন্স ছেড়ে মিলানে চলে আসেন তিনি দ্বিতীয়বারের মতো সেখানে অবস্থানের জন্য (তবে এটাও হতে পারে, তিনি মোনালিসার কাজ চালিয়ে গেছেন)। জোলনার যে তারিখ উল্লেখ করেছেন অপরিহার্যভাবেই তা আনুষঙ্গিক, তবে দূর কল্পনার চেয়েও বেশি কিছু ওপর তা প্রতিষ্ঠিত।

১৫০৩ এর বসন্ত ও গ্রীষ্মে লিওনার্দোর আয় রোজগার ছিলো খুবই নগন্য, কিংবা একেবারে কিছুই না। তিনি নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলছিলেন, কিন্তু কিছুই হচ্ছিলো না। এর ফলে কাজ করানোর জন্য তাকে বেশ সহজেই পাওয়া যেতো। ১৫০০-এর আগে অবশ্য তিনি মোনালিসা আরম্ভ করতে পারতেন না, কারণ তখনও তিনি মিলানে, আর সেখানে তার যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

মানতুয়া আর ভেনিসে স্বল্পকাল অবস্থানের পর তিনি ফ্লোরেন্সে ফিরে আসেন ১৫০০-এর এপ্রিলে। ১৫০২ এর জুনের আগে মোনালিসার প্রতিকৃতি আঁকার কাজ তিনি গ্রহণ করতে পারতেন না, কারণ সে সময় তার হাতে প্রচুর কাজ ছিলো। ১৫০১ সালে যে সমস্ত কাজ করছিলেন লিওনার্দো তাঁর বিস্তারিত বিবরণ আছে, কিন্তু কোথাও মোনালিসার উল্লেখ নেই।

১৫০৩ এর মার্চের আগে ১৫০২-এর অধিকাংশ সময়টাতে তিনি ছিলেন পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডারের পুত্র বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত সিজার বর্জিয়ার স্থপতি এবং প্রধান প্রকৌশলী। সিজারের জন্য করা তাঁর সাময়িক কাজ তাঁকে নিয়ে যায় উর্বিনো, পেসারো, সেসেনা ও পোর্ভো সেসেনাতিকোতে। এভাবে দেখা যায় একজন ফ্লোরেন্টাইন ভদ্রমহিলার প্রতিকৃতি আরম্ভ করার সময় তাঁর একেবারেই ছিলো না কারণ তিনি ভয়ানক ব্যস্ত ছিলেন তখন।

১৫০৩-এর অক্টোবরের পরও যে আরম্ভ করেছিলেন তাও হতে পারে না, কেননা সে সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাজ (এবং টাকা) পেয়েছিলেন তিনি : অগ্গিয়ারির যুদ্ধ বিষয়ক একটা মুরাল *Anghiari* (শীগগীরই সেটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়, কারণ লিওনার্দো সেটা নির্মাণ করেছিলেন অনুপযুক্ত উপাদান দিয়ে)।

এখানে একটা ফাঁক থাকে : ১৫০৩-এর মার্চ ও অক্টোবরের মধ্যবর্তী সময়, হতে পারে এরই মধ্যে কোনো একটা সময়ে। এর পক্ষে সত্য বলে দূর সমর্থনকারী কিছু প্রমাণও আছে : রাফায়েলের অনেক কাজই পরোক্ষভাবে মোনালিসাকে তুলে ধরে তা স্পষ্ট।^{১২} রাফায়েল নিশ্চয়ই প্রতিকৃতিটা দেখেছিলেন, সম্ভবত অনমাণ্ড অবস্থায়। ভাসারির কথা ঠিক হলেও হতে পারে।

তবে এ ব্যাপারে কোনো ঐক্যমত্য তৈরি হয় নি। ১৯৩৯ সালে কেনেথ ক্লার্ক শুরু তারিখ হিসেবে ১৫০৩ সালকে মেনে নেন। কিন্তু ১৯৭০ সাল নাগাদ তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, লিওনার্দো ১৫০৪ সালে লিসা গেরার্দিনির নকশাটা আঁকেন এবং প্রতিকৃতিটা তৈরি করেন পরবর্তীকালে, ১৫০৬ থেকে ১৫১০ সালের মধ্যে, আর এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই সেটাকে চূড়ান্ত করেন।^{১৩} এটা নিশ্চিতভাবেই সম্ভব যে, কম্পোজিশনটা তৈরির সময়েই তিনি লিসার মূল বৈশিষ্ট্য থেকে সরে যান, যেহেতু তিনি ক্রমবর্ধমান হারে বিষয়টার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছিলেন, আর এর ফলে মূল ড্রয়িং অনুসরণ করা হয় নি তাঁর পক্ষে, ছবিটাও কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতি থাকে নি। কেন তিনি ছবিটা ফ্রান্সেস্কো ইল গিওকোন্দাকে দেন নি, সে ব্যাখ্যাও মেলে এ থেকে; তাছাড়া এ সম্ভাবনাও উন্মুক্ত রয়ে যায় যে, লিওনার্দো ছবিটার বেশিরভাগ অংশ আঁকেন ১৫০৩-০৬ সালে এবং তার পরেও এ নিয়ে কাজ চালিয়ে যান মাঝে মাঝে।^{১৪}

মোনালিসা লিসার প্রতিকৃতি হিসেবে জীবন শুরু করে এবং আরেকজনে রূপান্তরিত হয় এই ধারণা থেকে আরো কিছু সম্ভাবনা দেখা দেয়। দুই লিসার একটা হাইপোথিসিস আছে : লিওনার্দো প্রথমে লিসার তৈলচিত্র আঁকেন এবং লিসার স্বামীর কাছে সেটা হস্তান্তর করেন, আর এই প্রতিকৃতিরই বিবরণ দিয়েছেন ভাসারি; তবে এর একটা কপিও তৈরি করেছিলেন লিওনার্দো, সেটার রূপান্তর ঘটান, নিজের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করেন, সঙ্গে করে ফ্রান্সে নিয়ে যান সেটা। প্রথম প্রতিকৃতিটা হারিয়ে গেলেও দ্বিতীয়টি রক্ষা পায়, বর্তমানে আমরা যেটা দেখছি এবং ভালোবাসছি।^{১৫} এসবের কোনোটিরই বাস্তব প্রমাণ নেই, তবে এই খিণ্ডিতে জাদু আছে : সম্ভবত প্রথম প্রতিকৃতিটা একেবারেই

হারিয়ে যায় নি, কোথাও না কোথাও আছে, হয়তো কারো চিলেকোঠায়। যখন আমরা নিশ্চিত নই, তখন যে কোনো কিছুই সম্ভব।

কে ছিলো লিসা গেরার্দিনি? ব্যক্তিগতরো দি সান গিওভান্নির রেজিস্ট্রি থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় তার জন্ম ফ্লোরেন্সে, ১৪৭৯ সালের ১৫ জুন, মঙ্গলবার। তাদের পরিবার যদিও আহামরি পর্যায়ের ধনী ছিলো না, তবে মাঝারি পর্যায়ের অভিজাত্য ছিলো। তার বাবা আন্তোনমারিয়া যৌতুকের ব্যাপারে তখনকার নিয়মানুযায়ী ঘোষণা দিয়ে জানান, তার যৌতুক দেয়ার সামর্থ্য নেই। ষোলো বছর বয়সে লিসা এক ব্যক্তিকে বিয়ে করে যে ছিলো লিসার চেয়ে উনিশ বছরের বড় আর দু'বার বিপত্নিক। তার নাম ফ্রান্সেস্কো দি বার্তোলোমিও দি জানোবি দেল গিওকোন্দা, ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত এক লোক। ততোদিনে লিসার বাবা মোটামুটি যৌতুক জোগাড় করতে পেরেছিলেন, ১৭০ ফ্লোরিন। এটা ছিলো মাদ্রালেনা স্কজ্জি দোনির যৌতুকের আট ভাগের এক ভাগ (একই ভঙ্গিতে মাদ্রালেনার প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন রাফায়েল, ১৫০৬ সালে) কিন্তু মাদ্রালেনা এসেছিলো ফ্লোরেন্সের অন্যতম ধনী একটি পরিবার, স্কজ্জি থেকে এবং সমান ধনী আরেকটি পরিবারে (অর্থাৎ দোনি পরিবারে) বিয়ে করে ছিলো। লিসার যৌতুক সম্ভবত তার সামাজিক মর্যাদায় গড়পড়তা ছিলো। লিওনার্দো যে সময়ে তার প্রতিকৃতি আঁকা শুরু করেন ততোদিনে সে তিনু সন্তানের মা, সেই সন্তানদের একজন এক মেয়ে মারা গিয়েছিলো ১৪৯৯ সালে।

১৫০৩ সালে ফ্রান্সেস্কো দেল গিওকোন্দা তার তরুণ পরিবারসহ নতুন একটা বাড়িতে উঠে আসেন। একজন সমৃদ্ধশালী সওদাগর হয়ে তার তরুণী স্ত্রীর প্রতিকৃতি আঁকার জন্য একজন প্রধান শিল্পীকে বলার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে পারতেন না তিনি, এমন ইঙ্গিত করেছেন জোলনার। লিসা এরই মধ্যে তাকে দুটো শিশুপুত্র দিয়েছে, দ্বিতীয় পুত্রটি সদ্য জন্ম নিয়েছে (ডিসেম্বর ১৫০২), আনন্দ উৎসবের সেটাও একটা কারণ ছিলো।^{১০} এখনকার মতো তখনও নব্যধনীরা প্রতিষ্ঠিত বিস্তশালীদের থেকে আচার-আচরণে এগিয়ে ছিলো। খ্যাতিমান স্থানীয় শিল্পীদের কাছ থেকে শিল্পকর্ম কেনা একটা বিষয়, আর এ বাবদ চলতি মূল্য দেয়ার সামর্থ্য ছিলো ফ্রান্সেস্কোর। কাজেই লিসা হাসবে না কেন? তার ছিলো সম্পদশালী ও স্নেহপরায়ণ স্বামী, দুই পুত্রসন্তান, আর একটা ঝলমলে নতুন বাড়ি। লিওনার্দো প্রতিকৃতিটা শেষ করে হস্তান্তর করলে ফ্রান্সেস্কো ও লিসা সেটা দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতেন, মোনালিসা হয়তোবা লুভরে ঠাই পেতো না।

আমাদের গণতান্ত্রিক যুগে এটা কিছুটা আবেদনময় হতে পারে যে, মধ্যবিস্ত শ্রেণীর গেরার্দিনি পরিবারের কন্যা একজন সাধারণ সওদাগরের

অনুগতা (আমার অনুমান) স্ত্রী, পিয়েরো ও অন্ড্রিয়ার স্নেহশীলা মায়ের চেহারাটি বিশ্বের সবচেয়ে পরিচিত অহিকনে পরিণত হতে পেরেছে, ব্যবহৃত হয়েছে বিজ্ঞাপনে, মগে, ছাইদানিতে, ক্যালেন্ডারে, ফোন্ডারে, টি-শার্টে এবং কম্পিউটারের মাউসপ্যাডে। আমরা যতদূর পর্যন্ত ধারণা করতে পারি, তার ড্রয়িং করার সময় লিওনার্দোর সামনে অনড় হয়ে বসে থাকা ছাড়া সারাজীবনে ব্যতিক্রমী আর কিছুই করে নি লিসা। অ্যান্ডি ওয়ারহলের বিখ্যাত একটি কথা আছে। তিনি লিখেছেন, ভবিষ্যত প্রত্যেকেই পনেরো মিনিটের জন্য বিখ্যাত হবে। লিসা বিখ্যাত হয়ে রয়েছে পাঁচ শতাব্দী জুড়ে, একেবারে কিছু না করে-ই।

সিটারকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যক্তি হিসেবে, অন্তত তার পেইন্টারের সামাজিক মর্যাদার পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করার কিছু কিছু ভাষ্যকারের অসচেতন ইচ্ছা জাগে হয়তো। কারো কারো কাছে এটা হতবুদ্ধিকর লাগতে পারে যে, লিওনার্দো কখনও কোনো রাজার ছবি আঁকেন নি, কোনো রাণীর ছবি আঁকেন নি, আঁকেন নি পোপের ছবি, তারচেয়ে বড় কথা তাঁর পৃষ্ঠপোষক ডিউক লোদোভিকো স্ফোর্জা যার কাছে লিওনার্দো ছিলেন প্রায় ২০ বছর, কখনও তার প্রতিকৃতি আঁকতে বলেন নি তাঁকে। অবশ্য কেউ কেউ দাবি করেন, প্রকৃত সিটার আসলে রেনেসাঁ যুগের অসাধারণ নারীদের একজন, ধনী ও ক্ষমতামণ্ডলী ইসাবেলা দেস্টে, মানতুয়ার মারকুইস, যে কিনা তার প্রতিকৃতি আঁকার জন্য লিওনার্দোকে নিযুক্ত করেছিলো। বস্তুত ১৫০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লিওনার্দো মানতুয়ায় গিয়েছিলেন আর ইসাবেলার প্রতিকৃতিও এঁকেছিলেন, সেটা এখন লুভরে শোভা পাচ্ছে (৮ নম্বর ছবিটি দেখুন)।^{১৭}

ইসাবেলা দেস্টে লিওনার্দোর একটা বিষয় হিসেবে খুবই উপযুক্ত হয়ে থাকতে পারতো। ১৮৯৯ সালে লিওনার্দোর প্রথম জীবনীকারদের একজন ইউজিন মুস্তজ বিপুল প্রশংসা করেন তার; সে ছিলো চমৎকার গৃহিনী, 'স্নেহপরায়ণ কিন্তু কঠিন মা; রেনেসাঁ যুগের সর্বাধিক সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন নারী এবং ব্যতিক্রমী নৈতিক গুণ ও রুচির অনুরাগী।'^{১৮}

কোনো সন্দেহ নেই, ইসাবেলা চেয়েছিলো লিওনার্দো তার প্রতিকৃতি আঁকুক। ১৪৯৮ সালে লিওনার্দোর আঁকা তার প্রতিকৃতি প্রদর্শনের কথা বলে সিসিলিয়া গ্যালেরানিকে চিঠি লিখেছিলো সে—*Lady with an Ermine* হচ্ছে সেই প্রতিকৃতি। সিলিলিয়া তার ইচ্ছাপূরণে সম্মত হয়েছিলো, তবে এটা উল্লেখ করেছিলো যে, ছবিটা আর ইসাবেলার মতো দেখাচ্ছে না—চিত্রকরের কোনো দোষে নয়, শিল্পী তো এক গুস্তাদ যার কোনো জুড়ি নেই; কারণটা হলো ইসাবেলা আর তরুণী ছিলো না।^{১৯} লিওনার্দোর পেছনে প্রায় আট বছর

লেগে ছিলো ইসাবেলা, তার কাছ থেকে সে কেবল অনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাচ্ছিলো, এবং ১৫০০ সালে ইসাবেলার ড্রয়িং আঁকার চেয়ে বেশি আর কিছু করেন নি তিনি। যদি না ইসাবেলা দেস্তেই মোনালিসা হয়, যেমনটা ১৯৪৬ সালে দাবি করেছিলেন রেমন্ড স্টাইটস, এবং অতি সম্প্রতি হিদেমিচি তানাকা।^{৪০}

তবে আরো বিশিষ্ট প্রার্থীরাও রয়ে গেছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে সেইলেন্স, দুমিত্রি মেরেঝকভস্কি ও ত্রিস্তান ক্রিংসরের মতো লেখকরা দাবি করেন যে, আসল লিসা ছিলো নেপল্সের এক অভিজাত, ফ্রান্সভিলার ডাচেস কস্তানজা দাভালোস। বিশ শতকের প্রথমার্ধে ইতালিতে এই হাইপোথিসিস জনপ্রিয় ছিলো। বেনেদেত্তো ক্রোসের মদদপুষ্ট হয়ে এটাকে আরো এগিয়ে নেন আদোঙ্কা ভেতুরি, ১৯৩৩ সালে এনসাক্রোপেদিয়া ইতালিয়ানায় লিওনার্দোর এন্ট্রিতেও তা যুক্ত করেন।^{৪১} কস্তানজা ছিলো একজন অভিজাত ফেদেরিকো দেল বালজোর স্ত্রী, পনেরো শতাব্দির শেষ দিকে ফরাসিদের হাত থেকে পুণরায় নেপল্স উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলো এই ফেদেরিকো। ইতালিয় দেশানুরাগীদের কাছে লিসা দেল গিওকোন্দার চেয়ে কস্তানজাই ছিলো উত্তম বাছাই। তবে এতে সমস্যা আছে একটা : প্রতিকৃতিটা যে সময় আঁকা হয় তখন কস্তানজার বয়স চল্লিশ, গিওকোন্দা হবার পক্ষে বেশ বয়স্কই বলা চলে।

লিওনার্দোর সাম্প্রতিক জীবনী গ্রন্থের লেখক কার্লো ভেচে দাবি করেছেন ‘লিসা’ আসলে নেপল্সের ইসাবেলা গুয়ালান্দা নামের এক ভদ্রমহিলা, যে ছিলো বিখ্যাত কবি ভিগোরিয়া কোলোন্নার বান্ধবী। কার্লোর তত্ত্বটা হলো, লিওনার্দো ১৫০৪ সালে লিসা গেরার্দিনির প্রতিকৃতি আঁকতে শুরু করেন, সেটা নিয়ে কাজ করেন চার বছর, কিন্তু কখনই শেষ করেন নি—ভাসারি যেমন দাবি করেছিলেন।^{৪২} গিউলিয়ানো দে মেদিচির অনুগামী হিসেবে লিওনার্দো যখন রোমে ছিলেন (১৫১৩-১৬) সেই সময় তাকে ইসাবেলা গুয়ালান্দার প্রতিকৃতি আঁকার কথা বলা হয়। তিনি তাতে রাজি হোন, এবং সঙ্গে ক’রে নিয়ে আসা অসমাণ্ড প্রতিকৃতিটায় পরিবর্তন ক’রে ইসাবেলার চেহারায় রূপান্তরিত করেন।^{৪৩} ভেচে প্রথম যখন এই হাইপোথিসিস তুলে ধরেন তখন সেটা নিয়ে বার্মিংহাম এক্সপ্রেস অ্যান্ড স্টার পত্রিকায় (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১) এভাবে প্রতিবেদন লেখা হয়েছিলো : মোনালিসা ছিলো উঁচু পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত বেশ্যা, বলেছেন নেপল্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্লো ভেচে। তিনি বলেন, ‘সে সুন্দরী ছিলো আর খুব দ্রুত ভ্যাটিকানও অধিকার ক’রে নিয়েছিলো।’ গল্পটা অবশ্যই আবেদনময়, কিন্তু রোমে থাকাকালে কোনো কিছু লিওনার্দো

এঁকেছিলেন কিনা তার সমকালীন কোনো রেকর্ড নেই। অবশ্য ভাসারি যেমন লিখেছেন, পোপ দশম লিও (গিউলিয়ানোর ভাই) অভিযোগ করেন যে, লিওনার্দো কখনই কোনো কাজ শেষ করেন নি, কেননা তিনি কাজটির শেষ হওয়া নিয়ে অতিমাত্রায় ভাবেন।^{৪৪} এর আগের এক নিবন্ধে ভেঁচে ঘোষণা করেন, 'আমরা কেবলমাত্র নিশ্চিত হতে পারি মোনালিসা আসলে মোনালিসার প্রতিকৃতি নয়।'^{৪৫} কিন্তু মানুষ অনিশ্চয়তা পছন্দ করে না; তাঁর লেখা লিওনার্দোর জীবনীতে (১৯৯৮) ভেঁচে বলেন, 'তিনি নিশ্চিত, লুভরে যেটা খোলানো আছে সেটা ইসাবেলা ওয়ালান্দার প্রতিকৃতি।'^{৪৬} ইতালির প্রধান লিওনার্দো বিশেষজ্ঞ কার্লো পেদরেসিও এ ব্যাপারে একমত।^{৪৭} ফ্লোরেন্স ১৯৮৮ সালের ২৮ জুলাই ও ১৫ অক্টোবরের মধ্যে অনুষ্ঠিত লিওনার্দো কম্পার্সো এ রিট্রোভাতো প্রদর্শনীর ক্যাটালগও সমবৈশিষ্ট্যসূচক : মোনালিসাকে রিট্রোভাতো দি ইসাবেলা ওয়ালান্দা দেস্তো মোনালিসা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে। আর তারিখও দেয়া হয়েছে ১৫১৩-১৫ সালের। লিওনার্দো ওই সময় রোমেই ছিলেন। ১৯৫৬ সালে পেদরেসিও এটা সম্ভব মনে করেন যে, যাকে নিয়ে এতো প্রশ্ন সেই মহিলাটি হয়তোবা গিউলিয়ানোর রক্ষিতা পাসিফিকা ব্রানদানো।^{৪৮} ১৯৫৩ সালে বলা হয়েছিলো, তিনি মনে করেন মহিলাটি রক্ষিতা নয়, আসলে গিউলিয়ানোর স্ত্রী ফিলিবের্তা দি সাদোয়া।^{৪৯} যদিও শিল্পের ইতিহাসবিদদের মধ্যে একটা সংখ্যালঘু অংশের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, পেদরেসিও ও ভেঁচের তারিখ একই সঙ্গে মিলিত হয়েছে ইতালির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন আর.এ. আই'র সাংস্কৃতিক তথ্য-উপাস্তের মধ্যে।^{৫০}

লিসা গেরার্দিনি হিসেবে মোনালিসাকে শনাক্ত করণের বিরুদ্ধে এই সব যুক্তি তর্কের একমাত্র ভিত্তি হলো সেই সহজলভ্য সূত্র যিনি লিওনার্দোর জীবনকালেই সম্ভবত মোনালিসা দেখেছিলেন। এই ব্যক্তি ভাসারি নন, আমরা জানি ভাসারি কখনই প্রতিকৃতিটা দেখেন নি কিংবা লিওনার্দোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি, তাছাড়া ভাসারি মনে করতেন প্রতিকৃতিটা কখনও সম্পূর্ণ করা হয় নি। হতে পারে ভাসারির তথ্য প্রদানকারী অসমাণ প্রতিকৃতিটা দেখেছিলেন, তখনও পটভূমির নকশা আঁকাই হয় নি (ভাসারি এর উল্লেখ করেন নি কেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এ থেকে)। হয়তো, আমার কাছে এটাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা মনে হয়—অতঃ লিওনার্দো নিজেই কাজটাকে অসমাণ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন, সুঁদাল তার *Hsitoire de la peinture en l'Italie* (১৮১৭) গ্রন্থে এরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন।^{৫১}

লিওনার্দোর সমকালীনদের মধ্যে একজনই কেবল মোনালিসা দেখার

প্রকৃত দাবি করেছেন এবং একটা ডকুমেন্ট রেখে গেছেন, তিনি লুক্রেজিয়া বর্জিয়া ও ইসাবেলা দেস্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নেপল্সের একজন রাজকুমার কার্ডিনাল লুইগি দারাগোনা'র বিশ্বস্ত সচিব আন্তোনিও দে বিয়াতিস। দারাগোনা ছিলেন ব্যর্থ পর্যটক, দে বিয়াতিসকে তাদের ভ্রমণের একটা বিস্তারিত ডায়েরি রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।^{৭২} সম্ভবত এই জুটিই প্রথম পর্যটক যারা *মোনালিসা* তৈলচিত্রটি দেখেছিলেন। ১৫১৭ সালের মে মাসে তারা ইতালি ত্যাগ করেন, এরপর সফর করেন টাইরাল, সুইজারল্যান্ড, বাভারিয়া, কোলন ও হল্যান্ড। আগস্ট মাসে তারা পৌছান ক্যালাইসে, উদ্দেশ্য ছিলো ইংল্যান্ডে অষ্টম হেনরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। কিন্তু লন্ডনে একটা মহামারী ছড়িয়ে পড়ার খবর শুনে, খবরটা সম্ভবত ছিলো মিথ্যা, তারা রোউয়েনে আসেন, সেখানে 'সর্বাধিক খৃস্টান রাজা' প্রথম ফ্রান্সোয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে। এরপর তারা আসেন অ্যামবোয়ায়, তাদের বিখ্যাত দেশী মানুষ লিওনার্দোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।^{৭৩}

এ সম্পর্কে দে বিয়াতিস যে বিবরণ রেখে গেছেন তা খুবই মন্তব্যধর্মী এবং তা নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে। তিনি লিখেছে, 'লিওনার্দো, আমাদের সময়ের সবচেয়ে বিখ্যাত চিত্রকর, এবং সমুদ্র বহরের এক বৃদ্ধ (প্রকৃতপক্ষে পঁয়ষট্টি বছর), এখন আর ছবি আঁকতে পারেন না কারণ তিনি ডান হাত ব্যবহার করতে অপারগ হয়ে পড়েছেন (প্রকৃতপক্ষে লিওনার্দো ছিলেন বাম-হাতি)।'^{৭৪} তাদের দেখানো হয়েছিলো তিনটি তৈলচিত্র—*Tucti perfectissimi*-এর একটি ছিলো তরুণ সেন্ট জন, অন্যটি *Anne with virgin and child*, দুটোই এখন লুভরে। তৃতীয় তৈলচিত্রটি, দে বিয়াতিস লিখেছেন, ফ্লোরেন্সের এক অভিজাত ভদ্র মহিলার প্রতিকৃতি যেটা আঁকতে দিয়েছিলেন মৃত গিউলিয়ানো দে মেদিচি। দে বিয়াতিস শুধু যদি লিখতেন 'ফ্লোরেন্সের একজন অভিজাত ভদ্রমহিলা' তাহলে *মোনালিসা* হিসেবে একজনকেই ধরে নেয়া যেতো—সে লিসা গেরার্দিনি। কিন্তু 'গিউলিয়ানো আঁকতে দিয়েছিলেন'? গিউলিয়ানো অন্তত লিসার প্রতিকৃতি আঁকতে দিতে পারেন না। তাহলে কি ছবির মহিলা ইসাবেলা গুয়ালান্দা? না কি কস্তানজা দাভালোস? কিন্তু তারা কেউ তো ফ্লোরেন্সের নন। হয়তো সেটা ছিলো তথাকথিত 'কলোম্বাইন' গিওকোন্দা, এখন যা বুলছে সেন্ট পিটার্সবুর্গের হার্মিটেজে। সেটা এখন গণ্য করা হয় লিওনার্দোর শিষ্য ফ্রানসেস্কো মেলজির কাজ হিসেবে। লিওনার্দো হয়তো সে কথাই বলেছিলেন, এবং আরো বলেছিলেন এজন্য সেটা আরাগোনের কার্ডিনালকে দেখানো দরকার।^{৭৫} কিন্তু

লিওনার্দো কী বলছেন তা হয়তো বুঝতে ভুল করেছিলেন দে বিয়াতিস, ফলে এক সমাপ্তিহীন বিতর্কের সূচনা ঘটান।

ইতিহাসবিদদের জন্য বিষয়টা আরো জটিল হয়ে ওঠে যখন দে বিয়াতিস লেখেন, লিওনার্দোর সঙ্গে দেখা করার পর কার্ডিনাল ওই দিন নিকটবর্তী শাতো দে ব্রুইস পরিদর্শনে যান, সেখানে তিনি এক মহিলার প্রতিকৃতির পাশে থাকেন এবং উল্লেখ করেন “ ‘অদ্ভুতমহিলা লেডি ওয়ালান্দার মতো সুন্দরী নন’ ।” বিবরণীতে ইসাবেলা ওয়ালান্দার কথা উল্লেখ করা ছিলো না। মহিলাটি কি ছিলেন সেই ‘ফ্লোরেনটাইন লেডি যার প্রতিকৃতি দেখা হয়েছিলো আগের দিন? কিন্তু তা কি ক’রে হয়? তিনি তো ফ্লোরেন্সের নন...

এটা সম্ভব যে, লিওনার্দো লিসা দেল গিওকোন্দার প্রতিকৃতিটা তার স্বামীর কাছে হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু তার রক্ষক আর পোপের ভাই গিউলিয়ানো দে মেদিচির মতো এক ক্ষমতাবান ব্যক্তির আঁকতে দেয়া প্রতিকৃতি নিজের কাছেই রেখে দেবেন তিনি এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সম্ভাবনাসমূহের ভারসাম্য করতে হলে বলঅ চলে বিয়াতিস ও কার্ডিনাল দারাগানকে যে প্রতিকৃতিটা লিওনার্দো দেখিয়েছিলেন সেটা প্রকৃতই ছিলো লিসা গেরার্দিনির প্রতিকৃতি, যাইহোক সেটাকে ফ্লোরেনটাইন লেডি হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকতে পারে। এই ধারণা সুদৃঢ় হয় আরো একটি বহুল-কথিত সূত্র কাসিয়ানো দেল পোজ্জার থেকে। দেল পোজ্জা ১৬২৬ সালে ফন্টেইনব্রিউ সফর করেন। লুভরে এখন যে তৈলচিত্রটি ঝুলছে সেটার পরিষ্কার বর্ণনা দিয়ে যান তিনি। শিল্পকর্মটি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পান দেল পোজ্জা, কারণ বার্নিশের জন্য রঙের পরিবর্তন ঘটেছিলো। কাসিয়ানো ছিলেন লিওনার্দোর অনুরাগী এবং শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। রঙের পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রতিকৃতিটা তার মনের ওপর প্রভাব ফেলেছিলো, তিনি লিখেছেন, ‘এটা শিল্পীর সুবিখ্যাত কাজ, কারণ মেয়েটির কথা বলার ক্ষমতাই শুধু নেই।’^{৫৬} কাসিয়ানো এই তৈলচিত্রটিকে ‘লা গিওকোন্দা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আর এভাবে বর্ণনা করেছেন : মধ্য বিশ বছর বয়সের এক নারী, মুখটা ঝানিক ফোলা ফোলা, সাদামাটা পোশাক, হাত দুটো সুন্দরভাবে আঁকা হয়েছে আর ভুরু হারিয়ে গেছে। তিনি হয়তো ভাসারির লেখা পড়েছিলেন, হারানো ভুরু আর ‘সুন্দর’ দাঁতের মন্তব্য ভাসারির নয়, তা অন্য কিছু নির্দেশ করে। অন্যদিকে ফন্টেইনব্রিউ মঠের ফাদার সুপিরিয়র পিয়েরে দান তাঁর *Le tresor des merveilles de la maison royale de Fontainebleau* গ্রন্থে লেখেন, তিনি সেখানে ১৬৪২ সালে সম্ভ্রান্ত এক ইতালিয় মহিলার প্রতিকৃতি

দেখেছিলেন যার নাম 'মোনালিসা', সাধারণভাবে 'লা জোকোন্দে' হিসেবে পরিচিত।^{৭৭} এটা তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে, কারণ এটা 'মোনালিসা'কে 'গিওকোন্দা'র সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত করে।

যাহোক, এই বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারে এমন প্রমাণের নিদারুণ অভাব রয়েছে। সেজন্যেই এগুলো শেষ পর্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আমরা যা পেয়েছি সেটা হলো ভাসারির লেখা একটা প্যারাগ্রাফ (যে ভাসারি কখনই প্রতিকৃতিটা চাক্ষুষ করেন নি), একজন পর্যটকের ডায়েরির কয়েকটা লাইন এবং এক কার্ডিনালের অস্পষ্ট বর্ণনা। বাকিটা জনশ্রুতি। সুতরাং ইতিহাসবিদদের জন্য এটা স্বীকার করা করণীয় হয়ে দাঁড়ায় যে, স্বাক্ষর প্রমাণের ওজন থেকে যদিও বোঝা যায় মোনালিসা হচ্ছে মোনালিসার প্রতিকৃতি, তবে সেটার ওজন খুব ভারী নয়, হালকা। কাজেই অবাক হওয়ার কিছুই নেই যে ১৯৮১ সালে শিল্প ইতিহাসবিদ মার্টিন কম্প সতর্কতার সঙ্গে ছবিটার নামকরণ করেন—*Portrait of a Lady on a Balcony* হিসেবে।^{৭৮}

১৯৯১ সালে দু'জন পণ্ডিত, জেনিস শেল এবং গ্রাজিওসো সিরোনি, নতুন একটা হাইপোথিসিস প্রকাশ করেন। আন্দ্রিয়া সালাই-এর বর্ণনামূলক তালিকা আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে ওই হাইপোথিসিস তৈরি করেন তারা। আন্দ্রিয়া সালাই (প্রকৃত নাম গিয়ান গিয়াকোনো পকাপ্রন্তি) ছিলেন লিওনার্দোর সহকারি, পালিত পুত্র, হয়তো অনুরাগী। তারা দাবি করেন, ওই আবিষ্কারের ফলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, মোনালিসা আসলে লিসা গেরার্দিনি এবং তারিখটাও নিশ্চিত হওয়া যায়। তারা বলেন, লিওনার্দোর মৃত্যুর পর মোনালিসা আর ফ্রান্সে থাকে নি। ইতালিতে ছবিটা ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আবার নিয়ে যাওয়া হয় ফ্রান্সে।^{৭৯} শেল ও সিরোনির এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা বেশ হৈ চৈ ফেলে দেয়। সংবাদপত্রেও এ নিয়ে হেডলাইন লেখা হয়। ২৭ জানুয়ারি ১৯৯১ অবজারভার লেখে: গিওকোন্দার হাসিটি কি সত্যিই তোমার? দুই গবেষক যেমন ইঙ্গিত করেছেন, আসলে লিওনার্দোর মৃত্যুর পর মোনালিসার কী ঘটেছিলো তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ধারণা করা হয়, সেটা পেয়েছিলো ফ্রান্সেস্কো মেলজি। লিওনার্দোর উইল অনুযায়ী (যে উইলের আদি কোনো নমুনা আমরা পাই নি) মেলজি ছিলো লিওনার্দোর উত্তরাধিকারী এবং সে-ই তার বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র পেয়েছিলো।^{৮০} সালাই পরবর্তী সময়ে বিয়ে করেছিলো, ১৫২৪ সালের ১৯ জানুয়ারি মিলানে ফরাসি সৈন্যরা তাকে হত্যা করে, সম্ভবত একটা বচসার পর। সে কোনোও উইল রেখে যায়

নি, তাই তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে ১৫৫২ সালের ২১ এপ্রিল তার সম্পত্তির একটা তালিকা করা হয়। এই তালিকার মধ্যে বিপুল সংখ্যক ছবিও ছিলো: Leda with Swan, st jerome, st Anne, Virgin with child, Joconde এবং আরও অনেক। এসব কি ছিলো লিওনার্দোর কাজ? লিওনার্দোকে উল্লেখ করা হয় নি, তবে ওই শিল্পকর্মগুলোর মূল্য থেকে অনুমান করা যায় ওগুলো নকল ছিলো না; সে সময় এক লেডার মূল্য ছিলো ১,০১০ লিরা, সালাই-এর বাড়িটার যা দাম ছিলো প্রায় তার সমান; Joconda'র মূল্য ছিলো ৫০৫ লিরা, St. Anne-এর মূল্যও তাই। লিওনার্দো হয়তো তার মৃত্যুর আগে সালাইকে এগুলো দিয়েছিলেন।^{৬১}

শেল আর সিরোনির কথা যদি ঠিক হয়, এবং তালিকায় উল্লেখকৃত Joconda যদি বস্তুতই মোনালিসা হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ হলো সালাই ওটা ইতালিতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো এবং পরে ফ্রাঁসোয়ার পাঠানো এজেন্টরা ওটা কিনে নিয়েছিলো। অবশ্য এও সম্ভব যে, লিওনার্দোর শিল্পকর্ম নকল করেছিলো সালাই, আর সেগুলো আসল বলে মনে করেছিলো মিলানের তালিকা প্রস্তুতকারীরা।

সাধারণ মতামতের বিপরীতে প্রথম নিহিতার্থ হলো, প্রথম ফ্রাঁসোয়া হয়তো মেলজি বা লিওনার্দোর কাছ থেকে মোনালিসা নাও কিনতে পারেন। পরবর্তী বিবরণ থেকে দেখা যায়, এ জন্যে তিনি বড় অংকের টাকা দিয়েছিলেন।^{৬২} দ্বিতীয় নিহিতার্থ হলো, যা ক্রপদী ভঙ্গিমায় পরিণত হয়েছিলো একজন নারীর সেই ভঙ্গিমার প্রতিকৃতিকে 'গিওকোন্দা' বলে উল্লেখ করা ততোদিনে চালু হয়ে গিয়েছিলো। তালিকাটা কি ভাসারির বিবরণ নিশ্চিত করে? দ্ব্যর্থহীনভাবে নয়, তবে মনে হয় Joconda হিসেবে বর্ণিত প্রতিকৃতিটা ফ্রান্সেস্কো দেল গিওকোন্দার স্ত্রীর, ইসাবেলা দেস্তে কিংবা ইসাবেলা গুয়ালান্দার নয়। এতে দেখা যায়, Gioconda নামে একটা তৈলচিত্র শিল্পী লিওনার্দো ও অন্যান্য শিল্পকর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ফ্রান্সের রাজকীয় সংগ্রহশালার অংশে পরিণতি হয়েছে। এই স্বস্তিদায়ক নিহিতার্থ সিলভি বেওইনের মতো লুভর বিশেষজ্ঞদের, কেননা এতে তাদের বিখ্যাত প্রদর্শন বস্তুটির পরিচিত নিশ্চিত হয়।^{৬৩}

সাক্ষ্য-প্রমাণের স্বল্পতা যদিও বিশেষজ্ঞদের বিভক্ত করে ফেলে, তবে অন্যদের জন্য তা দরজা খুলে দেয়। অন্যদিকে 'আসল' মোনালিসা হলো X, Y নয় এই বিতর্ক সংবাদপত্রের মনোযোগ আকর্ষণে কখনও ব্যর্থ হয় না।

রেনেসাঁ যুগের শিল্পকর্ম বিষয়ক অনিশ্চয়তায় অনন্যসাধারণ কিছু নেই।

কেননা সে সবার রেকর্ড বিক্ষিপ্ত। শিরোনাম দেয়া হতো না। স্বাক্ষর থাকতো খুবই কম। পরিণতি হিসেবে শনাক্ত করা মুশকিল হয়ে পড়তো। কার আঁকা, কখন এবং কোথায়, বোঝা সহজ ছিলো না। মোনালিসার সমস্যায় যে গবেষণা তা ওই শিল্পকর্মের জনপ্রিয়তারই ফলাফল। এর চেয়ে অনেক কম সময় খরচ করা হয়েছে আরেকটি সমান রহস্যময় প্রতিকৃতির পেছনে, সেটিও লিওনার্দোর আঁকা, এক সৌন্দর্যময়ী ও সামান্য আবিষ্ট নারীর প্রতিকৃতি—লিওনার্দোর অন্যতম প্রথম জীবনীকার গ্যাব্রিয়েল সেইলেস ১৮৯২ সালে ‘মোহনীয় ও নিষ্ঠুর’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন সেটাকে।^{৬৪} সপ্তদশ শতকে ওই নারীর পরিচিতি সম্পর্কে বলা হয় সে *La Belle Ferronniere*, প্রথম ফ্রাঁসোয়া’র রক্ষিতা। ওটা প্রকৃতপক্ষে মিলানে আঁকা হয়েছিলো, সম্ভবত ১৪৯০ সালে। সিটারটি ছিলো মিলানের এক মহিলা, সম্ভবত লুক্রিজিয়া ক্রিভেল্লি, লোদোভিকো ইলমরোর একজন রক্ষিতা। কেউ কেউ তাকে বিয়াদ্রিস দেস্তে হিসেবে চিহ্নিত করেছে, কেউ কেউ আরাগোনের, ইসাবেলা, যে ছিলো মিলানের ডিউক গিয়ান গালিয়াঙ্জো ফোর্জার স্ত্রী (ফোর্জা ক্ষমতাচ্যুত হয় তার ভাই লোদোভিকো কর্তৃক)।^{৬৫}

মোনালিসার চারপাশ ঘিরে থাকা রহস্য তৈলচিত্রটির জনপ্রিয়তা ব্যাখ্যা করে না, বরং মোনালিসাকে নিয়ে গল্প তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটা গোপন হাসিতে একটা গোপন গল্প থাকে। কেন সে হাসছিলো, এবং সে কে? এই রহস্য সমাধান করতে পারাটা যেনো কোনো বিশেষ কাজ। সুদীর্ঘকাল থেকেই এই রহস্য সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

একটা শিল্পকর্ম হিসেবে মোনালিসার কি সেই মান আছে, বিশ্বব্যাপী আইকনে রূপান্তরিত হওয়ার প্রয়োজনীয় মান? লিওনার্দোর নিজের জীবনকালে তৈলচিত্রটিতে একটা মাস্টারপিস হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সেটা করা হতো ব্যবহৃত কৌশলের মৌলিকত্বের কারণে, সিটারের উদ্ভাবনামূলক ভঙ্গিমা, এবং তা ‘জীবনঘনিষ্ঠ’ (ভাসারির মতে) বলে। এটি ছিলো একটি বৈপ্রবিক চিত্রকর্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

একটি বৈশ্ববিক তৈলচিত্র

লিওনার্দোর সামান্য যে কয়েকটি কাজ আজ পর্যন্ত টিকে আছে তারই একটি হলো *মোনালিসা*। এই কাজটি সম্পূর্ণ এবং অক্ষত আছে। আয়তনে যদিও ছোটো তা' সত্ত্বেও এটাই লিওনার্দোর আঁকা সবচেয়ে বড় প্রতিকৃতি। এটা তার টিকে যাওয়া শেষ শিল্পকর্মও বটে।

লিওনার্দোর আঁকা নারী প্রতিকৃতিগুলোর মধ্যে টিকে আছে মাত্র চারটি। *মোনালিসা*, *জিনেৰ্ভা দে' বেনচি*, *লেডি উইথ অ্যান আর্মাইন* (সিসিলিয়া গ্যালেরিনা) এবং *লা বেলে ফোরোনিয়ের* (লুক্রেশিয়া ক্রিভেল্লি)। লিওনার্দোর প্রথম দিককার টিকে যাওয়া প্রতিকৃতি *জিনেৰ্ভা দে' বেনচি* (১৪৭৫), এটা আঁকতে দিয়েছিলেন ফ্লোরেন্সে ভেনিসের অ্যাম্বাসেডোর, বের্নার্দো বেমকে—জিনেভেরার প্রতিদানহীন প্রেমের স্মারক হিসেবে। ছবিটার নিচের অনেকখানি অংশ কেটে ফেলা হয়েছিলো, তাতে সেটা কমে যায় এক-তৃতীয়াংশে, এর কারণ লিওনার্দো ছবিটার হাতের কাজ শেষ করেন নি।' ১৯৭৬ সালে ভিয়েনার লিচেনস্টেইনস প্রতিকৃতিটা বিক্রি করে দেয় ওয়াশিংটন ডিসির ন্যাশনাল গ্যালারির কাছে; ইউরোপের বাইরে সেটা লিওনার্দোর একমাত্র শিল্পকর্মে পরিণত হয়।

সিসিলিয়া গ্যালেরানির প্রতিকৃতি *লেডি উইথ অ্যান এমাইন* ১৮৭০-এর দশক থেকে ক্রাকোভের চার্টোরিস্ক গ্যালারিতে সংরক্ষিত আছে, এক সময় এই প্রতিকৃতির মালিক ছিলেন পোল্যান্ডের শিল্পসংগ্রাহক প্রিন্স চার্টোরিস্কি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শুধু লিসা গেরার্দিনি আর লুক্রেশিয়া ক্রিভেল্লির প্রতিকৃতি দুটোই ঊনবিংশ শতাব্দির শুরু থেকে অব্যাহতভাবে সর্ব সাধারণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে লুভর মিউজিয়ামে; যে দুটোর মালিকানা ছিলো ফরাসি রাজার।

লুভরে প্রদর্শিত যে মোনালিসা আমরা দেখি সেটা ঠিক সেই প্রতিকৃতি নয় যেটা লিওনার্দো এঁকেছিলেন। রেনেসাঁ যুগের অন্যান্য তৈলচিত্রের মতোই এর রঙও তেমন উজ্জ্বল নেই যেমনটা আগে ছিলো। বার্নিশের ক্রমাগত হলদেটে হয়ে আসার ফলে প্রতিকৃতিটা দিন দিন কালচে হয়ে পড়ছে।^১ ১৯৫২ সালে প্রথমবার এক্স-রে পরীক্ষা করা হয় তৈলচিত্রটির, সংস্কারের একটা পুরনো উদ্যোগ ছিলো সেটা।^২ ভাসারি বর্ণিত ভুরু দুটো হয় প্রথমবার পরিস্কার করার সময় মুছে যায় অথবা তা আদৌ ছিলো না, লিসা গেরার্দিনি নিজেই প্রাক করেছিলো, ফ্লোরেন্সের ষোড়শ শতাব্দির ফ্যাশন অনুযায়ী। স্তম্ভাল মনে করেন, ‘অমন সুন্দর এক রমনীর ভুরু না থাকাটা ভীষণ বিদঘুটে ব্যাপার।’^৩

প্রায় পাঁচ শতাব্দির পুরনো এক খণ্ড তক্তা নিয়ে আমরা কারবার করছি বিবেচনা করলে জিনিসটা বেশ ভালো অবস্থায় রয়েছে ব’লেই মনে হয়—অন্তত লুভরের মত অনুসারে। ১৯৯৭ সালে মোনালিসার বাৎসরিক পরিদর্শনের পর মিউজিয়ামের কিউরেটর ঘোষণা করেন তৈলচিত্রটির ‘ব্যতিক্রমী অবস্থা’ দেখে তিনি নিজেই ‘বিস্মিত’, যার ‘কখনও অবনতি ঘটবে ব’লে মনে হয় না...কিংবা পুরনো হবে ব’লেও মনে হয় না, কেননা পুরনো কাঠ চমৎকার অবস্থায় রয়েছে, এক প্রাচীন মাস্টারের জন্য যা অত্যন্ত দুর্লভ।’^৪ এমন কি আমাদের ধর্ম-নিরপেক্ষ যুগেও মোনালিসার প্রতি আচরণের প্রলোভন প্রতিরোধ করা কঠিন, যেনো এর আছে অলৌকিক গুণাবলী।

যাহোক, বিখ্যাত ব্যক্তির প্রভাব ব্যতিরেকে মোনালিসা কতোটা ভালো তৈলচিত্র তা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। আগেই যদি একটা প্রধান তৈলচিত্র হিসেবে বিবেচিত না হতো তাহলে সারা বিশ্বের আইকন হিসেবে আজকের অবস্থানে উঠে আসতে পারতো না মোনালিসা। প্রায় সমস্ত বিখ্যাত শিল্পকর্ম যেগুলো অবিশেষজ্ঞরা চেনেন—প্রথমে পেশাদার ও স্বনিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হতে হয়। তারাই হলো নন্দনতত্ত্বের প্রধান দ্বাররক্ষী।

মোনালিসার জনপ্রিয়তা মোটেও শুধু আধুনিক হুজুগ নয়। এটা একটা উদ্ভাবনামূলক ও বৈপ্লবিক তৈলচিত্র। এমন প্রথম দিককার প্রতিকৃতির ক্ষুদ্র মাস্টার পিসগুলো যেমন পিয়েরো দেল্লা ফ্রানোস্কার মন্তুফেলত্রো দিপতিক-এর সঙ্গে তুলনা করলে এর বিস্ময়কর অভিনবত্ব স্পষ্ট হ’য়ে ওঠে,’ লিখেছেন মার্টিন কেম্প।^৫ মোনালিসায় কিছু উদ্ভাবনামূলক ভাবনার প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে যা আসলে লিওনার্দোরই কাজ। যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে (সাহিত্য, দর্শন সিনেমা) দুটো বিষয়ের মধ্যে ফারাক রয়েছে। বিষয় দুটি হচ্ছে, অভিনয়রত সৃষ্টিতে প্রথম হওয়া আর এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রথম পুরোপুরিভাবে বুঝতে

পারা এবং সাড়ম্বরপূর্ণ স্টাইলে সেসব ব্যবহারে সক্ষম হওয়া। মোনালিসার ভঙ্গিমা ঠিক সেই রকমই অনন্য সাধারণ উদ্ভাবনা। সে থ্রি-কোয়ার্টার দৃশ্য তুলে ধরে বসে আছে, অথচ মুখটা ঘোরানো আরেক দিকে—তথাকথিত কন্ড্রাপোস্তা অবস্থান। সে সরাসরি তাকিয়ে আছে দর্শকের দিকে এও আরেকটি উদ্ভাবনা। লিওনার্দো নিজেই নিজের নিয়ম ভেঙেছিলেন, কেননা তিনি লিখে গেছেন যে, নারীদের প্রতিকৃতি আঁকা উচিত একটা গভীর ভঙ্গিমায়, 'তাদের মাথা নত আর এক দিকে ফেরানো থাকবে।' তিতিয়ান এবং অন্য শিল্পীরা প্রায়ই নিচের দিকে তাকানো নারীদের ছবি আঁকতেন, যেনো তারা পুরুষদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু মোনালিসা তাকিয়ে আছে, সরাসরি।

স্বচ্ছ ঘোমটা তৈলচিত্রটিতে গভীরতা সংযোজন করেছে। পোশাকের অসংখ্য লহরী, কাধ থেকে নেমে আসা নদীর মতো ঝালর আর বাম বুকের ওপর আঙুরাখার প্যাঁচানো ভাঁজ সিটার এবং পেছনের ভূ-দৃশ্যের মধ্যে এমন এক বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তুলে ধরছে এমন এক পছন্দ যা অত্যন্ত বিরল। পটভূমিটা অসামঞ্জস্য, ডান দিকটা বাম দিকের চেয়ে সামান্য উঁচু (সাম্প্রতিককালে ড্যান ব্রাউনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী *দ্য দ্য ভিক্সি কোড* বইয়ে বলা হয়েছে এটা ইচ্ছাকৃতভাবেই লিওনার্দো করেছেন যাতে মোনালিসাকে বাম দিক থেকে একটু বড় দেখায়, অনুবাদক)।

রেনেসাঁ যুগের ঐতিহ্যগত ধারায় প্রতিকৃতি আঁকার ক্ষেত্রে দেখা যায়, পটভূমির ভূ-দৃশ্যের প্রধান কাজ হলো সিটারের পরিচিতির অতিরিক্ত উপাদান হিসেবে ভূমিকা পালন করা, যেমন তুস্কানের পল্লী অঞ্চল, কিংবা নাগরিক দৃশ্য। মোনালিসার পটভূমির দৃশ্য সহজেই শনাক্ত করা যায় না। মহিলা যে ব্যালকনির ওপর বসে আছে সেটার পেছনে পাথর, হ্রদ, জলধারা, কিন্তু কোনো বৃক্ষ বা উদ্ভিদ নেই। মানুষের তৈরি একমাত্র বস্তু হলো ডান পাশের একটা সেতু। তুস্কানের কিছু পণ্ডিত, যারা ওই পটভূমিটাকে নিজেদের পল্লী অঞ্চলের বলে দেখাতে ব্যগ্র, মনে করেন যে, ওটা পণ্ডে আ বুরিয়ানো সেতু, যেটা আরেজ্জোর কাছে ভাল দি চিয়ানায় আর্নো নদীর ওপর অবস্থিত।^{১০} ভূ-দৃশ্যটা নির্মাণ করা হয়েছে উল্লম্বভাবে, উপর থেকে নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এর গভীরতা ছড়িয়ে পড়ে, চীনা তৈলচিত্রের মতো যেখানে পুরোভাগটাই ভিত্তি।

মোনালিসার আগে আঁকা কুমারী মেরির কিছু ছবিতে পাহাড় ও আঁকাবাঁকা জলপ্রবাহ আছে পটভূমি হিসেবে। লিওনার্দোর নিজের *St. Anne with*

Virgin and Child শিল্পকর্মটিতেও অচেনা ও খাড়া চূড়াবিশিষ্ট অদ্ভুত পাহাড়ি ভূদৃশ্য রয়েছে। প্রতিকৃতিতে এমন পুরোপুরি কাল্পনিক পটভূমি খুবই দুর্লভ।

অসামঞ্জস্য ব্যবহার করার ফলে তৈরি হয় সচলতার ধারণা, এই চ্যালেঞ্জটা আধিপত্য বিস্তার করে লিওনার্দোর কাজের ওপর। একটা ঘটনার একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তকে স্থির করে ফেলার উদ্যোগ ছিলো *The last Supper* তৈলচিত্রে, আর সেই মুহূর্তটা ছিলো শিষ্যদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতকতা করবে জিহ্বা এই ঘোষণায় তার শিষ্যদের প্রতিক্রিয়ার মুহূর্ত। দুটো স্বতন্ত্র মুহূর্তকে (ঘোষণা এবং প্রতিক্রিয়া) এটা প্রায় একটাতে ফুটিয়ে তোলে। আমরা প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই, কিন্তু এর থেকে আমরা কালানুক্রমিকভাবে পূর্ববর্তী মুহূর্তটাকে শনাক্ত করতে পারি। *মোনালিসার* ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে, তবে আরো অধিক বিস্তৃতভাবে দৃশ্যমান পথে, কেননা এক্ষেত্রে *The Last Supper*-এর মতো পরিচিত কোনো কাহিনীর সহায়তা আমরা পাই না।

আমরা কল্পনা করতে পারি, চিত্রকরের চোখে 'ধরা পড়ার' ঠিক পূর্বমুহূর্তে ঝুলবারান্দায় একটা চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসে ছিলো লিসা আর চিত্রকরের চোখও যেনো ক্যামেরার লেন্স। সেই অনুপস্থাপিত মুহূর্তে দৃশ্যগ্রাহ্য হয়েছিলো লিসার বাম দিকে ফেরানো প্রোফাইল। তারপর—যেনো আমরা তাকে ডাকছি, তার মনোযোগ আকর্ষণ করছি—লিসার মুখটা সম্পূর্ণ ঘুরে যাচ্ছে আমাদের দিকে। এই নড়াচড়ার মধ্যে তার উত্তমাস্র থেকে যাচ্ছে আধাআধি ঘোরানো অবস্থায়। এটাই হচ্ছে *কন্ড্রাপোস্তা* ভঙ্গি। তার দেহের অদেখা নিমাংশ বাম বরাবর আগের ভঙ্গিতেই রয়েছে। মার্টিন কেন্স্পের ভাষায়, 'সে আমাদের প্রতি সাড়া দেয়, আর আমরাও তার প্রতি সাড়া না দিয়ে পারি না।'^{১১}

এই ভঙ্গি কাজে লাগানো হতো ভাব্যে। গ্রিকরাই এটাকে বিখ্যাত করে তুলেছিলো, আর এটার বিশাল প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিলো মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর ডেভিড নামক শিল্পকর্মটির কারণে (*মোনালিসার* যখন শুরু করেন লিওনার্দো, ততোদিনে ডেভিড-এর কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলো)। তৈলচিত্রে *কন্ড্রাপোস্তা* কৌশলের প্রয়োগে *মোনালিসার* ব্যাপক উন্নতির সূচনা ঘটায়। বহুকাল ধরে শিল্পীদের হতবুদ্ধি করে রেখেছিলো যা সেই ধাঁধা মীমাংসার একটা প্রচেষ্টা ছিলো *কন্ড্রাপোস্তা* : কিভাবে সচলতার ত্রিমাত্রিক ধারণাকে দ্বিমাত্রিক সমতলের ওপর উপস্থাপন করা যায়। সংজ্ঞা অনুসারে একটা ভঙ্গিমা স্থৈতিক : চিত্রকর যাতে আঁকতে পারে সে জন্য সিটারকে স্থির থাকতে হয়। সচলতার ধারণা উপস্থাপন করতে হলে সিটারের স্থৈতিক ভঙ্গিমাটিকে অবশ্যই

স্থাপন করতে হবে অনুবর্তিতার একটি মাত্র মুহূর্তের মধ্যে গতিশীল কোনো বস্তুর আলোকচিত্রের মতো। দেহটা বরাবর না হয়ে সিটারের মুখায়বটি অন্য দিকে হওয়ায় মনে হয় সমস্ত দেহটাই গতিশীল। একাধিক ফিগার নিয়ে তৈরি করা জটিল কাজে ব্যবহৃত হতো এই গঠন, কিন্তু একক সিটারের বেলায় এর ব্যবহার খুব একটা দেখা যেতো না, মোনালিসার ক্ষেত্রে যা ছিলো কদাচিৎ ঘটনা। সে এখন গতিময় এক ব্যক্তি। আমাদের যুগে কন্দ্রাপোস্তা ভঙ্গিটা, সাধারণ আলোকচিত্রের নিয়মিত ব্যবহার করে থাকে। তারা ছবি তুলতে আসা মানুষদের কাঠিন্যও আড়ষ্টতা এড়ানোর জন্য তাদের সামান্যসামান্য তাকাতে নিষেধ করে এবং মুখটা প্রতীকভাবে ক্যামেরার দিকে তুলে ধরতে বলে।

লিওনার্দো প্রাথমিকভাবে কন্দ্রাপোস্তা পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন *Lady with an Ermine* (সিসিলিয়া গ্যালেরানি) নামক শিল্পকর্মটিতে। সেখানে শুধু সিটারই নয়, লোমশ প্রাণীটাও রয়েছে 'গতিশীল' অবস্থায়। কিন্তু সিসিলিয়া তাকিয়ে আছে আমাদের থেকে অন্য দিকে, আর পটভূমি অন্ধকার ও নিরপেক্ষ। এমন কি ইসাবেলা দেস্তের প্রোফাইলও কন্দ্রাপোস্তা নিয়ে লিওনার্দোর দীর্ঘ-প্রলম্বিত নিরীক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে : ইসাবেলা প্রোফাইলে দৃশ্যমান, কিন্তু তার উত্তমাস্ত্র আমাদের দিকে ফেরানো। কয়েক দশক ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে একগুচ্ছ কাজ করেছিলেন লিওনার্দো মোনালিসা ছিলো তার সমাধান, দীর্ঘ-প্রলম্বিত শৈল্পিক ভ্রমণশীলতার যা সর্বোচ্চ সীমা। গতিশীলতার ছাপ দিতে ব্যবহৃত কৌশলটা ছিলো প্রভাব বিস্তারী।^{২২}

সম্ভারগণশীল অনুভব সৃষ্টিকারী যে কৌশলটি ব্যবহার করা হয়েছিলো সেটা খুবই চমকপ্রদ ছিলো। তবে অন্যান্য উদ্ভাবনাও প্রয়োগ করতেন লিওনার্দো। টেমপেরার বদলে প্রথম তেল রঙ ব্যবহারকারী হিসেবে তিনি ছিলেন অন্যতম। টেমপেরা হচ্ছে রঙ মেশানোর জন্য ডিমের কুসুম ব্যবহারের পদ্ধতি। এটা বেশ দ্রুত শুকিয়ে যায়। তেল রঙ শুকাতে সময় লাগে, ফলে বিশুদ্ধতাবাদীদের কাছে এর আবেদন সৃষ্টি হয়। এতে চিত্রের উজ্জ্বলতা বাড়ে, তাছাড়া বিস্তারিত ও যথাযথ উপস্থাপনাও সম্ভব হয়। এর প্রথম ব্যবহার হয়েছিলো উত্তর ইউরোপ, ভেনিস এবং তারপর ইতালির অন্যান্য অঞ্চলে পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে।

উত্তর ইউরোপিয় যোগাযোগটা এক-মুখি ছিলো না, যদিও সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। আলব্রেখট দ্যুরার ইতালিয়ানদের কৌশল শেখার জন্য মাঝে মাঝেই সাময়িক আবাস গাঁড়তেন ভেনিসে, কিন্তু নিজের প্রিন্টের উদ্ভাবনায়

নিজেই ধাঁধিয়ে যেতেন তিনি। ভ্যান আইক ভাইদের সঙ্গে আন্তোনেলো দা মেসিনা ক্রুজেসে অধ্যায়ন করতেন এবং ভেনিসে তেল রঙের উদ্ভাবনামূলক প্রয়োগ-পদ্ধতি তিনিই নিয়ে এসেছিলেন ব'লে ধারণা করা হয়।^{১০} ভাসারি অবশ্য তেল রঙ উদ্ভাবনার কৃতিত্বটা দেন 'জিওভান্নি দা ক্রুজিয়া'কে (জন অব ক্রুজেস, I.C. ইয়ান ভ্যান আইক)। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবে এ থেকে পনেরো শতকী ইউরোপের গণ্য-হওয়ার যোগ্য সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ছবিটা আমাদের কাছে ফুটে ওঠে।^{১১} আন্তোনেলো মিলানে লিওনার্দোর চেয়ে প্রায় দশ বছর আগে অবস্থান করেছিলেন এবং কন্ড্রাপোস্তা ও সরাসরি দৃষ্টিপাত দুই-ই প্রয়োগ করেছিলেন।

ফ্রেমিশ প্রতিকৃতিতে প্রায়শই হাত উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু মোনালিসার মতো অমন সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কদাচিৎ, ফলে ছবির নিম্ন প্রান্তের ফ্রেমিংয়ের জন্যে তা ঝামেলার কারণ হয়ে ওঠে। লিওনার্দোর পূর্ববর্তী সময়ে প্রচলিত প্রতিকৃতিতে ব্যক্তিকে উপস্থাপন করা হতো কোমরের অনেক ওপর থেকে, কাঁধ কিংবা ঘাড়ের ওপরের অংশ সহকারে। বলা সম্ভব হতো না মডেল ব'সে আছে না দাঁড়িয়ে আছে। মোনালিসার উপস্থাপিত হয়েছে নিতম্বের ওপর থেকে, বসা অবস্থায় এখানেও উত্তর ইউরোপের নজির দেখা যায়। ইয়ান ভ্যান আইক দেহের অর্ধেক অথবা কাঁধ পর্যন্ত উপস্থাপিত প্রতিকৃতি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। ফ্রেমিশ প্রতিকৃতি আঁকিয়েরা—ভ্যান আইক ছাড়াও হ্যান্স মেমলিং ও রজার ভ্যান ডেং ওয়েইডেন—সিটারদের থু-কোয়ার্টার অবস্থানে উপস্থাপন করা শুরু করেছিলেন, তাদের হাত থাকতো দর্শকের বরাবর। মোনালিসার দু'পাশে প্রায় অদৃশ্যমান কলাম আসলে ভ্যান আইনের *The Virgin of the Chancellor Rolin*-এর অনুস্মরণ (এটিও লুভরে সংরক্ষিত আছে, ৩৪ নম্বর ছবিটি দেখুন)। মেমলিং-এর ১৪৮৭ সালের *Benedetto di Tommasi Portinari* এবং তাঁর ১৪৭০-৭৫ সালের *Portrait of an old Woman* (লুভরে সংরক্ষিত) আঁকা হয়েছে পেছনে ভূ-দৃশ্য রেখে ব্যালকনির ওপর মোনালিসার মতো। ওই সময় ফ্রেমের ডিভাইস হিসেবে কলামের ব্যবহার ইতালিতে দুর্লভ ছিলো। ফ্রেমিশ চিত্রকররা, বিশেষ করে ভ্যান আইক, প্রথম এর প্রয়োগ ঘটান, তবে সাধারণত চারপাশ থেকে আবদ্ধ স্পেসের মধ্যে।^{১২} মোনালিসাতে যেমনটি দেখানো হয়েছে একটা দূরবর্তী ভূ-দৃশ্যের বিপরীতে একটা ফিগারের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত অবস্থান, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে, ইতালিতে সেরকমটি প্রায়ই প্রয়োগ করা হতো পূর্ববর্তী শতাব্দীতে।^{১৩}

ইতালিয় রেনেসাঁর শিল্পীরা যখন একটা প্রতিকৃতিতে সিটারের হাত যোগ করতেন তখন তার সাধারণত একটা উদ্দেশ্য থাকতো : তাতে একটা প্রতীকি বস্তু ধরা থাকতো যা থেকে সিটারের পরিচয় শনাক্ত করার সূত্র পাওয়া যেতো। এর একটা নমুনা বস্তুচেল্লির *Young Man Holding a Medal of Cosimo il Vecchio* (এতেও কন্ট্রাপোস্তা প্রকরণ প্রয়োগ করা হয়েছে), কিংবা পেরুগিনের *Framcesco delle opere* ধরে রেখেছে একটা গোটানো কাগজ (দুটো ছবিই সংরক্ষিত আছে উফিজিতে)। লিওনার্দো নিজে শনাক্তকরণের সূত্র রেখে গেছেন তার *Lady with an Ermine*, *Ginerva de' Benci* এবং *Portrait of a Musician* (১৪৯৫ সালে শেষোক্ত এই শিল্পকর্মটি আঁকা হয় মিলানের পিনাকোতেকা আমব্রোসিয়ানায়) ইত্যাদি প্রতিকৃতিতে। এরমিন ছিলো লোদোভিকো ইল মরোর প্রতীক (তিনি ছিলেন অর্ডার অব দ্য এরমিনের একজন সদস্য), আর এর গৃক নাম ছিলো 'gaile'-এ দুটো সূত্র থেকে বোঝা যায় অংকিত ভদ্রমহিলা হচ্ছে সিসিলিয়া গ্যালেরানি, লোদোভিকোর তরুণী রক্ষিতা। জিনেভা দে' বেনচিকে আঁকা হয়েছে একটা জুনিপার গাছের বিপরীতে (জুনিপারের ইতালিয় নাম 'জিনেপ্রো'), সঙ্গীতকারকে চেনা যায় তার হাতে ধরা ডকুমেন্ট থেকে।

মোনালিসার হাতে কিছুই ধরা নেই। স্পষ্ট কোনো ক্রিয়াও নেই হাত দুটোর। ওগুলো ভয়, প্রার্থনা কিংবা যন্ত্রণা কিছুই প্রকাশ করে না।^{১৭}

রেনেসাঁ যুগে অসংখ্য শিল্পকর্ম নানারকম বস্তু আর ব্যবহারিক সামগ্রীতে ভর্তি : ন্যাকড়া, কুশন, সিন্দুক, রত্ন।^{১৮} মোনালিসার কিছুই নেই।

মোনালিসার আঁকা হয়েছে একখণ্ড পপুলার কাঠের ওপর, সেকালে এ রকম চর্চা তখনও চালু ছিলো। লিওনার্দো যে শিল্পকৌশল প্রয়োগ করেন তাতে অনেকগুলো স্তর প্রয়োজন হয়, এজন্য প্রতিকৃতিটা শেষ করতে করতে সময় প্রলম্বিত হয়ে যায়, কারণ প্রতিবার রঙ শুকানোর জন্য অপেক্ষা করতে হতো। লিওনার্দো এই ছবিটা শেষ করতে খুব বেশি সময় নিয়েছিলেন শুধু তাঁর বিতর্কবাদিতার জন্য নয় বা তাঁর অন্যান্য কাজের পেছনে সময় দেয়ার জন্যেই নয়, বরং তিনি ছবিটা আঁকার সময় সতর্কতার সঙ্গে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তুলি ব্যবহার করতেন বলেই—সেটা এতোই সূক্ষ্ম ছিলো যে এক্স-রে করেও তুলির দাগ শনাক্ত করা সম্ভব হয় নি।^{১৯} লিওনার্দো যে শৈল্পিক উত্তেজনায় পরিচালিত হতেন তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, কতিপয় আধুনিক শিল্পের কম্পোজিশনেও তেমনটা ঘটতে পারে।

লিওনার্দো যে সব শিল্প প্রকরণের সূচনা ঘটান সেসবের একটা ছিলো কয়েক স্তর রঙ লেপন করা এবং এভাবে রঙ গাঢ় থেকে হালকা ক'রে তোলা। এর ফলে আলোছায়ার একটা চমৎকার খেলার ভেতর দিয়ে রিলিফের অলীক দৃশ্য সৃষ্টি হতো।^{২০} তিনি যেমন লিখে গেছেন, 'ছায়া ও আলো সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট উপায় যার অবলম্বন ক'রে কোনো বস্তুর আকার এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব যাকে চেনা যায়, কেননা কেবল আলোয় বা কেবল অন্ধকারে কোনো বস্তুর রিলিফ ফুটে উঠবে না, তাতে শুধু সমতলের প্রতিফলন দেখা যাবে।'^{২১} হেগেল—১৯৬৫ সালে কার্ল জেসপার্স যেমনটা উল্লেখ করেছেন—এই বিষয়টাকে রঙিন অলীকতার জাদু হিসেবে অভিহিত করেছেন, যেখানে বস্তু অদৃশ্য হয়ে যায়।^{২২}

লিওনার্দোর সমকালীনরা এটা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন যে, কিভাবে তিনি এক আলোর মাত্রা থেকে বা এক রঙ থেকে আরেকটিতে সরে আসার সমস্যার সমাধান করেছেন। দূরবর্তী বস্তু উপস্থাপনের জন্যে এ প্রক্রিয়া ছিলো দরকারি, লিওনার্দো যেমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

যদিও দূরবর্তিতায় সীমানার সংজ্ঞা হারিয়ে যায়,
তবু (চিত্রকরের) এই পর্যবেক্ষণ অবহেলা করা
উচিত নয় যে, সীমানা আর অবয়ব নয়, ধোঁয়াটে
সমাণ্ডি দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে, যা তীক্ষ্ণ আর রুঢ়।^{২৩}

এটাই তাকে সেই ফলাফল অর্জনে সক্ষম ক'রে তোলে সেকালে যা ছিলো ভীষণভাবে কাল্পনিক : এমন এক গভীরতা সৃষ্টি করা যা রঙের বিভিন্ন এলাকার মধ্যবর্তী পরিষ্কার ও নিখুঁত বিরতির মাধ্যমেও অর্জন করা সম্ভব ছিলো না। লিওনার্দোর বেলায় ড্রয়িং হিসেবে কোনো তৈলচিত্রের যে কোনো প্রভাব আমরা হারিয়ে ফেলি যা রঙিন করা হয়েছে, আদি ইতালিয় শিল্পকলায় অবশ্য এর চল ছিলো।

যেমন গমব্রিচ উল্লেখ করেছেন, দারুণ সাফল্যের সঙ্গে ফুমাতো (আক্ষরিক অর্থে 'ধোঁয়াটে') কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে মোনালিসায়। চোখ ও মুখের কোণ (অভিব্যক্তি চেনার প্রধান বিন্দু) ঝাপসা, এতে চেহারার অভিব্যক্তি ঘিরে অনিশ্চয়তা যোগ হচ্ছে। সে বিষম্ব না আনন্দিত, মৃদু হাসছে নাকি হাসছে না, কিংবা হাসলেও কোন ধরনের হাসি ইত্যাদি মোটেও স্পষ্ট নয়।^{২৪} রহস্যের এই সুর উনিশ শতকেও ছবিটার জাদুময়তায় লক্ষ্যণীয় মাত্রায় যোগ হয়েছে, যখন শিল্পকর্মকে বিবেচনা করা হচ্ছিলো এমন বস্তু হিসেবে যার পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা রয়েছে।

অবশেষে লিওনার্দো 'পিরামিডাল' কম্পোজিশনের ব্যবহারেও তাঁর বিস্তৃক্ততার ছাপ রাখেন, যেখানে সিটারের হাত দুটো পিরামিডের ভিত্তি রচনা করে, মাথাটা হয়ে ওঠে শীর্ষ চূড়া। এই গঠন শিল্পকর্মটিকে মনুমেন্টাল অবয়ব দেয়। মোনালিসাকে তার পেছনের পর্বতশৃঙ্গ ছাড়ানো মিনারের মতো প্রতিভাত হয়।^{২৫} এ রকম জটিল গঠন এক সঙ্গে বেশ কিছু ফিগারের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিলো। কিন্তু একক সিটারের ক্ষেত্রে আগে কখনও ব্যবহৃত হয় নি।^{২৬} কম্পোজিশনেও অদ্ভুত একটা উপদান আছে। মহিলাটি যদি একটা ব্যালকনির ওপর উপবিষ্ট থাকে, তাহলে পেছনের যে ভূদৃশ্য আমরা দেখতে পাই তার ব্যাখ্যায় বলতে হবে ব্যালকনিটা অত্যন্ত উঁচুতে অবস্থিত।^{২৭}

লিওনার্দোর সমকালীনরা, সার্বোপরি রাফায়েল, মোনালিসার এসব নবপ্রবর্তনের মর্ম উপলব্ধি করে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। যদিও তিনি হয়তো মোনালিসার প্রাথমিক ড্রয়িংটা দেখেছিলেন, তবু সেটা দেখেই অভিভূত হয়েছিলেন রাফায়েল।^{২৮} লিওনার্দোর প্রতি তার ঋণ প্রকাশিত হয়েছে তার *Young Woman in a Loggia* শীর্ষক ড্রয়িংয়ে (১০ নম্বর ছবিটি দেখুন) ওই ছবিটিতে হুবহু মোনালিসার ভঙ্গিটাই ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবত এটা ছিলো মাদ্রালেনা দোনির প্রতিকৃতির একটা অনুশীলন, কিন্তু যে সিটারকে এখানে আঁকা হয়েছে সে মাদ্রালেনা দোনি নয়। তাহলে কি সে আসল লিসা গেরার্দিনি? মূল মাদ্রালেনা দোনি শীর্ষক প্রতিকৃতিতে মোনালিসার অনুরূপ ভঙ্গিই ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও রাফায়েল সেটাকে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান কলামের মধ্যে ফ্রেম-বন্দি করেছেন, আর উপেক্ষা করেছেন ভূ-দৃশ্য, সিটারকে স্থাপন করেছেন প্রথাবদ্ধ ও চেনার যোগ্য ফ্লোরেন্সীয় শহরে পটভূমিতে (১১ নম্বর ছবিটি দেখুন)।

অনুপ্রেরণার জন্য রাফায়েল বারবার ফিরে যেতেন লিওনার্দোর শিল্পকর্মের কাছে, এর দৃষ্টান্ত মেলে তার *Lady with a Unicorn* (১৫০৬, গালেরিয়া বোর্গিস, রোম)। *La Muta* (১৫০৭, গালেরিয়া লাজিওনাল ছেল্লো মার্চে, উর্বিনো), *Donna Velata* (১৫১৬, পালেজ্জো পিস্তি, ফ্লোরেন্স), এছাড়া জিউলিয়ানো দে মেদিচির প্রতিকৃতি এবং বাল্দিসারে কাস্তিগলিওনের বিখ্যাত প্রতিকৃতিতে (১২ নম্বর ছবিটি দেখুন)। শেষোক্ত কাজটিতে সিটারের হাতও রাখা হয়েছিলো, পরে বাদ দেয়া হয় সেটা।^{২৯}

লিওনার্দোর পিরামিডসদৃশ কম্পোজিশনের কৌশল রাফায়েল ব্যবহার করেছিলেন ব্যক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলে ধরার জন্য। সেটা করতে গিয়ে, যেমনটি উল্লেখ করেছেন শিল্পের ইতিহাসবিদ লুবা ফ্রিডম্যান, 'ব্যক্তিকে উপস্থাপন করা হতো জাঁকালো আর সমুন্নত অবয়বে। সাধারণভাবে যা

সংরক্ষিত ছিলো ধর্মীয় চিত্রকলার জন্য।^{১০০} বৈশিষ্ট্যসূচক সূত্রের অভাবে মোনালিসার একটা সর্বজনীন প্রতিকৃতিতে পরিণত হয়েছে—সেটা মোটেও কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি চিত্রাচারিত প্রতিকৃতি হয়ে থাকে নি (সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিকৃতি হলো নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির দৃশ্যমান উপস্থাপন)। অতীতকালে রাফায়েলের মান্দালেনা দোনি নিশ্চিতভাবেই ঐতিহাসিক মান্দালেনার প্রতিকৃতি, যে ছিলো আগনোলো দোনির স্ত্রী : ফ্লোরেন্সিয় পটভূমি, তার গহনা, তার মুখের দাগ ইত্যাদি থেকে তাকে শনাক্ত করা যায়। দোনি পরিবারের কথা মতো নিজের দায়িত্ব পালন করেছিলেন রাফায়েল। তাকে বলা হয়েছিলো বাস্তবের একটা মানুষের প্রতিকৃতি আঁকার জন্য, আর তিনিও লিওনার্দোর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে তা প্রয়োগ করে একটা নির্দিষ্ট প্রতিকৃতি তৈরি করেন, যে লিওনার্দো ছিলেন সর্বজনীন এক শিল্পী।

আমরা জানি লিওনার্দো তার জীবনকালেই ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ছিলেন তার শিল্পকর্ম থেকে তৈরি করা কপির সংখ্যার কারণে। এমন এক যুগে যখন একটা তৈলচিত্র সম্পর্কিত তথ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়াতে পারতো কেবল লিখিত মন্তব্য আর কপির মাধ্যমে, তখন লিওনার্দোর অনুসারীদের তৎপরতা, প্রধানত উত্তর ইতালিতে, তথ্য পদ্ধতি হিসেবে কাজ করতো যা তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছিলো। যখন চতুর্থ অঁরি ফট্টেইনব্রিউ-এর অ্যাপটিমেন্ট দেস বেইনস সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেন (১৫৯৪-১৬০০), তখন ছবিগুলো সেখান থেকে সরিয়ে নেয়া হয় আর ক্যানভাসের ওপর কপি করা হয়। এ সময়ে মোনালিসার কপি করেন ডুবোয়ে (১৫৪৩-১৬১৪) নামে পরিচিত অ্যামব্রোয়ে বোশার্ত। ১৬২৪ সালে ছবিটা আবারো কপি করেন চার্লস সাইমন।^{১০১}

‘গিওকোন্দা’ ভগ্নি হিসেবে যা পরিচিত হয়ে উঠেছিলো সেই ভগ্নিতে প্রচুর সংখ্যক নারীর প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছিলো ষোলো শতকে। কপি, অনুকরণ আর আহরণ মিলিয়ে ষাটটির মতো প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছিলো আঠারো শতক শেষ হওয়ার আগেই। বিশ শতকে, যখন ছবিটা ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে, প্রতিটি কপির মালিক দাবি করে যে, তারটাই ‘আসল’ মোনালিসা। দ্রুপদী কন্দ্রাপোস্তা ভগ্নিমায় হাত ভাঁজ করা অবস্থায় গিওকোন্দাকে কখনও কখনও নগ্ন করেও আঁকা হয়েছে। গিওকোন্দার এমন একটি নগ্ন প্রতিকৃতি আছে চান্তিলির মুজি কন্ডে সংগ্রহশালায় (মোনালিসার, ১৫১৩, ১৩ নম্বর ছবিটি দেখুন), কালো চক্রে আঁকা; এবং আরেকটি আছে নুরেমবার্গে, জার্মানির ন্যাশনাল মিউজিয়াম-এ, ষোলো শতকে সেটা আঁকেন বার্থেল ক্রাইন, নাম নগ্ন গিওকোন্দা।

কারারা'র বার্গামোর আকাদেমিয়া'তে সতেরো শতকের একটি তৈলচিত্র আছে, চান্তিলির চকে আঁকা প্রতিকৃতির ভিত্তিতে অংকিত, এক সময় মনে করা হতো সেটার উৎস ফ্রেমিশ, পরে জানা গেছে তৈলচিত্রটি আসলে এঁকেছেন কার্লো আন্তোনিও ও জিউলিয়ানো সেজার প্রকাচিনি ভ্রাতৃদ্বয়। ১৫৩৫ সালে ইয়োস ভ্যান ক্লিভ একটা *গিওকোন্দা* আঁকেন, সেটা এখন সংরক্ষিত আছে *মুজি দে ভারেগিনেসে*। তুরসের *মুজিদেস বিউ-আর্টস-এ* সতের শতকে জাঁ দুকাভারের আঁকা *Gioconda with Bodice* নামের কাজটা সংগৃহীত আছে। লন্ডনের নিকটবর্তী হ্যাম্পটন কোর্টে ষোলো শতকের একটা *গিওকোন্দা* সদৃশ তৈলচিত্র আছে, বের্নাদিনো লুইনি অংকিত ওই তৈলচিত্রটি ফ্লোরা নামে পরিচিত, এই লুইনি ছিলেন লিওনার্দোর অন্যতম বিশিষ্ট অনুসারী। মিউনিখের অ্যান্টে পিনাকোটেকেও রয়েছে 'তাদের' *গিওকোন্দা*, সতেরো শতকে সেটা আঁকা হয় তেল রঙে। সতেরো শতকে তৈরি করা অন্যান্য কপি পাওয়া যেতে পারে জাপান, এপিনাল ও অসলোয়। মাদ্রিদের প্রাদোয় রয়েছে অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা *মোনালিসার* ষোলো শতকের একটা কপি। সেন্ট পিটার্সবুর্গের হার্মিটেজে আছে বাম-বক্ষ-উন্মোচিত এক *গিওকোন্দা*, দেহ ও মুখ বাম দিকে ফেরানো, হাতে আছে একটা বস্তু, 'কলোমিনা' নামে সেটা পরিচিত এবং ফ্রান্সেস্কো মেলজি অংকিত (১৪ নম্বর ছবিটি দেখুন)। বিভিন্ন ইউরোপিয় ও আমেরিকান জাদুঘরে ষোলো বা সতেরো শতকে আঁকা *মোনালিসার* কপি আছে, এর কয়েকটি সম্ভবত সেইসব অভিজাত মহিলাদের আকাজ্জা পূরণে আঁকা হয়েছে যারা চেয়েছিলো *মোনালিসার* ভঙ্গিতে তাদের প্রতিকৃতি তৈরি করা হোক।

এসব থেকে যা বোঝা যায় তাহলে 'জোকোন্দে' বা 'গিওকোন্দা' আখ্যাটি আসলে লিওনার্দোর বিখ্যাত শিল্পকর্মটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যা কোনো নারীর প্রতিকৃতি সম্পর্কে ব্যবহৃত হতো। উদাহরণ স্বরূপ, ১৬২৯ সালের একটি ফরাসি তালিকার^{১২} বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে '*une Joconde*' জাঁ—ব্যাণ্ডিস্ত দে শ্যামপেইন (১৬৮১)-এর বর্ণনামূলক তালিকার একটা হাতে-লেখা নোট আছে যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে '*une Joconde d'apres Leonard Davency*' (হুবহু উদ্ধৃতি)।^{১৩} ১৭০১ সালে কোর দে মোনাইয়ে-এর পরামর্শদাতা ডাক বেনোয়ার স্ত্রী মারি বঙ্কোতের জমিদারির তালিকা তৈরি করা হয়। সেখানে একটা প্রতিকৃতির বিবরণে স্রেফ লেখা হয়েছে *une Joconde*। লুই-জাঁ গাইগনাতের জমিদারি নিলামে উঠেছিলো এক সময়। তিনি মারা যান ১৭৬৮ সালে। ওই নিলামের ক্যাটালগে একটি তৈলচিত্রের বিবরণী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে সেটাকে বলা হয়েছে *Une*

Joconde।^{১৪} তাতে আরো যোগ করা হয়েছে ‘এটা লিওনার্দো দা ভিন্সির সেই বিখ্যাত শিল্পকর্ম যার মালিক রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া।’ কেউই বোকা ছিলো না, ছবিটার মূল্য ছিলো ৯৫০ লিভরে, অন্যদিকে রেমব্রান্টের একটা ছবি বিক্রি হয়েছিলো ৫,৪২০’তে।^{১৫}

বিভিন্ন রঙের মিশেলে নতুন রঙ উৎপাদন এবং সর্বোপরি আলোকচিত্র উদ্ভাবনের বিষয়টি মাথায় রেখেও বলতে হয় তৈলচিত্রের খ্যাতি সেকালে নির্ভর করতো অনুকরণের বিস্তার আর রেপ্লিকার ওপর। এসব কিছু থেকে তরুণ শিল্পীরা প্রতিষ্ঠিত ধ্রুপদী কৌশল শেখার প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতো। প্রতিটি অনুকরণ বা কপি আসলটির প্রতি সরাসরি নিবেদিত হতো।^{১৬}

শিল্পকর্মের এসব কপির উচ্চ মূল্য দেয়া হতো। এগুলোর অসম্মান করা আধুনিক যুগের প্রবণতা যা আসলে বিপ্লবের সন্ধানের সঙ্গে যুক্ত, আবার তা এমন এক সমাজে যেখানে শিল্পকর্ম সহজেই নকল করা যায়। লম্বার্ডিতে যেখানে লিওনার্দোর অনেক শিষ্য ছিলো পনেরো ও ষোলো শতকে অনুকরণকারীদের ভিড় একেবারে উপচে পড়েছিলো। অবিরাম কপি করা এবং অনুকরণ, বিভিন্নতা ও স্বাভাবিক ছাড়া শৈল্পিক উন্নতি আদৌ সম্ভব ছিলো না। উদাহরণ স্বরূপ, করেজ্জিও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উদ্দীপনা আহরণ করেছিলেন লিওনার্দোর শিল্পকর্ম থেকে।^{১৭}

এভাবে ১৮২১ সালে রয়্যাল অ্যাকাডেমি *The Last Supper*-এর একটি কপি কিনে অ্যাকাডেমির নিজস্ব সম্পদের মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখে। এটা এমন এক ঘটনা যা এখনকার দিনে খুব কম প্রতিষ্ঠানই করবে।^{১৮} অসংখ্য কপি তৈরি হচ্ছিলো বটে। যার কতোগুলোর অর্ডার দিয়েছিলেন ফরাসি রাজা কিন্তু মোনালিসা রাজকীয় সংগ্রহশালাতেই থেকে যায়। এর উল্লেখ পাওয়া যায় রাসকাস দে বাগারিন-এর (১৫৬৭-১৬২০) *les plus rares peintures de Fontainebleau* (১৬০৮-১০)-এর তালিকায়, ক্যাসিয়ানো দেল পোজ্জোর ডায়রিতে (১৬২৫) এবং ১৬৪২ সালে পিয়ের দানের *Le resor des merveilles de la maison royale de Fontainebleau* তালিকায়।^{১৯}

১৬১০ সালে ফ্রান্সের রাজা হন ত্রয়োদশ লুই। তিনি শিল্পপ্রেমী ছিলেন না। ক্যাসিয়ানের ডায়রি আমাদের বলছে যে, ১৬২৫ সালে ডিউক অব বাকিংহাম ফরাসি রাজাকে একটা লেনদেনের প্রস্তাব দেন। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস (ছিলেন শিল্পের পৃষ্ঠপোষক) লুই-এর বোন অঁরিয়েস্তা-মারিয়াকে বিয়ের কথা ফিরিয়ে নেয়ার জন্য ডিউক অব বাকিংহামকে ফ্রান্সে পাঠিয়েছিলেন। তার দেয়া

লেনদেনের প্রস্তাবটি ছিলো এই রকম : ফরাসি রাজা তাকে মোনালিসা শিল্পকর্মটি দেবেন এবং এর বিনিময়ে ফরাসি রাজাকে দেয়া হবে হলবেইন-এর *Erasmus* ও তিভিয়ানের পবিত্র পরিবার বিষয়ক একটি শিল্পকর্ম। লুই এ প্রস্তাবে রাজি হয়েই যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাধ সাধেন তার রাজদরবারের সদস্যরা। তারা প্রতিবাদ ক'রে বলেন, মোনালিসা তাঁর সংগ্রহের অন্যতম সেরা ছবি। এ জিনিস ফ্রান্সের হাতছাড়া করা যায় না কিছুতেই। লুই তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং এর পরিবর্তে গভীর হতাশাচ্ছন্ন ডিউকের হাতে তুলে দেন লিওনার্দোর আরেকটি শিল্পকর্ম *St. john*, পরবর্তীকালে প্রথম চার্লসের মৃত্যুদণ্ডের পর তার সংগ্রহ বিক্রির সময় ব্যাংকার এভারহার্ড জ্যাবাখ *St. john* ছবিটা কিনে নেন এবং চতুর্দশ লুইয়ের কাছে সেটা বিক্রি ক'রে দেন তার কেনা দামেই, ১৪০ পাউন্ডে।^{৪১}

মোনালিসা ফ্রান্সেই থেকে যায়, কিছুটা অবহেলিত অবস্থায়। রজার দে পিলেন, ১৬৬১ সালে যিনি তৈলচিত্রের শ্রেণীকরণ করেন, লিওনার্দোকে স্থান দেন এগারো নম্বরে, শার্ল লেক্রনের মতো ফরাসি চিত্রকরদেরও অনেক নিচে।^{৪২} ১৬৯৫ সাল নাগাদ মোনালিসা জায়গা পায় ভার্সাই'র পেতিত গালেরি দু রুই-তে, তখনও কিন্তু এর অনুরাগীর অভাব ঘটে নি। উদাহরণ স্বরূপ স্মরণ করা যেতে পারে লপিসির কথা। ১৭৫২ সালে *Catalogue des tableaux du Roy*-তে লপিসি মোনালিসাকে লিওনার্দোর অন্যতম শুদ্ধ শিল্পকর্ম হিসেবে বর্ণনা করেন।^{৪৩} যাহোক, ১৭৬০ সালে ছবিটা পাঠিয়ে দেয়া হয় *Directeur des Batiments* (রাজকীয় ভবনের রক্ষক)-এর কার্যালয়ে। ১৭৫০ সালের ১৪ অক্টোবর প্যারিসের লুক্সেমবার্গ প্রাসাদে রাজকীয় সংগ্রহের ১১০টি সেরা আইটেম প্রদর্শন সংগ্রহের সাধারণ নাগরিকদের সামনে (নির্বাচিত সাধারণ নাগরিকদের সামনে) প্রদর্শিত আইটেমগুলোর মধ্যে মোনালিসা ছিলো না।

এরপর শুরু হয় ফরাসি বিপ্লব। রাজকীয় সংগ্রহ ব'লে আর কিছু থাকে না। সবকিছুর মালিক হয়ে যায় ফ্রান্সের জনগণ। তৈলচিত্রগুলোর তালিকা প্রস্তুতের জন্য একটা কমিশন নিযুক্ত করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, লুভরের প্রাসাদের ভেতরে একটা নতুন জাদুঘর তৈরি ক'রে সেখানে ছবিগুলো নিয়ে আসা হবে ভার্সাই থেকে। ১৭৯৭ সালের ১৩ জুলাই কমিশনের ১৮তম বৈঠকে একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। রাজকীয় সংগ্রহের এই তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করা হয় মোনালিসাকেও। 'নাগরিক ফ্রাগোঁনর্দ' পরিবহনের দায়িত্বে ছিলেন এবং নিয়মমতো রশিদে তিনি এই স্বাক্ষর করেন।^{৪৪} এতে কিছুটা খোঁচা লাগার

ব্যাপার আছে, যেহেতু 'নাগরিক ফ্রাগোর্নর্দ' ছিলেন জ্যঁ অন্তরে ফ্রাগোর্নর্দ (১৭৩২-১৮০৬), ষোড়শ লুইয়ের রাজদরবারের অত্যন্ত খ্যাতিমান শিল্পী, প্রথমে আঁকতেন ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর ছবি এবং পরে মৃদু যৌনকর্মী হয়ে উঠছিলো তার ছবির থিম, এছাড়া ভার্সাই'র রাজ দরবার যাতে খুশি হতো সে ধরনের ছবি। বিপ্লবে নিহত হন ফ্রাগোর্নর্দের পৃষ্ঠপোষকরা। নতুন শাসকরা বেশি পছন্দ করেছিলো জ্যাক লুই দাভিদের সুনীতিসম্পন্ন ও উচ্চমনা নিও ক্লাসিক্যাল শিল্পধারাটি। এই ধারাটি ষোড়শ লুইয়ের শেষ বছরগুলোতেই প্রশংসা অর্জন শুরু করেছিলো। বিপ্লবকে সোৎসাহে আলিঙ্গন করেছিলেন দাভিদ এবং রাষ্ট্রের শিল্প বিষয়ক নীতির ওপর প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিলেন। তিনি রাজার মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে ভোট দিলেও দুর্দশাগ্রস্ত সহগামী শিল্পীদের হয়রানি করার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখান নি, বরং সর্বস্বান্ত ফ্রাগোর্নর্দকে একটা কাজ জুটিয়ে দেন মিউজিতে। এই কাজ করতে গিয়েই ভার্সাই থেকে রাজকীয় সংগ্রহ মোনালিসাসহ প্যারিসের নতুন জাদুঘরে পাঠানোর তদারকির দায়িত্ব পান ফ্রাগোর্নর্দ। তার নিজেরই বেশ কিছু শিল্পকর্ম এখন শোভা পাচ্ছে লুভরের দেয়ালে—এ কথা জানতে পারলে তিনি হয়তো কিছুটা শাস্ত্রনা পেতেন।

এই সময় থেকেই মোনালিসার ইতিহাসের সঙ্গে অপরিহার্যভাবে জড়িয়ে যায় লুভরের নাম।

তৃতীয় অধ্যায়

লিসার লুভরে প্রবেশ

ফ্রান্সের শৈল্পিক জীবনের উন্নতি প্রবলতর হয়ে ওঠে বিপ্লবের কারণে। ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয় লুভর, বিবিলিওথেক ন্যাশনেল, মুজি দে আর্ট এত্ মেতিয়েরস, একোল দে ব্যু-আর্ট এবং বার্ষিক সালোয়াঁ যেখানে শিল্পীরা তাদের কাজের প্রদর্শনী ও পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারতো।

এসব উন্নতির মধ্যে কয়েকটি অর্জন করা যেতে পারতো বিপ্লব ছাড়াই। *ancien regime* আলোকপ্রাপ্ত দার্শনিকদের অনুপ্রেরণায়, বিশেষ করে দিদেরোর অনুপ্রেরণায় লুভরে একটা জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছিলো।^১ গ্র্যান্ড গ্যালারি সর্বসাধারণের জন্য ১৭৮৭ সালে খুলে দেয়া হয় আর্থিক সংকটের কারণে, ফলে প্রকল্পটিতে বিলম্ব করতে বাধ্য হয়ে ছিলো সরকার।

বেশ কিছু দেশে জনসাধারণের জন্য শৈল্পিক সম্পদ প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো আরো আগেই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৬৮৩ সালে প্রতিষ্ঠা করে অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম। ১৭৩৪ সালে কাপিতোলিন মিউজিয়াম উদ্বোধন করেন পোপ ক্রিমেন্ট আর ১৭৪৩ সালে ফ্লোরেন্স উদ্বোধন করা হয় উফিজি জাদুঘর, এর এক বছর পর ডেসডেনে স্থাপন করা হয় সর্বসাধারণের জন্য গ্যালারি। বৃটিশ মিউজিয়াম উন্মুক্ত হয় ১৭৫৩ সালে। জাতির শৈল্পিক উত্তরাধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই ধারণা ছড়িয়ে পড়ে ছিলো সমগ্র ইউরোপে।

যাহোক, ফ্রান্স বিপ্লবী ও নেপোলিওনিয় যুদ্ধের সময় দখল করা দেশগুলোয় শিল্পের নতুন আয়োজন সহায়ক হয়ে উঠেছিলো। ১৮০৩ থেকে ১৮০৭ সালের মধ্যে ইতালির উত্তরাঞ্চলে ফরাসি আগ্রাসনকারীরা স্থানীয়

সমর্থকদের সাহায্য নিয়ে ছবির গ্যালারি তৈরি করেছিলো মিলান, বোলোগনা, জেনোয়া, ভেনিস ও মানতুয়া'য়। ১৮০৮ সালে ফরাসি সম্রাটের এক ভাই লুই নেপোলিওন হল্যান্ডের আমস্টারডামে প্রতিষ্ঠা করেন কনিনক্রিক মিউজিয়াম, পরে যেটার নাম হয় রিক্স মিউজিয়াম। আরেক ভাই জোসেফ ১৮০৯ সালে মাদ্রিদের প্রাদো জাদুঘরের পরিকল্পনা করেছিলেন (সেটা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৯ সালে)।

উনিশ শতকের সময় প্রবাহে এই প্রবণতা আরো গতিশীল হয়। ১৮২৪ সালে ন্যাশনাল গ্যালারি উদ্বোধন করা হয় লন্ডনে, অন্যদিকে পুরো এক সেট জাদুঘর তৈরি করা হয় বার্লিনে। ১৮৪০ এর দশকে সেন্ট পিটার্সবার্গে খোলা হয় হার্মিটেজ। সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়াম (পরে নামকরণ করা হয় ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম) চালু করা হয় ১৮৫২ সালে, মিউনিখের নিউ পিনাকোটেক ১৮৫৩ সালে, নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম এবং বোস্টনের মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টস ১৮৭০ সালে, শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউট ১৮৭৯ সালে এবং লন্ডনের টেট গ্যালারি ১৮৯৭ সালে। এভাবে মোনালিসা পরিণত হয়েছিলো হাজার হাজার ছবির মধ্যে একটি যা সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছানোর যোগ্য হয়ে উঠেছিলো।

বিশাল এবং অর্ধেক খালি লুভর স্পষ্টতই প্যারিসের একটা প্রধান জাদুঘরের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলো। এই দুর্গটি ১১৯০ সালে নির্মাণ করেছিলেন রাজা ফিলিপ্পে অগুস্তে। ১৫৪৬ সালে প্রথম ফ্রাঁসোয়া এটাকে রেনেসাঁ যুগের একটা সত্যিকার প্রাসাদে পরিণত করেন। লুভরের সঙ্গে তুইলেরি প্রাসাদকে সংযুক্ত করতে সতেরো শতকের গোড়ার দিকে রাজা চতুর্থ অঁরি এখানে যোগ করেন গ্র্যান্ড গ্যালারি।

সংকীর্ণ অভিজাত শ্রেণীর হাত থেকে শিল্পকর্ম জনগনের কাছে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে লুভর হয়ে ওঠে নতুন ব্যবস্থার বিজয়ের এক স্বচ্ছ রূপক, আর নবীন প্রজাতন্ত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন দেখিয়ে অভিভূত করতে চায় বিশ্বকে।^২

ফ্রান্সের ইতিহাসে প্রায়ই যা ঘটতে দেখা যায়, রাজনীতির বর্ধিত অংশে পরিণত হচ্ছিলো সংস্কৃতি, এমন স্তরে বৃটেনেও যা ছিলো তুলনাহীন, কেননা সেখানে অভিগমন ছিলো সমানভাবে 'গণতান্ত্রিক'। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জঁ-মারি রোলঁ সেই সময়কর ন্যাশনাল কনভেনশনের সদস্য শিল্পী জ্যাক-লুই দাভিদের কাছে লেখা এক চিঠিতে ব্যাখ্যা দেন :

ধারণাটা হলো, লুভর গ্যালারিকে একটা জাদুঘরে পরিণত করা; ফরমানে সেটাই বলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমিই এর নির্বাহক এবং তত্ত্বাবধায়ক। জাতির কাছে

আমাকে অবশ্যই কৈফিয়ত দিতে হবে; এটাই উদ্যম আর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই জাদুঘরে অবশ্যই সৃষ্টি করতে হবে ড্রয়িং পেইন্টিং, ভাস্কর্য আর অন্যান্য শিল্পকর্মের বিশাল সম্পদ। আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, এটাকে হতে হবে বিদেশীদের কাছে আকর্ষণীয় এবং বিখ্যাত। এখানে থাকতে হবে শিল্পকৃতির স্বাদ, শিল্পরসিকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, আর শিল্পীদের সেবা দেবে এটি। অবশ্যই সবার জন্য উন্মুক্ত হতে হবে। প্রত্যেককে অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে তাদের ইজেল স্থাপনের যে কোনো তৈলচিত্র বা ভাস্কর্যের সামনে। তারা ইচ্ছেমতো সেগুলোর নকশা আঁকবে। ছবি আঁকবে, কিংবা সেগুলোকে মডেল করবে, যেমন ইচ্ছে। এই জাদুঘরটি হবে একটি জাতীয় স্মারক স্তম্ভ। এটি সংরক্ষণ করা হবে না কোনো ব্যক্তি-মানুষের আনন্দ লাভের জন্য...গৃহদের মতো ফ্রান্সকে তার মহিমা ছড়িয়ে দিতে হবে সকল সময়ে এবং সকল মানুষের কাছে; জাতীয় জাদুঘরটি প্রশংসিত হবে গোটা বিশ্বের কাছে...এমন বিশাল ভাবনা মুক্ত জনগনের কাছে মূল্য বহন করে যারা আধিপত্য বিস্তার করতে চায় শুধু জ্ঞানের মাধ্যমে, আর যারা যুক্তি ছাড়া অন্য কোনো নির্দেশ গ্রহণ করে না...এই জাদুঘর এমন উদ্দীপনা জাগাবে, আত্মাকে এমন উচুতে নিয়ে যাবে, আর হৃদয়কে উষ্ণ করে তুলবে যে, এটি ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অন্যতম প্রতীকে পরিণত হবে।^৩

এ ঘটনা ১৭৯২-এর ১৭ অক্টোবরের, ফরাসি প্রজাতন্ত্রের এক বছর পূর্তির সময়ে, এবং এটা লুভরের সংজ্ঞানির্ধারণমূলক বিষয় হিসেবেই রয়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে ১৯৬৩ সালে লুভরের কিউরেটর অব পেইন্টিংস আর্মেইন বাজিন বিষয়টা সম্পর্কে এভাবে উপসংহার করেছেন যে, লুভর জাদুঘরের দ্বৈত ভূমিকাটা ছিলো *exprimer le sens de l'universel, exalter les valeurs franxises*, অর্থাৎ এক দিকে *Universalism*-এর নির্যাস তুলে ধরা এবং ফরাসি মূল্যবোধের জয়গান গাওয়া।^৪

১৭৯৩ সালের ১০ আগস্ট রাজতন্ত্র উচ্ছেদের ঠিক এক বছর পর লুভর

উদ্বোধন করা হয়, কিন্তু এই নতুন জাদুঘরে মোনালিসা ও ভাসাই সংগ্রহের অবশিষ্টাংশ স্থানান্তর করা হয় ১৭৯৭ সালে। বাজিনের ক্যাটালগে মোনালিসা সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে, তাছাড়া মোনালিসার হাসির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে বলা হয়েছে, '*Madame Lise ditte la joconde... celebre par sa beaute*।'^৫

নেপোলিওন নিশ্চয়ই *Madame Lise*-এর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছিলেন, কেননা ১৮০০ সালে তিনি জাদুঘর থেকে প্রতিকৃতিটা সরিয়ে তুইলেরিতে তার শয়নকক্ষে স্থাপন করেছিলেন। তিনি সম্রাটের মুকুট পরার পর ১৮০৪ সালে সেটা আবার লুভরে ফিরে আসে।

লুভরের প্রকৃত নাম ছিলো *Musee central des Arts*, ১৮০৩ সালে তা *Musee Napoleon* নামে নামান্তরিত হয় এবং ১৮১৫ সালের সংস্কারের পর তা হয় *Musee Royal*। নেপোলিয়নের পরাজয় আর রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরে এলে নিশ্চিত হয় যে, কোনো একনায়ক বা সার্বভৌম শাসকের ব্যক্তিগত চিত্তবিনোদনের জন্য মোনালিসাকে আর সর্ব সাধারণের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে ফেলা হবে না। সংস্কারের ফলে কোনো সার্বভৌম শাসকের নিরংকুশ ক্ষমতা সংরক্ষিত হয়নি, এবং নেপোলিওনের মতো কোনো ভবিষ্যত নেতার পক্ষেও একটা জাতীয় সম্পদ নিজের ভোগে লাগানোর আশা করা আর সম্ভব ছিলো না। মোনালিসা এ সময়ে যৌথ মালিকানার বস্তুতে পরিণত হয়, সে যৌথ মালিকানা যদিও হয়তো সুসংজ্ঞায়িত ছিলো না।

১৭৯০ এর দশকে ইউরোপ জয়ের জন্য নেপোলিয়ন যে বিপ্লবী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসেছিলো শিল্পকর্মের বোঝা নিয়ে। বৃটেনে যা হতে পারতো লর্ড এলগিনের মতো অভিজাতদের ব্যক্তিগত পদক্ষেপ। ফ্রান্সে ব্যাপারটি ঘটেছিলো বিশ্বজনীনতা ও জাতীয়তাবাদের যুগ পতাকাতলে। ওয়াটারলুর পর ফ্রান্স চুরি করা মাস্টারপিসগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিলো বটে, কিন্তু প্রকৃত মালিকদের কাছে নয় বরং নতুন তৈরি করা জাদুঘরগুলোতে। বিপ্লব এভাবেই অনেকগুলো কাজের একটি সম্পাদন করেছিলো, আর সে কাজটি হলো আধুনিক মূল্যবোধের রপ্তানি।^৬ ইতালিয়রা সে সময় খুব নামজাদা নয় এমন শিল্পীদের কাজ রেখে দেয়ার সুযোগ দিয়েছিলো ফরাসিদের, সে সব শিল্পীদের মধ্যে কিমাবুয়ে, গিওন্তো ও ফ্রা আঞ্জেলিকোও ছিলেন। এমন কি প্রুশিয়া ও ইংল্যান্ডের মতো দেশগুলোতেও যেখানে অনুরূপ চুরি ছিঁকেমির ঘটনা ঘটেছিলো সেসব দেশেও শৈল্পিক মাস্টারপিসের অপসারণ আয়োজন তুলেছিলো। তার সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয়

ইংলিশ মহিলা কবি ফেলিপিয়া ডরোথি হিম্যানস (পিতৃপদী ব্রাউন, ১৭৯০-১৮৩৫) প্রকৃত মালিকানার দাবিদার দেশগুলোর কাছে ওই শিল্পকর্মগুলো ফিরিয়ে দেয়ার ওপর নিবেদন করে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন, 'দি রেস্টোরেশন অব দ্য ওয়ার্কস অব আর্ট টু ইটালি' শিরোনামে (১৮১৬)।^১ সুপরিচিত একটি ভ্রমণবিষয়ক বই থেকে উদ্ধৃত দিয়ে কবিতাটির মুখবন্ধ রচনা করেন তিনি :

ফরাসিরা, যারা প্রতিটি আশ্রাসনে ছিলো, ইতালির জন্য তারা ছিলো মারাত্মক যন্ত্রণার কারণ। প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা বর্বর জার্মান লুটেরা কিংবা দস্যুর চেয়ে তারা বেশি উৎকৃষ্ট ছিলো, তারা ভ্যাটিকানের অতুলনীয় সংগ্রহের দিকে নিজেদের লুটেরা হাত বাড়িয়েছিলো, সেখানকার মাস্টারপিসগুলো টেনে হিঁচড়ে নষ্ট করে প্যারিসে নিয়ে গিয়েছিলো, রেখেছিলো স্যাঁত স্যাঁতে আস্তাবলের দেয়ালে, অর্থাৎ লুতরে।^২

প্রচুর সংখ্যক তৈলচিত্র হারানোর পরও এসব 'স্যাঁত স্যাঁতে আস্তাবল' খুব দ্রুততার সঙ্গেই একটি প্রধান শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হচ্ছিলো, শিল্পী আর নকলকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করছিলো, তাছাড়া প্রথম বিদেশী পর্যটকদেরও টানছিলো তা—বিশেষ করে বৃটেনের পর্যটকদের।^৩ ইতিপূর্বে যেসব শিল্পী বড় শিল্পকর্ম সম্পূর্ণে জানতে চাইতেন, তাদের হতে হতো সেসব শিল্পকর্মের মালিকদের অনুগ্রহপ্রার্থী অথবা নির্ভর করতে হতো কপির উপর। এখন তাদের জন্য সরাসরি শিল্পবিষয়ক শিক্ষাদীক্ষার জায়গা তৈরি হয়ে গেলো লুতরে। এটা পরিণত হয়েছিলো 'তাদের' জাদুঘরে। নতুন-দশ দিনের বিপ্লবী সপ্তাহে পাঁচ দিনই ছিলো শিল্পীদের জন্য বরাদ্দ, দু'দিন রাখা হতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজের জন্যে, আর কেবলমাত্র তিন দিন ছিলো সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত।^৪

এমন শৈল্পিক প্রাচুর্যে শিল্পচেতনা আরো প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিলো। যারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কপি করতো তারা যতোদূর সম্ভব বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করতো; এবং যারা কপি করতো শেখার জন্য, তারা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতো কিংবা মূল শিল্পকর্ম থেকে প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন শিল্পকর্ম তৈরি করতো। বৃটিশ চিত্রকররা প্যারিসে এসেছিলো উদ্ভাবনীমূলক আইডিয়া নিয়ে। তারা

সরাসরি ক্যানভাসের ওপর কপি করতো তেল রঙে, অথবা কাগজের ওপর জলরঙে, তারা কাজ করতো দ্রুত, রঙ বদলাতো, আর সেগুলোর ওপর দিন ও রাতের প্রভাব পর্যবেক্ষণ করতো। অন্য আরো অনেক শিল্পীর সঙ্গে টার্নার ১৮০২ সালে প্যারিস গিয়েছিলেন নেপোলিয়নের লুট করা চিত্রসমূহ আর স্থায়ী সংগ্রহ দেখতে। তিনি বিশেষ করে অভিভূত হয়েছিলেন পুশিন এবং তিতিয়ানের শিল্পকর্ম দেখে। দেলাক্রোয়া (এবং পরে সেজান) কপি করেন রুবেন্সের শিল্পকর্ম। ইংগ্রেস আঁকেন রাফায়েল এবং পুশিনের ছবি। অন্যেরা নকল করেন ভেলাজকুয়েজ আর মুরিল্লোর চিত্রকর্ম। প্রত্যেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ভেনিসীয়, ফ্রেমিশ ও জার্মান শিল্পীদের শিল্পকর্মে, সর্বোপরি বারমিয়ার, পিটার ডি হুচ, ফ্রান্স হ্যালস ও রেমব্রান্টের দ্বারা। ঊনবিংশ শতাব্দি জুড়ে অধিকাংশ প্রধান ফরাসি শিল্পীই পুশিনের ছবি নকল করেছিলেন—ইংগ্রেস ও গেরিকন্ট থেকে দেগা, রদাঁ, সিউরাত ও সেজান পর্যন্ত অনেকেই। যেমন সেজান এক চিঠিতে লেখেন, '*Le Louvre est un livre ou nous apprenons a lire*' (অর্থাৎ 'লুভর একটা বই যেখানে আমরা পড়তে শিখি')।^{১১} দেলাক্রোয়া, যিনি তার রোজনামচায় লিখে গেছেন '*On commence toujours par imiter*' ('অনুকরণ দিয়েই শুরু করে সবাই')—সেই দেলাক্রোয়া কপি করেছেন রেমব্রান্ট, রুবেন্স, রাফায়েল ও করেজ্জিওর শিল্পকর্ম।^{১২} আবার তাকে কপি করেছেন সেজান, পিকাসো, মনে, ওদিলন রাদোয়াঁ, গগাঁ, মাতিস, গুস্তুমো ও আরো অনেকে।^{১৩}

আর মোনালিসা? রাফায়েলকে অনুপ্রাণিত করেছিলো যে প্রতিকৃতি, তা উৎসাহ জোগাতে ব্যর্থ হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্রকরদের। তারা সবাই ফ্লোরেন্সের মহান শিল্পীদের প্রশংসা করলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন লিওনার্দোকে কপি করেছিলেন।^{১৪} যেমন দেলাক্রোয়া, সাত জন শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর যে তালিকা তিনি করেছিলেন তাতে যদিও লিওনার্দোর নাম ছিলো (অন্যেরা হলেন রাফায়েল, মাইকেলএ্যাঞ্জেলো, তিতিয়ান, করেজ্জিও, রুবেন্স এবং রেমব্রান্ট), কিন্তু লুভরে সংরক্ষিত লিওনার্দোর কোনো ছবির কপি তিনি করেন নি—অবশ্য তার ড্রইংয়ের প্রশংসা করতেন তিনি।^{১৫} মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর ড্রইংয়ের একনিষ্ঠ ছাত্র সেজান লিওনার্দোর কোনো ছবির কপি আঁকেন নি। তবে ব্যতিক্রমও ছিলো। শিল্পী ক্যামিল রোট *La femme a la perle* নামে বিখ্যাত একটি ছবি এঁকেছিলেন বার্থি গোল্ডস্মিথের, ১৮৬৯ সালে আঁকা প্রতিকৃতিটায় বার্থিকে তিনি এঁকেছিলেন মোনালিসার ভঙ্গিমায় (১৫ নম্বর ছবিটি দেখুন), এবং ১৮৫৪ সালে দেগা আঁকেন গিওকোন্দার হাত ও মুখ (এখন সংরক্ষিত আছে লুভরের

ডিপার্টমেন্ট অব গ্রাফিক আর্টে)। এছাড়াও তিনি শিক্ষামূলক কাজ করেন লিওনার্দোর অ্যাডোরেশন ছবিটার ওপর (১৮৬৯, এখন সেটা সংরক্ষিত আছে ভিনচিয়ানার এলমার বেন্ট লাইব্রেরিতে)। জঁ-ফ্রাঁসোয়া মিলেট ১৮৪১-৪২ সালে আঁকেন *Portrait of Pauline-Virginie Ono* খ্রি-কোয়ার্টার ভঙ্গিতে, হাত ভাঁজ করা, সরাসরি দর্শকের দিকে দৃষ্টি, কিন্তু দাঁড়ানো, বসা অবস্থায় নয়। এটা এখন টাঙানো আছে জাপানের কোফুর ইয়ামামাশি প্রিফেকচারাল জাদুঘরে। তাঁর *Madame Engene Canoville* (১৮৪৫) কোলের ওপর মোনালিসার ভঙ্গিমায় হাত দেখেছে। অনুরূপভাবে অনুপ্রাণিত অন্যেরা কম পরিচিত; ভাস্কর জঁ-ব্যাণ্ডিস্ত কার্পিয়া (১৮২৭-৭৫); শিল্পী ও আলোকচিত্রি গুস্তাভ লে গ্রে (১৮২০-৮২); এবং সুইস-ফরাসি চিত্রকর ফেলিক্স এদুয়ার্দ ভালোটন (১৮৬৫-১৯২৫)।^{১৬}

লিওনার্দোর মহান ভক্ত গুদিলন রেদোয়া ১৯০৮ সালের দিকে আঁকেন *Hommage a Leonard de Vinci*, কিন্তু সেন্ট অ্যান থেকে ভার্জিনের মাথা আঁকেন।^{১৭} ইংরেজ আঁকেন *La Belle Ferronniere*, পরবর্তীকালে তিনি মোনালিসার ভঙ্গিমা ও পটভূমির দৃশ্যে প্রভাবিত হয়ে আঁকেন বিখ্যাত *Portrait de Madame Riviere* (১৮০৫)। যাহোক, বুভরে যেসব শিল্পী কাজ করতেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন পেশাদার নকলকারী। ১৮৫৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত নিখিল প্রদর্শনী পর্যন্ত কপির ক্রেতা ও জনসাধারণের জন্য সেখানে যাওয়ার সুযোগ ছিলো কেবল সপ্তাহান্তে (১৮০২ সালে নেপোলিয়ন পুণরায় সাত দিনে সপ্তাহ চালু করেন)। ১৮৫৫ সালের পর জাদুঘরটি প্রতিদিন সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হয়। শিল্পীরা এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানান, কেননা এর পরে তাদের কপি বিক্রি সহজ হয়ে যায়।^{১৮}

কপি যারা করতেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন নারী। ১৮৬০ সালে লেখক লিও ল্যাগারাঞ্জ অনুভব করেন, নাটক বা সঙ্গীতের চেয়ে মহিলারা তৈলচিত্রকে নৈতিকভাবে বেশি পছন্দনীয় মনে করে। যখন তারা কপি করে না তখন বাড়িতে সন্তান লালন-পালন আর সাংসারিক কাজের মধ্যেও আঁকাআঁকি করতে পারে। তিনি দাবি করেন, প্রতিভাধরদের কাজ আঁকতে সমর্থ না হলেও তারা অনায়াসে আঁকতে পারতো স্নেহাস্পদ শিশু, ফুলের ছবি আর ধর্মীয় চিত্র, অথবা বইয়ের অলংকরণ, কিংবা তারা বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানোর জন্য কপিও করতে পারতো। ল্যাগারাঞ্জ লেখেন, নৈতিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে এভাবে মহিলারা লাভজনক ক্যারিয়ার গড়তে পারতো, এবং সম্ভবত পুরুষদের আরো

পুরুষোচিত কাজে ফিরে যেতে অনুপ্রেরণা জোগাতো।^{১৯}

ল্যাগারান্সের আশাবাদ ভুল জায়গায় প্রয়োগ হয়ে থাকতে পারে—মহিলাদের কাজের অধিকারের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সোচ্চার। সচ্ছল ব্যক্তিরাই জাদুঘরটি সরগরম করে রাখতো। তাতে আকৃষ্ট হতো বেশ্যারা। শিল্পীদের জন্য এটা সুযোগ সৃষ্টির জায়গা হিসেবেও ব্যবহৃত হতো।

ঔপন্যাসিক শামফ্রিউরি(১৮২১-৮৯) এক নারী শিল্পীর কথা উল্লেখ করেছিলেন : ছবিটার পাশে বসে, আড্ডা মারতে মারতে কপি করে যাচ্ছে জাদুঘরটি বন্ধ হবার আগ পর্যন্ত।^{২০}

বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রচুর অভিযোগ আসতো যে, বিনামূল্যে ভেতরে প্রবেশের সুযোগ নিয়ে লোকজন লুভরের গ্যালারিতে ঘুমিয়ে রাত কাটায়। ১৯০২ সালে বিনামূল্যে প্রবেশ (বৃহস্পতি ও রবিবার ছাড়া) বিলোপ করায় এ সমস্যা অনেকটাই কমে আসে। তবে শিক্ষক, শিল্পী, সমালোচক ও বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের (স্বীকৃত কোনো শিল্পী সঙ্গে থাকলে) তখনও বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার ছিলো।^{২১}

প্রথমে মাত্র ৫৩৮টি চিত্রকর্ম ছিলো ডিসপ্রেতে। আর গ্র্যান্ড গ্যালারি ও সালোয়াঁ কারে নিয়ে গঠিত হয়েছিলো পুরো জাদুঘর। ১৮৫০ সালের পর এটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে কারো কারো গুরুত্বপূর্ণ অবদানে, ড. লুই লা কেজ তাদেরই একজন। ১৮৫৯ সালে তিনি এ জাদুঘরের জন্য ব্যক্তিগত সংগ্রহের অনেক ছবি দান করেন। আজকের দিকে লুভরের যেসব মাস্টারপিস দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তার অনেকগুলোই এসেছে ড. লা কেজের সংগ্রহ থেকে। প্যারিসে তার ভিলায় আটশ'য়েরও বেশি তৈলচিত্রের জায়গা দিতে সব আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছিলো, সে সবে মধ্য ছিলো রিবেরা, ফ্রান্স হ্যালস, রেমব্রান্ট, রুবেন্স, ওয়াট্টট ও ফ্রাগোনার্দের শিল্পকর্মও। ১৮৮০-এর দশক নাগাদ লুভর পরিণত হয় বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সংগ্রহশালায়।

১৮৪৮ সাল পর্যন্ত নতুন শিল্পকর্মের বার্ষিক প্রদর্শনী হতো লুভরের সালোয়াঁ কারে, 'সালোয়াঁ' নামেই সেটা ছিলো বিপুল ও ক্রমবর্ধমান সাফল্য। ১৮৩০-এর দশকে এতে এক হাজারেরও বেশি শিল্পী দুই হাজার শিল্পকর্ম প্রদর্শন করে। ১৮৪৬ সালে এখানে ১২ লাখ দর্শনার্থী আসে—প্যারিসের সমগ্র জনসংখ্যার চেয়েও যা বেশি।^{২২} উইলিয়াম থ্যাকারের মতো বিদেশী দর্শকরা ফরাসিদের চিত্রকর্মপ্ৰীতি দেখে অবাক হয়ে যান। আভিজাত্যের রুচি তখনও আধিপত্য নিয়েই বিরাজ করছিলো, কিন্তু প্যাট্রিশিয়ান শিল্প প্রতিষ্ঠান তার দরজা খুলে দিয়েছিলো ডিলার, বুদ্ধিজীবী, *nouveaux riches* এবং

উঁচু স্তরের আমলাদের জন্য। ফরাসি সংবাদপত্র ক্রমবর্ধমান হারে জায়গা দিচ্ছিলো শিল্পের জন্য। এ সময় আবির্ভাব ঘটে প্রথম শিল্প সমালোচকদের, তারা সাধারণত ছিলেন লেখক ও প্রাবন্ধিক।

L'Artiste-র মতো প্রভাবশালী শিল্পবিষয়ক পত্রিকায় লিখতেন বালজাক, জর্জ স্যান্ড, আলফ্রেড ডি মুসেট এবং থিওফাইল গতিয়ের। আরো বেশি অ্যাকাডেমিক পত্রিকা ছিলো *Gazette des Beaux-Arts*, ১৮৮০ সাল নাগাদ এ পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ছিলো প্রায় দু'হাজার।

নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য খোদাইয়ের কাজ বা এন্থ্রোভিনের একটা বাজার গড়ে উঠেছিলো। শিল্পীরা বেশ উদ্যমী হয়ে উঠেছিলো। নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিকদের মতো তাদের কাজও বিক্রি হতো একটার পর একটা। ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কাছে তাদের পরিচিতির বৃত্ত বাড়ছিলো, সেটাও একটা সুবিধা যোগ করেছিলো।

এখনকার মতো তখনকার দর্শনার্থীরাও ছিলো সুশিক্ষিত। অভিজাতরা বিশাল মূল্যবান ব'লে কোনো জিনিসকে পণ্য করতো তা নিজের চোখে দেখার জন্য প্যারিসের *nouvelle bourgeoisie* উৎসুক ছিলো। রবিবারগুলোয় তাদের কোনো কিছু করার থাকতো না, এমন কি প্যারিসের মতো স্থানেও, সুতরাং *Gardens of the Tuileries*-এ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর পর তারা বাচ্চাদের নিয়ে যেতো লুভরে।^{২০} সে সময় লুভর ছিলো একটা জনপ্রিয় জাদুঘরে রূপান্তরিত হওয়ার পথে। অন্যদিকে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা ভয়ানক প্রথাবাদী হিসেবে বিবেচিত হতো। বুর্জোয়াদের অভিরুচিও ছিলো বুর্জোয়াসুলভ। ১৮৬৭ সালে একদল দর্শনার্থীর বিবরণ দিয়েছেন জোলা :

সাধারণ বুদ্ধিমত্তার দশজন মানুষ নতুন ও আসল একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বড় একটি শিশুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে : তারা পরস্পরকে কঁনুই দিয়ে ঠুতো মারছে আর ছবিটার ওপর সবচেয়ে কৌতুককর মন্তব্য করছে।^{২১}

দশ বছর পর ১৮৭৭ সালে এই বর্ণনাটি স্থান পেয়েছিলো জোলা'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *L'Assommoir*-এ। সেখানে দর্শনার্থীরা মধ্যবিত্ত ফিলিস্তিন নয়, বরং গার্তেই ও কুপোর বিয়েতে আমন্ত্রিত শ্রমিকশ্রেণীভুক্ত অতিথি, যারা লুভর দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সোনালি-চুনট করা উর্দিপরা পোর্টারদের দেখে আতঙ্কিত, আসলের চেয়ে নলকারীদের কাজ

দেখে চমকিত হয় তারা সেখানে। তারপর সালোয়া কারে দেখে শেষ করে তাদের পরিদর্শন। জোকোন্দের পাশে একটু থামে কুপো। তার খালার মতো দেখাচ্ছে জোকোন্দেরকে, সে মন্তব্য করে। আর নগ্ন ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে বশ ও বিবি-লা-গ্রিলাদ চাপা হাসি হাসে।^{২৫}

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জাদুঘরগুলো প্রদর্শিত সামগ্রি সম্পর্কে মৌলিক তথ্য উপস্থাপন করে 'আধুনিক' হয়ে ওঠে : শিরোনাম, শিল্পী, সময় এবং কখনও কখনও ঘরানা।^{২৬} এমন কি এখনও লুভর জাদুঘরে ব্যাপকভাবে ফরাসি ভাষা ব্যবহৃত হয়, যদিও ৭০ শতাংশ দর্শনার্থীই বিদেশী।

যাহোক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী কাজের জোগান দিতো শিল্পীদের : প্রিয় চিত্রের কপি কিনতো তারা। ১৮৫১ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে (যখন আলোকচিত্রের চল ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো) মুরিল্লোর আঁকা *Immaculate Conception* ছবিটা কপি করা হয়েছিলো ১৮৬ বার, ভেরোনেজের *Marriage at Cana* ১৬৭ বার এবং তিতিয়ানের *Entombment* ১৩০ বার। অন্যদিকে মোনালিসা কপি করা হয় ৭১ বার, লক্ষ্যণীয় সাফল্য বটে, কিন্তু জনপ্রিয় ফরাসি চিত্রকর যেমন জ্যাঁ-বাগ্টিস্ত গ্রিউজের *Cruche cassee* (১৩৮ বার) এবং পিয়ের পল প্রুদোঁর *L'Assomption de la Vierge* (১৩০ বার) ইত্যাদি শিল্পকর্মগুলোর তুলনায় অনেক কম।^{২৭}

প্রধানত ধর্মীয় বিষয়ভিত্তিক ছবির কপিগুলোই বেশি বিক্রি হতো। ধর্মানুরাগই এর একমাত্র ব্যাখ্যা নয়। এখনকার মতো সেকালেও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে শিল্প-সংগঠনে প্রভাব বিস্তার করতো রাষ্ট্র। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য (১৮৫২-৭০) প্রাদেশিক জাদুঘর, টাউন হল এবং গির্জায় পাঠানোর জন্য অসংখ্য ছবির কপি করার নির্দেশ দিয়েছিলো। রাষ্ট্রের করতে দেয়া দু'হাজার ছবির মধ্যে অন্তত অর্ধেকের বিষয়বস্তু ছিলো ধর্মীয়।^{২৮}

এভাবেই মোনালিসার স্থান হয় দর্শক, নকলকারী এবং শিল্পী পরিবেষ্টিত এক শৈল্পিক জীবনের কেন্দ্রে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও আকর্ষণের কেন্দ্র ছিলো না মোনালিসা। বিখ্যাত প্রাচীন গুপ্তাদের আঁকা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে তা বিবেচিত হতো কিন্তু কোনো কাল্ট বা মুগ্ধ দর্শকের ভিড় সৃষ্টি হতো না তাকে ঘিরে। স্যামুয়েল মোর্সের *The Gallery of the Louvre* (১৬ নম্বর ছবিটি দেখুন) ছবিটিতে সালোয়া কারের তৈলচিত্রগুলো তুলে ধরা হয়েছে সেইসব আমেরিকানের জন্য যারা আসলগুলো দেখতে অসমর্থ। তবে মোর্সের ছবিটা বিশ্বস্ত নয় পুরোপুরি, কেননা শুধুমাত্র প্রিয় শিল্পীদের তৈলচিত্রগুলোই তিনি তুলে ধরেছেন : পুশিন, তিতিয়ান, ভ্যান ডাইক, রুবেন্স, রেমব্রান্ট,

গুইডো রেনি, মুরিল্লো এবং মোনালিসা।^{৯৯} অবশ্য জন স্কার্লেট ডেভিসের *The salon carre and the Grande Galerie of the Louvre* (১৮৩১, ১৯ নম্বর ছবিটি দেখুন)। ছবিটিতে মোনালিসার কোনো চিহ্ন নেই। লিওনার্দোর প্রচণ্ড অনুরাগী আর্সিন হুসের *L'Artiste* সাময়িকী ১৮৪৯ সালে লুভর জাদুঘরের তৈলচিত্রসমূহের ওপর যে শীর্ষ নিবন্ধ প্রকাশ করে তাতেও *Joconde* সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয় নি। অথচ এই পত্রিকার কনট্রিবিউটর ছিলেন গতিয়ের (যিনি মোনালিসাকে রেনেসাঁ যুগের অসামান্য প্রতিকৃতি হিসেবে অভিহিত করেছিলেন)।^{১০০}

এই শিল্পকর্মটি সম্পর্কে শিল্পানুরাগীরাও কম জানতো। ১৮৪৩ সালে ফ্রান্সের একটি আদালতে মঁসিয়ে ল্যামবেয়ার নামে এক কূটনীতিক একটি অভিযোগ দায়ের করেন। ল্যামবেয়ার বিচারকদের জানান, মঁসিয়ে ক্রসলে নামে এক আর্ট ডিলার তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে : ‘বিক্রির জন্য একটা তৈলচিত্র ছিলো তার কাছে যেটা আমাকে তৎক্ষণিকভাবে মোহাবিষ্ট করে : সেটা ছিলো লিওনার্দোর *Joconde*। আমি ওটার জন্য নগদ ২৪,৫০০ ফ্রাঁ দিয়েছি।’ ল্যামবেয়ারের দূর্ভাগ্য, *Joconde* আসল ছিলো ব’লে আর্ট ডিলারের দাবির কোনো প্রমাণ পায় নি আদালত, সুতরাং শুনানির যাবতীয় খরচ নিজের পকেট থেকে পরিশোধ করতে বাধ্য হন অভিযোগকারী।^{১০১}

রেনেসাঁ যুগের অন্য সুপ্রতিষ্ঠিত মাস্টারপিসের তুলনায় মোনালিসা ছিলো কম উচ্চমূল্য সম্পন্ন, লুভরের আনুষ্ঠানিক ক্যাটালগে ছবির তালিকা পরীক্ষা করলেই সেটা বোঝা যায়। লুভর কর্তৃক বিশেষজ্ঞদের একটি কমিশন নিযুক্ত করা হয়েছিলো প্রতিটি তৈলচিত্রের বাজারমূল্য যাচাই করে দেখতে—অর্থাৎ নিলামে কতো দাম আসে তা দেখা। ১৮৪৯ সালের সংস্করণ, যেটার সম্পাদক ছিলেন ফ্রেডারিক ভিলোট। মোনালিসা ছিলো সেই তালিকার ৩০০ নম্বর চিত্র—*Le Potrait de Mona Lisa connue sous le nom de la Joconde*—সেটার মূল্য ধরা হয়েছিলো ৯০,০০০ ফ্রাঁ, ১৮১৫-২১ সালের তুলনায় ১০,০০০ ফ্রাঁ বেশি। এটা ছিলো উল্লেখযোগ্য মূল্যায়ণ, যদিও বর্তমানকালের আন্তর্জাতিক শিল্পবাজারের মানের দিক থেকে বেশ পরিমিত : সে সময় প্যারিসের সুন্দর কোনো এলাকায় একটা আরামদায়ক মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর বাড়ি ৫০,০০০ ফ্রাঁ’য় পাওয়া যেতো। ১৮৫২ সালে, যখন জাদুঘরের সংগ্রহের বাজেট ছিলো মাত্র ১০০০০০ ফ্রাঁ, তখন অন্যান্যের মধ্যে পেরুগিনোর *Virgin, Two Saints and Two Angels* কেনা হয়েছিলো ৫৩,৩০২ ফ্রাঁ’র বিনিময়ে এবং মেমলিং-এর *St. John and Magdalen*

১১,৭২৮ ফ্রাঁ'য়। মোনালিসার মূল্য ৯০,০০০ ফ্রাঁ উঠলেও লিওনার্দোরই অন্য ছবি *Virgin of the Rocks*-এর আরো ভালো দাম ওঠে (১৫০০০০ ফ্রাঁ), যদিও *St. Anne with Virgin and Child*-এর চেয়ে অনেক বেশি (৩০,০০০ ফ্রাঁ), যেটার বিস্ময়করতায় নিয়ে সেসময় রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিলো।^{৩৪}

মোনালিসা অবশ্য দামের দিক থেকে ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারে নি তিতিয়ানের *Les Pelerins d'Emmaiis*-এর (১৫০০০০ ফ্রাঁ), আর রাফায়েলের *La Vierge, l'Enfant dessus et Saint Jen* (*La Belle jardinière* নামেই পরিচিত) ৪০০০০০ ফ্রাঁ, (১৮২১ সাল থেকে ১০০০০০ ফ্রাঁ বেশি) এবং *Sainte Famille* (৬০০০০০ ফ্রাঁ)-এর কাছে তো বামনতুল্য।

শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে মোনালিসা ব্যাপক আগ্রহ জাগাতে শুরু করে, তবে তখনও সেটা ছিলো অসংখ্য প্রসিদ্ধ তৈলচিত্রের একটি। উদাহরণ স্বরূপ, জোসেফ কাস্তিলিওনে তার *Vue du Salon Carre au Musee du Louvre* (৮৬১, ২০ নম্বর ছবিটি দেখুন) শীর্ষক তৈলচিত্রে দেখান, দর্শনার্থীরা বিশাল হলঘরে নিবিষ্ট মনে অবলোকন করছে যেখানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তৈলচিত্রগুলো টাঙানো আছে। ভেরোনেজের বড় ছবিগুলো সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু ক্ষুদ্রকায় মোনালিসাকে খুঁজে বের করতে একটু চেষ্টা করতে হয়, দু'জন মুরিশ দর্শনার্থীর পাগড়ির আড়ালে তা আংশিক লুকায়িত। লুভরে স্থান পাওয়া উঁচু মর্যাদার একটা চিহ্ন, কিন্তু ওই মহিলা ভাগাভাগি হয় আরো কয়েক শ' ছবির সঙ্গে। আঁদ্রে মার্লরো লেখেন, 'জাদুঘর স্রেফ মাস্টারপিস প্রদর্শন করে না, বরং সেগুলো সৃষ্টি করে।' কথাটা আংশিক সত্য। শিল্পকর্মের পক্ষে আলোচনা এবং লেখালেখিও প্রয়োজনীয় বিষয়। এখানেই আবির্ভাব ঘটে শিল্প-সমালোচকদের। জাদুঘর তাদের কাঁচামাল জোগান দেয়।

ষোলো শতকে ভাসারি একটা প্রবণতা চালু করেন যখন তার *Le Vite de' piu eccellenti pittori, scultori e architetti* পরিষ্কারভাবে চিত্রকর, ভাস্কর আর স্থপতিদের একটা টেবিল তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকেরা নতুন এক ভূমিকা খুঁজে পায় : সাদাসিধে দর্শকদের সামনে সেই জিনিস তুলে ধরা যা প্রথম দর্শনে স্পষ্ট নয়।

বিশ শতকে এ বিষয়টা রীতিমতো প্রয়োজনীয়তায় মোড় নেয়, যেহেতু শিল্পীরা ক্রমবর্ধমানহারে উপস্থাপন করতে থাকে আইডিয়া, মেজাজ, অনুভূতি এবং ধারণা। সাধারণ দর্শকেরা প্রায়শই এমন প্রতিক্রিয়ায় সংকুচিত হয়ে যায়

যে, 'এসব আসলে কি?' এবং 'একটা শিশুও এটা করতে পারে।'

কিন্তু মোনালিসার দিকে তাকিয়ে কেউ বলতে পারবে না, একটা শিশুও এটা করতে পারবে, তবে ভাসারির মতো বিবরণ অনেকেই দিতে পারবে। শিল্প-সমালোচকেরা পরবর্তী সময়ে এর থেকে আরো পেছনে সরে যায়। উনিশ শতকে দর্শনযোগ্য শিল্পের স্ব-নিয়োজিত ব্যাখ্যাদাতা ছিলেন কবি ও লেখকেরা, বুদ্ধিজীবী ও পেশাদার বিশেষজ্ঞেরা নয়। যে জিনিসটা বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো সেটা হলো কোনো শিল্পকর্মের অর্থের সিদ্ধান্ত স্থির করার ক্ষমতা। অন্য কোনো স্থানের তুলনায় ফ্রান্সেই বেশি প্রধান লেখকেরা ব্যাপকভাবে শিল্পবিষয়ক লেখালেখি করতেন : স্তঁদাল, থিওফিল গতিয়ের, শার্ল বদলেয়ার, জর্জ স্যাভ ও এমিল জোলা।

'নয়-দশ বছর বয়সে,' ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝিতে তার স্মৃতিকথায় কেনেথ ক্লার্ক লেখেন, 'আমি যথায়থ আত্মবিশ্বাস নিয়েই বলেছি "এটা ভালো ছবি, ওটা খারাপ"...কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এই আত্মবিশ্বাস টিকে ছিলো, আর বিদঘুটে ব্যাপার হলো কতো মানুষই না আমার ওই বিচার মেনে নিয়েছে। আত্মবিশ্বাসের এক দীর্ঘ অক্ষতিকর চালাকি হিসেবে আমার পুরো জীবনটাকে বর্ণনা করা যেতে পারে।'^{৩৫}

ক্লার্কের অনেক আগে পণ্ডিত ব্যক্তিরা শিল্পকর্মের 'ভেতরের অর্থ' ধরার চেষ্টা করেছেন এবং তা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়েছেন যারা আগে থেকেই মনে করে প্রতিটা শিল্পকর্মেরই ভেতরের অর্থ আছে। অন্যদিকে উনিশ শতকের শিল্প-সমালোচকেরা কোনো তৈলচিত্রের ডিটেইলের দিকে মনোযোগ দিতেন না। আবার অনেক ব্যাপ্ত দর্শকের কাছে প্রথম প্রতিচ্ছবিটাই হোতো শেষ প্রতিচ্ছবি।

এ বিষয় আরো এক ধাপ এগিয়ে যায় শিল্প-সমঝোতার 'গণতন্ত্রায়ণে'। প্রথমে তৈলচিত্রগুলো কেড়ে নেয়া হয় অভিজাত শ্রেণীর কাছ থেকে। এরপর তা পরিণত হয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের সম্পদে। নতুন যুগ ছিলো এমন একটা সময় যখন জনের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিলো প্রতিভা। আমরা দেখতে পাই কোনো চিত্রকর্ম পর্যবেক্ষণের সময় সে সম্পর্কে আগে থেকেই প্রাপ্ত তথ্য আমরা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি না। এটা একজন শ্রদ্ধাভাজন শিল্প-সমালোচকের মতামত। এ কথা অবশ্য উপন্যাস, নাটক কবিতা ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সত্য। কিন্তু এসব সাংস্কৃতিক বস্তুর কখনোই দর্শনগ্রাহ্য অনুরাগের বিস্তার নেই। সিমাবুয়ে ও গিওস্তো আধুনিক পশ্চিমা শিল্পকলার প্রতিষ্ঠাতা, মনে'র *Dejeuner sur l'herbe* প্রথমে অমর্যাদার সঙ্গে

বিবেচিত হয়েছিলো, *Guernica* একটি ফ্যাসিস্টবিরোধী শিল্পকর্ম যা বান্ধ অঞ্চলের একটি শহরে আকাশ থেকে বোমাবর্ষণের কথা ঘোষণা করছে—এই সব তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, কোনো কাজের প্রতি আমরা কিভাবে দৃষ্টিপাত করবো। আর যখন নির্দিষ্ট কোনো হাসির ব্যাপার বলা হয় যে, সেটা প্রহেলিকাময় বা রহস্যজনক তখনও এ কথা সত্যি।

যে মানসিক গঠন দিয়ে আমরা কোনো শিল্পকর্মের দিকে তাকাই তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বর্ধন এবং শিল্প-সমালোচনার পেশাদারিত্বের ফলে বুদ্ধিজীবী-শিক্ষাবিদেব্রা শিল্পের ইতিহাসকে অ্যাকাডেমিক শৃঙ্খলায় রূপান্তর করতে সক্ষম হন। ব্যাপারটাকে আরো জোরালো করে তুলতে একটা বিশেষায়িত ভাষাও তৈরি করেন তারা। ফ্রান্সে গতিয়ের ও অন্যেরা গদ্য-কবিতার ভাষা ব্যবহার করতেন, যেমনটা ইংল্যান্ডে করতেন ওয়াল্টার প্যাটার এবং জন রাসকিন। এর পরিবর্তে আসে আরো আনন্দদায়ক স্টাইল। যাহোক, *litterateurs*-এর ঐতিহ্য তখনও শক্তই থেকে যায়। তারা যে বিশাল দর্শক তৈরি করেছিলেন, তা বজায় রাখতে ইচ্ছুক ছিলো আধুনিক বিশেষজ্ঞরা। লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারির পরিচালক কেনেথ ক্লার্ক ১৯৩৩ সালে (তখনও তার বয়স তিরিশ বছর হয় নি) গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন প্যাটার ও রাসকিনের স্টাইল এবং চিন্তার ধরণে। এর ফলে তিনি ব্যাপকসংখ্যক জনমানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে সক্ষম হোন। অনেক বছর পর দর্শনযোগ্য শিল্পের ব্যাপক আগ্রহ এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এর আবেদন তাকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ব্যক্তিতে পরিণত করে। টেলিভিশনে ধারাবাহিক প্রচারিত সেই অনুষ্ঠানটির নাম ছিলো *Civilization*।

উনিশ শতকে অবশ্য অ্যাকাডেমিকরা এসব ধরে রাখতে পারে নি। এক দল অভিজাত লেখক, কবি ও প্রাবন্ধিক এ ক্ষেত্রে বিশেষ রুচি তৈরি করেন, প্রত্যেকেই এক ধরনের উঁচু স্তরের সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতার চর্চা করতে থাকেন। তারা চিত্রকরদের বিভিন্ন ঘরানায় শ্রেণীভুক্ত করেন নি, আর গুণবিচারেও মনোযোগ দেন নি তেমন একটা। এসব লেখক আর তাদের দর্শকদের কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞানের বৃত্ত ছিলো অভিন্ন—সেগুলো হচ্ছে গ্রীক ও রোমান পুরাণ, বাইবেল, রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপিয় ইতিহাসের খসড়া রূপরেখা ইত্যাদি। তারা সবাই জানতো, লেডাকে মোহাবিষ্ট করার উদ্দেশ্যে রাজহাঁসে রূপান্তরিত হয়েছিলেন জিউস, জিউ তার শিষ্যদের বলেছিলেন, তাদের একজন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। সাধারণত এ ধরনের জ্ঞানের বিষয়গুলোই রেনেসাঁ যুগের শিল্পীরা সচরাচর প্রতীক হিসেবে

ব্যবহার করতেন, যার মর্ম ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হতো। তবে জটিলতম সংকেতের অর্থ উদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিলো পরবর্তী শতাব্দী পর্যন্ত। পুরোপুরি ওই শিল্পকর্মের শিল্পীটিকে বর্জন করতে পারে না (সে রাফায়েল বা পিকাসোর মতো নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষই হোক আর 'প্রাচীন গ্রিকগণ'-এর মতো অনির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রেই হোক)। শিল্পকর্মটি তখনই বিপুল মনোযোগ আকর্ষণ করে যখন এর স্রষ্টা মহান শিল্পী হিসেবে সাধারণভাবেই বিবেচিত হয়ে থাকেন। মোনালিসা যে মোনালিসা হয়ে উঠলো, সেটা শুধু সর্বোচ্চ দৃশ্যগ্রাহ্যতার জন্যেই নয়, বরং অতিশয় বিশেষ এক স্রষ্টার সঙ্গে এর যোগসূত্রের জন্যেও। লুভরে স্থান পাওয়াটা ছিলো মোনালিসার সৌভাগ্য গঠনের অসংখ্য অবদানমূলক সূচকের একটি। লিওনার্দো কর্তৃক অঙ্কিত হওয়াটা আরেকটা বিষয় কিন্তু সেটাও যথেষ্ট ছিলো বলা যাবে না। রেনেসাঁ যুগের তিন মহান শিল্পীর জীবনীকার এবং লুভরের সাবেক ডেপুটি কিপার শার্ল ক্রিমেন্ড ১৮৬১ সালে মোনালিসা সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন, কিন্তু তার লেখায় মোনালিসার জন্য মাত্র তিনটি পৃষ্ঠা উৎসর্গ করেছেন; Joconde-এর চেয়ে অনেক বেশি মন্তব্যবিষ্ট হয়েছিলেন তিনি St. John শিল্পকর্মটির প্রতি।^{৩৬} এটাকে তিনি মনে করতেন *Eternal Feminine*-এর উৎকৃষ্ট উপস্থাপনা। অঁতিয়ে দেলাকুজ ১৮৪১ সালে লিওনার্দোর ওপর একটি লেখায় খুব দ্রুত ও সংক্ষিপ্তভাবে মোনালিসার উল্লেখ করেন জিনেভা দে বেনচির প্রতিকৃতির কথা বলতে গিয়ে। তারপর তিনি শিল্পীর অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর দিকে আলোকপাত করেন।^{৩৭}

তবু মোনালিসার প্রয়োজন লিওনার্দোকে। মোনালিসা মিথ্যে পরিণত হতে দরকার হয় লিওনার্দোর মিথ।

চতুর্থ অধ্যায়

লিওনার্দো ভক্তি

কল্পনা করুন বিশাল এক জাদুঘরে অসংখ্য পর্যটকে ঠাশাঠাশি, তাদের পা ব্যাথা করছে, কিন্তু অবসর নেই, দু'ঘণ্টার মধ্যে কয়েকশ' শিল্পকর্ম দেখা শেষ করতে হবে। তারা একটু থামে, তাড়াতাড়ি করে শিল্পীদের নাম দেখে নেয়। তারপর স্বীকৃতির দৃষ্টি : এটা বস্টিচেপ্লির আঁকা, এটা মোপেটের, এটা কারাভাজ্জিও'র। সামান্য একটু থামা হয়; চকিত চাহনি বদলে যায় শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে। ব্র্যান্ড নেম আর ডিজাইনারের লেবেল উঁচু সংস্কৃতিতে ক্রিয়াশীল হয়, যেখানে মনোযোগ আকর্ষণ আর প্রশংসার জন্য শিল্পকর্মগুলোকে রীতিমতো প্রতিযোগিতা করতে হয়। এখানে শিল্পীর খ্যাতি একটা বড় ব্যাপার। রেনেসাঁ যুগের দৃষ্টান্তমূলক প্রতিভাধর কোনো শিল্পীর কাজ মানেই তুলনাহীন সুবিধা। এটা ছিলো মোনালিসার খ্যাতির শীর্ষে উঠে আসার একটি অপরিহার্য উপাদান।

আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির প্রতি প্রলুব্ধ হয়। তাদের কাছে তিনি 'আমাদেরই একজন।' গোয়ায়েতে, ওয়ান্টার প্যাটার, পল ভালেরি ও সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতো বড় মাপের ব্যক্তিদের আর কোনো শিল্পী, এমন কি মাইকেলএ্যাঞ্জেলোও এতোটা কাছে টানে নি।

লিওনার্দো কাল্ট শুরু হয় উনিশ শতকে, যে সময়ে ইতালীর রেনেসাঁ 'আবিষ্কৃত' হয়েছে এবং রেনেসাঁ যুগে সৃষ্ট শিল্পের জ্ঞান অর্জন শিক্ষিত সমাজের জন্য প্রায় আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। এর আগে পর্যন্ত উচ্চশ্রেণীর ভ্রমণকারীদের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আর অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বুদ্ধিজীবীরাই ইতালিয় শিল্পকলায় আমোদিত ছিলো। পুরো আঠারো শতক জুড়ে ইতালিয় শিল্পীরা—চিত্রকর, গায়ক, সুরকার, স্থপতি—স্বদেশে পৃষ্ঠপোষক খুঁজে না

পেয়ে রাশিয়া থেকে পর্তুগাল পর্যন্ত কাজ খুঁজে ফিরেছেন।^১ কিন্তু রাবোলেই ও মঁতেই, যাঁরা ষোলো শতকে ইতালি ভ্রমণ করে সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন, তারা কিন্তু বিখ্যাত রেনেসাঁ শিল্পীদের কথা উল্লেখ করেন নি বললেই চলে। তাদের যা আকৃষ্ট করেছিলো তা হলো রোম ও গৃসের মহিমা। লিসিগ্রাম ও ফেইদিয়াসের মতো গৃক স্থপতি। আপেল্লোসের মতো চিত্রকররা বেশ যাত্রণার মধ্যে ছিলেন। তাদের খ্যাতি ছিলো পুরোপুরি প্রকৃতি প্রত্যায়নত : তাদের কাজের কিছু রোমান কপিরই অস্তিত্ব রয়েছে। খ্যাতি আরোপের ক্ষেত্রে সরাসরি অভিজ্ঞতার খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না; এই কথার সাথে কেউ এক মত নাও হতে পারে। গৃক কবিতা, গৃক নাটক আর গৃক দর্শন দু'হাজারের বেশি সময় ধরে খুব একটা উৎকৃষ্ট ছিলো না। কে সন্দেহ করতে পারে যে, গৃক শিল্পকলা, সেটা কি আমাদেরকে আদিম যুগে নিয়ে যায় না, এর চেয়ে বেশি নিরুত মডেল কি আর হতে পারতো? ইতালিতে প্রথম দিককার ভ্রমণকারীদের আসল গন্তব্য ছিলো রোম এবং ফ্লোরেন্স বা ভেনিস।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রেনেসাঁকে প্রাচীন বিশ্বের সঙ্গে একটা সমতা হিসেবে দেখতে শুরু করা হয়। তবে ১৮৬১ সালে এ ব্যাপারে চার্লস ফ্রেমেন্ট লেখেন মধ্যযুগ সম্পর্কে উনিশ শতকীয় প্রচলিত ঘৃণার সাথে অজ্ঞতা আর অন্ধকারের শতাব্দীগুলোর 'ধ্বংস ছাড়া' কিছুই রেখে যায় নি, সেটা কিংস হয়ে আসে রেনেসাঁর 'গ্রীষ্ম দিনের' আগমনের এবং 'এরই এক কাঁকে দান্তে ও গিয়োস্তো কবিতা ও শিল্পকলা পুনরুজ্জীবিত করে গেছেন।'^২

রেনেসাঁ নিয়ে মোহাচ্ছন্নতা যেমন বাড়ছিলো তেমনি তুসকানির প্রশংসাও ছড়িয়ে পড়ছিলো, ভাসারির খ্যাতিতে যা উজ্জ্বল। তিনি ভেনিসিয়দের মূল্যের বিনিময়ে ফ্লোরেন্সের শিল্পীদের উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন তাঁর *Le Vite de' piu eccellenti pittori, scultori e architetti* নামক রচনায়। আঠারো শতকে (এবং উনিশ শতকের প্রায় সবটা ছুড়েই) সর্বাধিক পরিচিত ও প্রশংসিত ইতালিয় শিল্পী ছিলেন মাইকেলএ্যাঞ্জেলো, ভাসারির নিজেরও দারুণ পছন্দে ছিলেন তিনি। মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর সমস্ত বড় কাজ সবাই দেখতে পেতো, সেটা লিওনার্দোর মতো ছিলো না। জীবনকালে তাঁর অগ্রগণ্যতা ছিলো এমনই নজিরবিহীন যে তিনি 'সব রকম সম্মাননা, উপাধি ও প্রশংসা পরিহার' করতে পারতেন। ১৫৬৪ সালে মৃত্যুর পর তাঁর যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তা ছিলো কোনো শিল্পীর জন্য এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বড়।^৩

এভাবে আঠারো ও উনিশ শতকে অন্য সবার ওপরে মাইকেলএ্যাঞ্জেলোকে স্থান দিয়ে একটা ঐক্য পুনরুৎপাদিত হয় যা

ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ষোলো শতকে। এক মহান রাজার সম্মানিত অতিথি হিসেবে ফ্রান্সে মৃত্যুবরণ করলেও ১৮০০ সাল পর্যন্ত লিওনার্দোকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে সামান্যই।^৮ ততোদিনে অবশ্য লিওনার্দো, রাফায়েল এবং মাইকেলএ্যাঞ্জেলো পুরনো মাস্টার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিলেন। উনিশ শতকে এসে যোগ হন বন্ডিচেল্লি, পিয়েরো দেল্লা ফ্রান্সেসকা, গিওত্তো, ভার্মিয়ার, এল গ্রেকো এবং আরো অনেকে। বিশ শতকে এই দূর্লভ ক্লাবে যুক্ত হবার মতো নাম পাওয়া গেলো খুব সামান্যই।

কাউন্ট ফ্রান্সেস্কো আলগারোত্তির প্রভাবদায়ক রচনা *Saggio sopra is pittura* প্রকাশিত হয় ১৭৬২ সালে এবং প্রায় সাথে সাথেই অনূদিত হয় ফরাসি, ইংরেজি ও জার্মান ভাষায়। এতে ঘোষণা করা হয় যে, 'নশ্বর মানুষের পক্ষে যতোদূর উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া যায় রাফায়েল এখন সর্বজনীনভাবে বিদ্বত্তার সেই মাত্রা পর্যন্ত সিদ্ধি অর্জন করেছেন বলা যায়।'^৯ উইলিয়াম হ্যাজলিট ১৮১৭ সালে 'চারুকলা বিষয়ক' শীর্ষক এক প্রবন্ধে (সেটা নেয়া হয়েছিলো এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার জন্যে একটি লেখা থেকে) লিওনার্দোকে তিনি বিবেচনা করেছেন এমন এক মানুষ হিসেবে 'যিনি নিজের আঁকা ছবিকে খুব বেশি মিশিয়েছেন বিজ্ঞানের সঙ্গে,' এবং যাঁর ছবির নারীদের অভিব্যক্তি রক্ষিতা অথবা সেইন্টদের সমান।^{১০}

হোরেস ভার্নেতের বিখ্যাত তৈলচিত্র *Raphael au Vatican* (১৮৩২, ২১ নম্বর ছবিটি দেখুন) রাফায়েলকে দৃঢ়তার সঙ্গে স্থাপন করে মধ্যমনির আসনে—সর্বোপরি তিনিই এটার মূল বিষয়। রাফায়েলকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে তরুণ ও সুদর্শন হিসেবে—যেমনটা তিনি সব সময়ই ছিলেন। তিনি মারা যান সাইত্রিশ বছর বয়সে। তাকে এখানে দেখা যাচ্ছে অঙ্কনরত অবস্থায়, বন্ধু ও গুনগ্রাহীরা তাকে ঘিরে রেখেছে, বাচ্চা কোলে অল্প বয়সী এক মা দৈবাৎ সেখানে এসে পড়েছে। পুরোভাগে, বাম দিকে দেখা যাচ্ছে মাইকেলএ্যাঞ্জেলোকে, তার হাতের ওপর কাগজপত্র, পরিকল্পনার নকশা আর তাঁর মূর্তির একটা ক্ষুদ্র রেপ্লিকা, তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত এক নারীর ওপর, একজন সম্ভাব্য মডেল। একটা পাটাতনের ওপর পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস ভবিষ্যতের প্রকল্প পরীক্ষায় ব্যস্ত। সেখানে লিওনার্দোও আছেন, কিন্তু ডান পাশে অনেক দূরে, তাঁকে দেখা যাচ্ছে নিকটবর্তী জটলার দিকে তাকিয়ে আছেন ঐকান্তিকভাবে (কিংবা হয়তো উদাসীনভাবে)।

আরো আগে অ্যানিসেত লেমোনিয়ের-এর *Francois I recevant dans la salle des suisses a Fontainebleau La Grande*

Sainte Famille de Raphael (১৮১৪, ২২ নম্বর ছবিটি দেখুন) শীর্ষক তৈলচিত্রে দেখা যায় অনেক চিত্রকর ও লেখকসহ সভাসদ পরিবেষ্টিত রাজা, তাদের মধ্যে আছেন টমাস মুর, রাবেলেই ও প্রিমাতিচিও প্রমুখ। রাফায়েলের *Holy Family* পর্যবেক্ষণ করছেন রাজা প্রথম ফ্রাঁসোয়া। মনে হয় লিওনার্দোকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি—ডান দিকে লিওনার্দোকে দেখা যাচ্ছে—কিন্তু বুড়ো মানুষটিকে দৃশ্যত মনে হচ্ছে কৌতুহলবিহীন এবং কিছুটা অসম্বস্ত।

১৭৯৬ সালে লুভরের চিফ কিউরেটর অব পিকচার্স হবার্ট রবার্ট একটা বিশাল ক্যানভাসে তুলে ধরেন বড় রকমের জাদুঘরে পরিণত হলে গ্র্যান্ড গ্যালারিকে কেমন দেখাবে (২৩ নম্বর ছবিটি দেখুন)। পুরোভাগে দেখা যায়, রাফায়েলের *Holy Family* থেকে কপি করছেন বিভিন্ন শিল্পী। কাছেই রয়েছে গুইডো রেনিও ও তিতিয়ানের তৈলচিত্র (তার *Entombment*)। মেঝের ওপর অন্য নকলকারীরা কাজে ব্যস্ত। সেখানে লিওনার্দো বা মোনালিসার ছায়াটিও নেই।

আজকের দিনে লুভরের প্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচিত তৈলচিত্র থেকে মোনালিসাকে বাদ দেয়াটা হবে প্রতিমা ভাঙার মতো জঘন্য একটি কাজ। তবুও মোনালিসা বিশ্বের সবচেয়ে সুপরিচিত তৈলচিত্রে পরিণত হয়েছে বটে, কিন্তু বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর স্বীকৃতি লিওনার্দো কখনই পান নি। শিল্পের ইতিহাসে অবশ্য তার শিল্পকর্মের প্রতি উৎসর্গীকৃত কাজের পরিমাণের দিক থেকে তিনিই এগিয়ে আছেন সবার থেকে—যারা নিজেদের কাজ উৎসর্গ করেছেন তাঁকে তাদের মধ্যে আছেন মাইকেলএ্যাঞ্জেলো, রাফায়েল, পিকাসো ও রেমব্রান্টের মতো শিল্পীরাও। যাদের প্রত্যেকের শিল্পকর্মের পরিমাণ তাঁর চেয়েও অনেক। কোনো সন্দেহ নেই, লিওনার্দোর শিল্পকর্ম নিয়ে চালানো অনুশীলনের সংখ্যা বিপুল, কিন্তু সেগুলোর বেশির ভাগই তার বৈজ্ঞানিক কাজ এবং তাঁর ড্রইংয়ের প্রতি উৎসর্গীকৃত। ১৯৭৯ থেকে *বিবলিওগ্রাফিয়া ইতালিয়ানা*দি স্তোরিয়া দেল্লা সায়েনজা লিওনার্দো ও বিজ্ঞানের ওপর প্রায় ৩৭৯টি রচনা রেকর্ড করেছে। আমেরিকার লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের কি-ওয়ার্ড সার্চ হিসেবে ১২১৯টা হিট হয়েছে, নিউইয়র্ক পবলিক লাইব্রেরিতে হয়েছে ৪১১টি। তারপরও লিওনার্দো মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর চেয়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছেন (১৬৩৫টি এবং ৬০২টি) আর সবার উপরে রয়েছেন পিকাসো (১৮০৪টি এবং ৯৩৫টি)।^৮

লিওনার্দোকে ঘিরে একটা কান্ট বা হুজুগ তৈরি হওয়ার পেছনে একজন প্রধান শিল্পী হিসেবে তার পরিচয় ছাড়াও তাকে একজন মহান বিজ্ঞানী হিসেবে বিবেচনা করারও বড় ভূমিকা রয়েছে। এখানেও ফরাসিরা ছিলো মূল চালিকা শক্তি। ১৭৯৬ সালে নেপোলিওন ইতালির বেশির ভাগটাই দখল করে নেয়ার পর লিওনার্দোর বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক পাণ্ডুলিপি ফ্রান্সে নিয়ে যান।^{১০} এক বছর পর ইতালিয় কূটনীতিক ও পণ্ডিত জিওভান্নি বাতিস্তা ভেনতুরি ‘ফিজিক্যাল-ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ার্কস অব লিওনার্দো দা ভিন্সি’ বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন, লিওনার্দোর পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ অচিরেই সেটা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ফ্রিয়েডরিখ ফন হামবোল্ট তার পাঁচ খণ্ডে *Kosmos* (১৮৪৫-৬২) এবং ডেভিড ব্রিউন্টার তার *Life of sir Isaac Newton* (১৮৩১) গ্রন্থে লিওনার্দোকে বিজ্ঞানের কলম্বাস হিসেবে আখ্যায়িত করেন।^{১১}

বস্তুত, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসে লিওনার্দোর ভূমিকা আসলে নগন্য। গ্যালিলিও গালিলেই অথবা আইজ্যাক নিউটনের মতো তিনি কখনই বিজ্ঞানের জগতে বড় কোনো ঘটনা ঘটান নি। প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তিনি বেশকিছু পরীক্ষা চালান, বিশেষ করে হাইড্রোলিক নিয়ে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কোনো নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করেন নি কখনই। বেকন, লাইবনিৎজ অথবা হিউমের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে তাঁর দর্শন বা বিজ্ঞানের তত্ত্বের ক্ষেত্রে তার অবদান উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। তার প্রকৌশল বিষয়ক নকশাগুলো সম্পর্কে এ পর্যন্ত বলা যায় যে, ভবিষ্যতের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সেগুলো কাজে লেগেছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি তাত্ত্বিকভাবে কোনো কিছু কখনও উদ্ভাবন করেন নি। হাইড্রোলিক প্রযুক্তি আর সামরিক যন্ত্রপাতি নিয়ে তার কাজ সে সময়কার একটা প্রচলিত বিষয়ই ছিলো। আর সব প্রকৌশলীর মতো তিনিও পূর্বসূরিদের কাজের ওপর সে সব তৈরি করতেন। সেই পূর্বসূরিদের মধ্যে ছিলেন সিয়েনিজ মারিয়ানো তাকোলা, ফ্রান্সেস্কো দি গিওর্গিও মার্তিনি প্রমুখ। মার্তিনির লেখা *Treatise on Architecture* গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়েছিলেন লিওনার্দো কিন্তু সেগুলোকে ছাপিয়ে যেতে পারেন নি তিনি।^{১২} মিলানে লোদোভিকোর রাজদরবারে তিনি প্রধানত কাজ করতেন একজন প্রকৌশলী হিসেবে। কিন্তু অন্যেরা, যেমন ব্রামান্ডে ছিলেন এর দায়িত্বে আর লিওনার্দোর উদ্বর্তন এবং গুরু হিসেবে বিবেচিত হতেন তিনি। স্থাপত্যের সঙ্গে ‘ন্যূনতম পেশাদারী সম্পর্ক’ ছিলো লিওনার্দোর, তার সামান্য কোনো প্রমাণও নেই।^{১৩} ১৯৭৮

সালে বার্ট্রান্ড গিলের পর্যবেক্ষণে জানা যায়, সিজার বর্জিয়ার জন্যে কাজ করার সময় লিওনার্দো যেসব নোটবুক রাখতেন সেগুলোতে প্রধান প্রকৌশলীর কোনো কথা নেই, বরং তাতে আছে একটা রিপোর্টের খসড়া তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন একজন অতিথি পণ্ডিতের দিনলিপি।^{১৪}

লিওনার্দো তার জীবনের শেষ বছরগুলো কাটিয়েছিলেন যে ক্রস-সুসের জমিদার বাড়িতে, সেটি এখন জাদুঘর। বেসমেন্ট বরাদ্দ করা হয়েছে তার যন্ত্রপাতিগুলোর জন্যে, আইবিএম-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তার নকশা থেকে সেগুলো তৈরি করা হয়েছে। একই রকম যন্ত্রপাতি লিওনার্দোর সমকালীন অথবা পূর্বসূরিদের নকশা থেকেও তৈরি করা যেতো। কিন্তু তারা কেউ মোনালিসা আঁকেন নি।

তুস্কানি অঞ্চলে লিওনার্দোর নিজের শহর ভিক্সিতে অবস্থিত ছোট জাদুঘর সুসিও লিওনার্দিয়ানোতেও তাঁর নকশার ভিত্তিতে নির্মিত প্রায় ৫৫টি যন্ত্র ও মডেল প্রদর্শন করা হয়। এসবের মধ্যে আছে বিখ্যাত বহু-নলা বন্দুক, একটা ট্যাংক, সুইস গেটযুক্ত একটা বৃজ ক্যানাল, এমন কি একটা বাইসাইকেলের স্কেচও, লিওনার্দোর মাদ্রিদ কোডেক্স (১৯৬৬ সালে আবিষ্কৃত) থেকে পুনর্নির্মিত। ভিক্সি মিউজিয়াম প্রকৌশলী হিসেবে লিওনার্দোর সাফল্য তুলে ধরেছে জিওভান্নি ফনটানা, ফ্রান্সেস্কো দি গিওর্গি ও আরো নাম না জানা নকশাবিদদের অনুরূপ নকশার বিচারে ব্যাখ্যামূলক লিফলেটের মাধ্যমে দর্শকদের জানানো হয় যে, 'লিওনার্দো পনেরো শতকের প্রযুক্তিবিদ্যা অনুযায়ী যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধন করেছিলেন।' ভিক্সি শহরেই আছে এর প্রতিদ্বন্দ্বী আরেকটি জাদুঘর সুসিও 'আইদিয়ালে লিওনার্দো'। এই জাদুঘর লিওনার্দোর পক্ষ থেকে আরো বেশি বিস্তৃততার দাবিদার হলেও বিখ্যাত যন্ত্রপাতিগুলো প্রদর্শন এড়িয়ে যেতে পারে নি। একজন মহান বিজ্ঞানী হিসেবে লিওনার্দোর সমকালীন জনপ্রিয় ভাবমূর্তি, যিনি কি না মোনালিসা ও দ্য লাস্ট সাপার-এর মতো ছবিও এঁকেছেন, মিলে যায় উনিবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অনেকের সঙ্গেই।

যাই হোক, এ কথা স্বীকার করলে হয়তো সত্যের কাছাকাছি হবে যে, লিওনার্দো ঋনিকটা 'প্রযুক্তিগতভাবে চ্যালেঞ্জের' মুখোমুখি হয়েছিলেন। ফ্রান্সেস্কো স্ফোরজা, যিনি অধিক পরিচিত ছিলেন *il Cavallo* নামে, তার স্মৃতিতে সাত মিটার উঁচু বিশাল একটি মূর্তি গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন লিওনার্দো, তার শিক্ষক ভেরোক্কিও ভেনিসে বার্তোলোমিও কল্লোওনি নামে যে মূর্তি গড়েছিলেন তারই প্রতিদ্বন্দ্বিতাস্বরূপ, কিন্তু সেটা কখনই আর তৈরি করা

হয় নি, কেননা ফরাসি আগ্রাসন ঠেকাতে প্রতিরক্ষা যুদ্ধের জন্য কামান বানাতে মূর্তি গড়ার ব্রোঞ্জ কাজে লাগানো হয়েছিলো।^{১৫} তাছাড়া এ ব্যাপারে লোদোভিকোর নিজেরও সন্দেহ ছিলো, তিনি লরেঞ্জো ইল ম্যাগনিফিকেরার কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন, প্রয়োজনীয় দক্ষ কোনো লোক ফ্লোরেন্সে আছে কি না।^{১৬}

লিওনার্দোর *Treatise on Painting* নামক রচনায় এমন সব নিয়মের কথা বলা হয়েছে যা তিনি নিজে কখনও ব্যবহার করেন নি। গমব্রিচ উল্লেখ করেছেন, ‘শিল্পী হিসেবে তাঁর চর্চা এবং ত্রাতাতোতে তাঁর পর্যবেক্ষণ, এ দুয়ের বৈপরীত্য বিস্ময়কর।’^{১৭}

আর্নো নদীর প্রবাহ পরিবর্তন এবং ফ্লোরেন্স ও পিয়ার মধ্যে একটা খাল খননের যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন তা পরিত্যক্ত হয়েছিলো। তাঁর *Last Supper* শেষ করার প্রায় সাথে সাথেই নষ্ট হতে শুরু করেছিলো, দ্রুত শুকানোর গুণসম্পন্ন ফ্রেস্কোর বদলে তিনি টেম্পেরা মিশ্রিত তেল ব্যবহার করেছিলেন। অর্থের বিনিময়ে যেসব কাজ তিনি করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো *The Battle of Anghiari*—সেটাও তিনি শেষ করেন নি। আংশিকভাবে যেটুকু করেছিলেন সেটুকুও দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, কারণ আবারো তিনি রঙের যথাযথ মিশ্রণ ব্যবহার করেন নি। প্রকারান্তরে ভাসারি নিজে এটার উপর আর্কেন, যে কিনা লিওনার্দোর *modi stranissimi nel cercare olii per dipignere e vernice per mantenne l'opere fatte* (‘ছবি আঁকার জন্য তেল আর তা সংরক্ষণের জন্য বার্নিশ ব্যবহারের উদ্ভট পদ্ধতি’) দেখে নিজের হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন।^{১৮}

মাথার মধ্যে যেসব চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খেতো সেগুলোতে নোটবুক ভর্তি করে রেখে গেছেন লিওনার্দো। যেসব লেখা হয়েছে ছেঁড়াখোঁড়াভাবে, টুকরো টুকরো, কেননা সম্ভবত তিনি সুশৃঙ্খলভাবে নিজের চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করতে পারতেন না অথবা সেভাবে লিখতে চাইতেন না। ভাসারির সেই বিখ্যাত মন্তব্য, লিওনার্দো ‘বহু কিছু শুরু করেছিলেন কিন্তু কখনও সেগুলো শেষ করেন নি’ এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে তার সমকালীনরাও পোষণ করতো।^{১৯} অনেক শতাব্দী পর এই প্রবণতা প্রকৃত প্রতিভার চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলো। লিওনার্দোর কাজের ধীরগতিকে গণ্য করা হতো বিস্ময়বাদ হিসেবে। ৭৭×৫৩ সেন্টিমিটার আয়তন বিশিষ্ট *মোনালিসা* আঁকতে তার সময় লেগেছিলো চার বছরের মতো কিছু সময়। অথচ একই সময়ের মধ্যে সিস্টিন চ্যাপেলের সমস্ত ছাদ ছবি ঐকে ভরে দিয়েছিলেন মাইকেলএ্যাঞ্জেলো।^{২০}

অনুরাগীরা মনে করে লিওনার্দো প্রযুক্তির উন্নতি আগেই কল্পনা করেছিলেন। তথাপি, প্যারাসুটের সম্ভাব্য ব্যতিক্রমটা বাদ দিলে, হাইড্রোলিক বা উদ্যানের ক্ষেত্রে তার অন্তর্দৃষ্টি থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি হয় নি।^{২১} বাইসাইকেলের বিখ্যাত নকশাটি দেখে কেউ কেউ কল্পনা করতে পারে যে, লিওনার্দো এই অদ্ভুত দর্শন যন্ত্রের উদ্ভাবক। কিন্তু এটা বোঝার জন্য কাউকে রেনেসাঁ যুগের প্রতিভা হওয়ার দরকার নেই যে, চাকার চেয়ে বড় প্যাডেল দিয়ে কোনো কিছু চালানো সম্ভব নয়। ওই নকশায় একটা চেনও দেখা যায়, এ এমন এক উদ্ভাবন যা উনিশ শতক সমাপ্তির আগে দেখা যায় নি।^{২২}

লিওনার্দোর হেলিকপ্টারের বিখ্যাত নকশাটির মিল আছে ১৪৬০ সালের (সে সময় তিনি ছিলেন শিশু) একটি জনপ্রিয় খেলনার সঙ্গে। অন্যদিকে লিওনার্দো বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে, মানবদেহের পেশী কাঠামো পাখিদের উড্ডয়ন ক্ষমতা পুনরুৎপাদনের মতো প্রয়োজনীয় শক্তি জোগান দিতে পারে না। ঝাপটানো ডানার বিমানপোতের যে কল্পনা করেছিলেন তিনি, সেটা ছিলো একেবারে কিস্তিকিমাকার এবং ‘অর্থহীন’।^{২৩} উড্ডয়ন-যন্ত্রের আইডিয়া অবশ্য তাঁর মাথাতে আগেই এসেছিলো। কিন্তু সেটার উদ্ভাবন ভিন্ন কথা। জুল ভার্ন এমন একটা রকেটের কল্পনা করেছিলেন যেটা চাঁদে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে বিজ্ঞানের লোক হিসেবে কখনই গণ্য করা হয় নি।

একজন বড় বিজ্ঞানী হিসেবে লিওনার্দোর জনপ্রিয় ভাবমূর্তি জীবন্ত রয়েছে আজকের দিনেও। বিষয়টা খুবই অবাক করার মতো : বিশ শতকের জনসংস্কৃতির বেশির ভাগটারই উৎস উনিশ-শতকী ‘বুর্জোয়া’ সংস্কৃতির উৎসের দিক থেকে বহুলাংশে ঋণী হয়ে আছে ‘Folk’ বা ‘লোক’ সংস্কৃতির কাছে। চিত্রশিল্পী ও নকশাবিদ হিসেবে লিওনার্দোর উচ্চতা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কতিপয় পণ্ডিত এখন দাবি করেন যে, তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের বিজ্ঞানী বা একজন মহান প্রকৌশলী, তারা বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের জন্য উচ্চ প্রশংসা করেন। প্রতি বছর এতে যুক্ত হয় নতুন নতুন নিবন্ধ আর বই-পুস্তক। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয় লিওনার্দোর নির্বাচিত রচনাবালী (তার পাঁচশত তম জন্মগত বার্ষিকী উপলক্ষে), সেটা সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে এবং পূর্ণমুদ্রিত হয় ১৯৯১ সালে। ওই গ্রন্থের ভূমিকায় মারিও দে মিকেলি লেখেন, লিওনার্দো ছিলেন একজন পথ-প্রদর্শক যিনি ‘আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছিলেন, পরবর্তী শতাব্দীগুলোয় সেগুলো নির্মিত হয়েছিলো’।^{২৪} ১৯৮১ সালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে খ্যাতিমান শিল্প-ঐতিহাসিকেরা লিওনার্দোকে আধুনিক পরিবেশ আন্দোলনের অগ্রপথিক

হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, এর কারণ তিনি নাকি বন নির্মূলের প্রবণতা আগেভাগেই দেখতে পেয়েছিলেন।^{২৫} আকাদেমিয়ে দে সায়েন্সে-এ ১৯০২ সালে সহকর্মীদের মুখে লিওনার্দোর প্রশংসা শুনতে শুনতে রাজনীতিবিদ ও বিজ্ঞানী মার্সেলিন বার্থেলো ক্লান্ত হয়ে মন্তব্য করেন, লিওনার্দোর বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের মূল্য খুবই সীমিত। এর জন্য বার্থেলোকে খামখেয়ালি বলা হয়।^{২৬}

জিনিয়াস হলো এক ধরনের অদ্ভুত ক্যাটাগরি। জিনিয়াস হওয়া মানে একজন সেলিব্রেটি হওয়া। অনেকের দ্বারা উল্লেখিত হতে হয় তাকে। এই পদবাচ্যটির প্রয়োগ এমনই যে, যতো প্রয়াসই দেয়া হোক না এই সব ব্যক্তিদের বিশেষত্ব হলো অস্তুনিহিত কিছু গুণাগুণ অথবা ঈশ্বর প্রদত্ত কিছু কিংবা এ রকম আধুনিক কোনো মানদণ্ড : সঠিক জিনের অধিকারী হওয়া। উনিশ শতকে লিওনার্দো সম্পর্কিত বিবরণীতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছিলো শৈশব থেকেই (মোজার্ট, প্রমুখের মতো)। গণিত শাস্ত্রে তিনি দ্রুত তাঁর শিক্ষকদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তার বাবা লিওনার্দোর আঁকা একটা ড্রয়িং দেখিয়ে ছিলেন ভেরোক্কিওকে, সেটা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন ভেরোক্কিও।^{২৭} কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নয় বরং জন্মই হয়েছে প্রতিভাবান হিসেবে—আমরা যারা বিশেষ প্রতিভার অধিকারী নই তাদের জন্য এ কথার মধ্যে সান্ত্বনা থাকলেও থাকতে পারে।

লিওনার্দো সম্পর্কে শক্তিশালী মিথ এ পর্যন্ত পৌঁছেছে : তিনি একজন টাউট কোর্ট প্রতিভা; সব বিষয়েই জিনিয়াস—বাস্তবিকই বিশ্বজনীন। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজে কিছু উদ্ভাবন করেন নি তাতে কিছু যায় আসে না। আর কোনো কিছু উদ্ভাবন করতে পারেন নি তার কারণ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রচলনের দিক থেকে তিনি জন্মেছিলেন একটা ‘ভুল’ শতাব্দীতে। এ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি এমন যন্ত্রপাতির কথা অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন যা আমাদের যুগে তৈরি হয়েছে। আমরা তাঁকে বুঝতে পেরেছি। তারা পারে নি। তিনি আমাদেরই একজন।

বৈজ্ঞানিক ‘পূর্ব-ধারণা’ জাতীয় অনুমান আসলে ইতিহাস ও বিজ্ঞান কিভাবে এগিয়েছে তারই উনিশ-শতকী দৃষ্টিভঙ্গি : ভবিষ্যতের সমস্ত অবয়ব ধারণ ক’রে আছে অতীত, আমাদের কাছে যা এসেছে তার ভাঁজ খুলে দেখাচ্ছে বর্তমান। এটা এখনও সাধারণভাবে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি। প্রতিভাবান সদাই ‘নিজের সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকে,’ আর এ জন্যেই ভুল বোঝা হয় তাকে। আমরা যারা অনেক পরে এসেছি, তারা অবশেষে ভুল থেকে সঠিক ইতিহাসকে বের ক’রে আনতে পারি, অতীতের ভুলগুলো সংশোধন করতে পারি এবং চিহ্নিত করতে পারি সত্যিকারের জিনিয়াসকে।

লিওনার্দোকে এভাবে দেখা হতো এবং এখনও হচ্ছে। তাঁর নিজের সময় থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে। তিনি কথা বলেন সরাসরি আমাদের সঙ্গে, আমাদের অধিক অগ্রসর চেতনার জন্যে। আমরা অতীতের মহান ব্যক্তিদের তাদের সময়কার অজ্ঞ ও কুসংকারাচ্ছন্ন লোকদের চেয়ে অনেক ভালোভাবে বুঝতে পারি : বিটোফেনের রেট স্ট্রিং কোয়ার্টেট-এর ব্যাপারে যেমনটি বলা হয় 'ভবিষ্যত কালের জন্য', সেটা হলো এই রোমান্টিক মিথেরই অলঙ্করণ। সত্যি বলতে কী, প্রধান চিত্রকর খুব কমই রয়েছে—ভ্যান গগের মতো নিজের সময়ে বিখ্যাত নন—যিনি এইরকম দূভাগ্যজনক অবস্থার শিকার হয়েছিলেন। মহান প্রতিভাবান হতে হলে নিজের সময়ে সফল এবং প্রশংসিত হতে হবে : শেক্সপিয়ার, গ্যাতে, ভলতেয়ার, মোজার্ট, বিটোফেন, ভার্দি, মাইকেলএ্যাঞ্জেলো, তিতিয়ান, রাফায়েল আর অবশ্যই লিওনার্দো দা ভিন্সি, যাঁরা অনেকের দ্বারাই প্রশংসিত এবং নিজেদের সময়ে বড় বড় পৃষ্ঠপোষকদের জন্যে কাজ করেছেন। সব বিখ্যাত ব্যক্তিকেই যে তাঁদের গুণের জন্যে স্মরণ করা হবে তা নয়, কিন্তু বেঁচে থাকতে পরিচিতি পাওয়াটা এক্ষেত্রে সাহায্য করে : এভাবে কারোর কাজ বেঁচে থাকে সুযোগ পেয়ে থাকে সংরক্ষিত হবার জন্যে।

এভাবেই অপ্রতিরোধ্যভাবে লিওনার্দো উনিশ শতকে একজন পূজনীয় ব্যক্তি হবার বিষয় হয়ে ওঠেন। তাঁর ড্রইং খুব একটা সুলভ নয়, তাঁর সেরা কাজগুলো বোধগম্যও নয়, সব জায়গায়ই তাঁর নোট ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তাঁর চিত্রকর্মগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথবা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। কোনো সন্দেহ নেই, তাঁর ভক্তদেরকে যে জিনিসটি মুগ্ধ করেছে সেটা হলো কাজের প্রতি তাঁর সীমাহীন আগ্রহ, বিজ্ঞান এবং চিত্রকলা দু'ক্ষেত্রেই, বিরামহীনভাবে এক ক্ষেত্র থেকে আরেক ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ, অতৃপ্ত এক মন নিয়ে নতুন সন্ধান ক'রে যাওয়া। ঠিক এ জন্যেই উনিশ শতকে তিনি একজন সত্যিকারের প্রতিভাবান হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

রুশ রেনেসাঁর পণ্ডিত লিওনিদ এম বাতকিন ১৯৮৮ সালে দেখান যে, লিওনার্দো প্রকৃতপক্ষে ছিলে তার নিজের সময়ের। বাস্তব ও তাত্ত্বিক ফলাফল প্রদানের ক্ষেত্রে আজকের দিনের তুলনায় অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিলো সেই সময়টা।^{২৬} বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্যে কানাগলিতে হাটা একটা প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। আমরা স্মরণ করি মেরি এবং পিয়েরে কুরির কথা, কিন্তু তাদের পথ তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন যেসব বিজ্ঞানী তাদের কথা নয়। যেমন ভিলহেল্ম রঞ্জন, যিনি রেডিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন, এবং আঁতোয়াঁ অঁরি

বেকেরেল। জ্য-বাগ্টিস্ত লামার্ক এবং আলফ্রেড ওয়ালেস ঘরে ঘরে পরিচিত নাম নয়, কিন্তু ডারউইন বাইরে বেশ সুপরিচিত একটি নাম।

মহান বিজ্ঞানী ও লিওনার্দোর কাল্ট নিমাণ করেছিলো অবিজ্ঞানী, লেখক এবং হরেক রকম বুদ্ধিজীবীরা। আশ্চর্যের বিষয় হলো উনিশ-শতকী লেখক স্তম্ভাল, যিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, নির্দিধায় দাবি করেছিলেন যে, 'ফ্রান্সিস বেকনের একশ' বছর আগে লিওনার্দো যে সব উপসংহারে পৌছেছিলেন সেগুলোই বেকনকে মহান করেছে। সেগুলো অপ্রকাশিত রাখার জন্য লিওনার্দোকে দোষ দেয়া যায়।^{৯৯} তিনি প্রকৌশলী হিসেবেও লিওনার্দোর সাফল্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন :

প্রখর সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে তিনি নিশ্চিত করেছিলেন
পানির স্রোত মিলানের আশ-পাশের সব গ্রামেই পৌছে
যেতে পারবে।

ভ্রমণকারীরা এই চমৎকার ভূ-দৃশ্য দেখে তাঁর প্রতি ঋণী
হয়, যেখানকার সুবিশাল উর্বর প্রান্তরের সাথে তুষারাবৃত
পাহাড়ের অদ্ভুত আকার খাপ খেয়ে যায়, দু'চোখের
খোরাকের জন্য কয়েক মাইল দূরে এক স্বপ্নিল দিগন্ত
উদ্ভাসিত হয়।^{১০০}

বিশ শতক নাগাদ লিওনার্দো পরিণত হন আদিরূপের 'folk' বিজ্ঞানীতে, প্রচুর আইডিয়া সম্পন্ন একজন উদ্ভাবক, যিনি কিনা নির্জন গবেষণাগারে বসে প্রকল্প তৈরি করে চলেছেন। তাঁর সময়ে অবশ্য শিষ্যদের মধ্যে আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রথা ছিলো না। কিছু বাস্তবিক বিবেচনাও ছিলো। রেনেসার সময়ে আন্ত-জাতিকতাবাদ ছিলো সব রেনেসা ব্যক্তির বেলায়ই সাধারণ একটি ব্যাপার, সেটা কেবল লিওনার্দোর অনন্য যোগ্যতা ছিলো না।^{১০১}

রেনেসার সময়ে শিল্পের ধারণার জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ছিলো। পারস্পেকটিভ-এর আবিষ্কার পাশ্চাত্য চিত্রকলার একটি বিশাল অর্জন—সাদামাটাভাবে বলতে গেলে সেটা ছিলো কোনো আকারকে সঠিক অনুপাতে উপস্থিত করার একটি কৌশলমাত্র। এতে ইউক্লিডিয় জ্যামিতির ত্রিভুজের অনুপাতের নিয়মকে অন্য কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করার আগেই, যেমন স্থাপত্যকলায় ক্রেনেলেক্সি ব্যবহার করেছিলেন, চিত্রকলায় ব্যবহার করা হয়েছিলো।^{১০২} লিওনার্দো লিখেছেন : 'অভিজ্ঞতায় নিশ্চিত হওয়া গেছে, সব

জিনিসই তাদের অনুরূপতা ত্রিভূজীয় রেখার মধ্য দিয়ে চোখে পৌছে যায়, পারস্পেকটিভ হলো সেরকমই একটি যৌক্তিক প্রদর্শন।^{১০০}

লিওনার্দো খুব সহজেই বিজ্ঞান থেকে চিত্রকলা চলে যেতে পারতেন আবার ফিরে আসতে পারতেন। কেবলমাত্র যে, সংস্কৃতিতে এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে কোনো সীমারেখা নেই সেখানেই কেবল এটা করা সম্ভব। তাঁর সমসাময়িক অন্যদের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন, চিত্রকলা হলো একটি বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড যাতে গণিত এবং জ্যামিতির নিয়ম ব্যবহার করা হয়।^{১০১} অবশ্য কিছু বাস্তবিক বিবেচনাও ছিলো। রেনেসাঁর সময়ে একাধিক ক্ষেত্রে বিচরণ করার জন্য উপদেশ দেয়া হতো, কারণ লিসা জারদিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, ‘সম্মানিত চাকরীজীবীদের মধ্যে সবচাইতে বেশি চাহিদা ছিলো শিল্পীদের...আর তাঁরা ছিলেন নক্সাকার, প্রকৌশলী, স্থাপত্য প্রতিভার অধিকারী এবং সৃষ্টিশীল ও নান্দনিক গুণাবলীর।’^{১০২}

১৪৮২ সালে লিওনার্দো একটা চিঠি লিখেছিলেন লোদোভিকোকে। ওই চিঠিতে তিনি ভালো সেবা দানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সামরিক প্রকৌশলী হিসেবে নিজের দক্ষতার কথা তুলে ধরেন। এতে লোদোভিকো কোনো কোনো বিষয়ে প্রাধান্য দিচ্ছেন সেটা বোধগম্য এবং সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু ওই ওই বিষয়ে প্রাধান্য দেন নি এমন কোনো প্রমাণ নেই। চিঠিতে যে দশটি বিষয়ে নিজের পারদক্ষতার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি, সেগুলোর মধ্যে একটি বাদে আর নয়টিই যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট। ‘আমি,’ তিনি লেখেন, ‘নির্মাণ করতে পারি সেতু ও প্রাচীর ভাঙার অস্ত্র, গুলু সুড়ঙ্গ, ছাউনিযুক্ত গাড়ি যার পেছনে সৈন্যেরা আত্মগোপন করতে পারে।’ একমাত্র দশম ও শেষ যে বিষয়টিতে নিজের পারদর্শিতার কথা প্রকাশ করেছেন সেটি শান্তিকালীন কাজ, ‘আমি ডাক্তার্য তৈরি করতে পারি মার্বেল, ব্রোঞ্জ অথবা মাটি দিয়ে। আমি ছবিও আঁকতে পারি’ (my emphasis)।

জিনিয়াসের লক্ষণ হিসেবে বৈশ্বিক হওয়ার আধুনিক স্তুতিটা প্রাক শিল্পযুগের সোনালী যুগের রোমান্টিকদেরই অংশ ছিলো। লিওনার্দো স্পেশালাইজেশনের ব্যাপারটা বাতিল করেন নি; আসলে ওই ধারণাটা তখনও তৈরিই হয় নি। তিনি নিজের সময়ের নয়, বরং উনিশ শতকের প্রথা ভেঙে দিয়েছেন।

তিনি ভালো সঙ্গীও পেয়েছিলেন। ম্যাকিয়াভেলি রাজনীতি বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ *The Prince* ছাড়াও ইতিহাস ও নাটক (*La Mandragola*) রচনা করেছেন, এখনও সে নাটক অভিনীত হয়ে থাকে। আলব্রেখট দ্যুরার গণিত

শাস্ত্র ও জ্যামিতি নিয়ে অধ্যয়ন করেন এবং পরিমাপের ওপর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন ১৫২৫ সালে, তাছাড়া ১৫২৭ সালে সামরিক প্রকৌশল বিষয়ক আরেকটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। এসবের পাশাপাশি তিনি ছিলেন কাঠখোদাই ও কপার এনগ্রেভিংয়ের বড় মাপের ওস্তাদ এবং প্রধান চিত্রকর। মাইকেলএ্যাঞ্জেলো চারটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন : স্থাপত্য, চিত্রাংকন, ভাস্কর্য ও কবিতা। এসব কিছু 'শৈল্পিক' কর্মকাণ্ড হওয়া সত্ত্বেও কেবল এক মহান শিল্পীর মর্যাদাই তিনি পেয়েছেন, বিশ্বজনীন প্রতিভার মর্যাদা নয়। তাঁকে যে অসাধারণ একজন কবির মর্যাদা দেয়া হয়েছে, সেটাও সাম্প্রতিক ঘটনা। মাইকেলএ্যাঞ্জেলো চিত্রকর না হয়ে শুধু যদি কবিতাও লিখতেন, সেগুলোর গুণগত মানের জন্যেও ষোলো শতকের সর্বাধিক প্রতিভাবান কবি হিসেবে বিবেচিত হতেন তিনি। প্রায় তিনশ' কবিতা লিখেছিলেন তিনি, ১৮৬৩ সালের আগপর্যন্ত সেগুলো অপ্রকাশিতই রয়ে গেছে।^{১০০} কিন্তু কবিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিলো শিল্পী।

উনিশ ও বিশ শতকের অনুরাগীরা আবিষ্কার করেন যে, লোদোভিকো ইল মরোর জন্য পার্টির আয়োজন করতেন লিওনার্দো এবং প্রথম ফ্রাঁসোয়ার জন্য একটা যান্ত্রিক সিংহ তৈরি করেছিলেন। রেনেসাঁর এক প্রতিভার জন্ম হয়েছিলো পার্টি আয়োজন করতে। যিনি উদ্ভয়ন-যন্ত্র তৈরি করতে পারতেন তিনি বাধ্য হয়েছিলেন যান্ত্রিক খেলনা বানাতে! আসলে এসব গালগল্পের জন্য আমাদের ঋণী থাকতে হবে ভাসারির কাছে। তিনি লিওনার্দোর পরিধি বর্ণনা করতে গিয়ে এসব উল্লেখ করেছেন।^{১০১} তবে এমন ক্ষেত্রে লিওনার্দো যে অপমানবোধ করতেন তারও কোনো প্রমাণ নেই। প্রথম ফ্রাঁসোয়া তাঁর প্রকৌশলী হিসেবে লিওনার্দোকে চান নি। কেননা প্রথম ফ্রাঁসোয়ার প্রচুর সংখ্যক সুদক্ষ ইতালিয় প্রকৌশলী ছিলো যারা দেশের সীমান্ত বরাবর দুর্গ নির্মাণে এবং লে হাডরে ও তুলো রক্ষায় বিশাল মিনার নির্মাণে ব্যস্ত ছিলো। লিওনার্দো সেতু বানাবেন আর খাল খনন করবেন তা আশা করা হয় নি। তিনি রাজদরবারে ছিলেন *Savant* হিসেবে, অর্থাৎ শিক্ষা ও জ্ঞানের সাধক হিসেবে। এতে ফরাসি রাজার বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা বাড়তো।^{১০২} তিনি সেখানে ছিলেন একজন মহান ইতালিয় হিসেবে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ১৫০০ সালে ইতালির সম্পদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছিলো অগ্রসর এবং বিশ্বের সেরা অর্থনৈতিক পদ্ধতি চালু ছিলো সেখানে। ইতালিয়রা ছিলো সেরা প্রকৌশলী, সেরা চিত্রকর, ভাস্কর, স্থাপতি, সেরা ব্যাংকার এবং সেরা কারিগর।

অ্যান র্যাডক্লিফ ও অন্যান্য গথিক ঔপন্যাসিকদের সুবাদে আঠারো

শতকের শেষ নাগাদ ইতালিকে বর্ণনা করা হয় দস্যু-তস্কর আর বজ্রাত ধর্মযাজকদের দেশ হিসেবে, যেখানে চলে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র, ম্যাকিয়াভেলি ও সিজার বর্জিয়ার মতো অদ্ভুত চরিত্রের জন্মভূমি। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এসে এই ধারণা অনেকটাই পরিবর্তিত হয়। তখন ইতালিকে দেখা হতে থাকে সৌন্দর্য সুধায় অনুপ্রাণিত দেশ হিসেবে যার রয়েছে গৌরবান্বিত শৈল্পিক অতীত, যে দেশ আধুনিকতা ও ব্যক্তি স্বাভাব্যবাদের জন্মভূমি। ‘আধুনিক ইউরোপের সন্তানদের মধ্যে প্রথম জন্মেছে ইতালিয়রা,’ ১৯৬০ সালে লিখেছেন ইতিহাসবিদ জ্যাকোব বার্কহটি।^{৭৯} এটা ‘সবধরণের মতবাদের লোকের জন্মস্থান—যারা কেবলমাত্র ইতালিরই’।^{৮০}

উনিশ শতকের প্রায় বেশির ভাগটা জুড়ে উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীরা রিসোর্গিমেন্টো বা ইতালির একত্রীকরণের সংগ্রামকে বিবেচনা করেছেন প্রধান প্রগতিশীল সংঘটক হিসেবে। ধর্মীয় যাজকতন্ত্র এবং অস্বিষ্ট শৈবতন্ত্র থেকে উদ্ধার পেতে এছাড়া আর গতি ছিলো না। ইতালির জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতি এমন কি বৃটেনের রক্ষণশীলদেরও সহানুভূতি ছিলো। ফ্রান্সে ক্যাথলিক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল রিপাবলিকানিজমের ঐক্যসাধন একটা ইস্যুতে পরিণত হয়েছিলো। প্রগতিশীল ও আধুনিক চিন্তার আদর্শ হিসেবে লিওনার্দোর কান্ট ছিলো এই রাজনৈতিক ও আদর্শিক ধারারই অংশ। ‘প্রগতিশীল’ ও যাজক বিরোধী ঐতিহাসিক জুল মিশেলে তাঁর বহুখণ্ডের *History of France* (ইতালিয় রেনেসাঁ যার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ), এডগার কুইনেট তার *Revolutions in Italy* (১৮৪৮-৫২) এবং হিপ্পোলাইত তাইনে তার *Voyage en Italie* (১৮৬৫) গ্রন্থে লিওনার্দোকে বর্ণনা করেছেন আধুনিক যুগের নায়ক হিসেবে। উনিশ-শতকী বুদ্ধিজীবীরা তাদের ধারণা নিশ্চিত করতে ইতালি সফরেও যেতেন।

লিওনার্দোকে তারা এমন এক মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতেন যিনি সব রকম ধর্মীয় মতবাদ ত্যাগ করেছিলেন। যিনি শবব্যবচ্ছেদ করতে ভয় পেতেন না। রাফায়েল ও মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর মতো তিনি কখনই পোপের গোলাম ছিলেন না। তিনি মানুষকে বসিয়েছিলেন সৃষ্টির মাঝখানে।^{৮১}

মিশেলে লেখেন :

লুভরের গ্র্যান্ড গ্যালারিতে যান, আপনার বাম দিকে
আপনি খুঁজে পাবেন পুরনো পৃথিবী আর ডানে নতুন
পৃথিবীকে। একদিকে ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকোর তন্দ্রাগ্রস্ত ছবি,

এখনও মধ্যযুগের কুমারীর পায়ের নিচে রয়েছে; তাদের অসুস্থ দৃষ্টিতে মৃতপ্রায়...এই আকস্মিক রহস্যময় ঔজ্জ্বল্যের বিপরীতে রেনেসাঁর জিনিয়াস লিওনার্দো দা ভিন্সির চিত্রকর্মের মধ্য দিয়ে...তারা অ্যাড্ভেন্সিকোর মতোই মধ্যযুগের, তারপরও তাদের মধ্যে রয়েছে হাজার বছরের ব্যবধান।^{১২}

মিশেলে ও কুইনেট নিজেদের মনে করতো সমগ্রামরত ফ্রান্সের প্রগতিশীল কণ্ঠস্বর এবং রেনেসাঁর মহত্তম আত্মা লিওনার্দোর শিষ্য। এভাবেই ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে পরিণত হন লিওনার্দো। মিশেলে দানবীয় কাল হিসেবে মধ্যযুগকে বাতিল করে দিয়েছেন।^{১৩} তাঁর দাবি, মধ্যযুগের একমাত্র প্রকৃত বিজ্ঞানী ছিলো আরব আর ইহুদিরা।^{১৪}

মিশেলের জাতীয়তাবাদ এবং তার দেশের অহংকার এক ধরনের অদ্ভুত চরিত্র দান করেছিলো যাকে উদ্বেগ করা হয়েছিলো বৈশ্বিক হিসেবে। তরুণ জর্জ এলিয়ট এই ধরনের 'আমুর দ্য পার্টি'র হাস্যকর বাড়াবাড়িকে তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ফরাসিরা এক ধরনের অবজ্ঞাকীর ধর্মে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো আর ফরাসি জনগন 'এক ধরনের দ্বিতীয় বাহাই জাতি, যারা একাই প্রচারণার একটি মিশনে নেমেছিলো, কলম আর ভলোয়ারের সাহায্যে, সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে সত্য জাতিকে নতুন উদ্বীপনা দেবে।'^{১৫} এই আদর্শের জন্যেই ফরাসিরা লিওনার্দো দা ভিন্সিকে লোনার্দ দা ভিন্সিতে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়—একজন সম্মানিত ফরাসি নাগরিক—আর তাঁর জোকোন্ডে হলো ফরাসি সংস্কৃতিরই একটি সৃষ্টি।

লিওনার্দো হয়ে উঠলেন একজন ফ্রান্সেই ম্যাকুরে, এমন একটি দেশ তাঁকে প্রতিপালন করেছে যারা—এটা দাবি করা হতো—তাঁর নিজের দেশের চেয়েও তাঁকে বেশি ভালো বুঝতে পারতো। বেস্টসেলিং ঔপন্যাসিক এবং থিয়েটার-ফ্রান্সেই আর থিয়েটার ফ্রান্সেই'র পরিচালক আরসিন হুসেই ১৮৬৯ সালে ঘোষণা দিয়েছিলেন, ফ্রান্সই হলো একমাত্র দেশ যারা লিওনার্দোর ঐতিহ্য নির্মাণ করেছিলো : ইতালিতে রেনেসাঁর সমাপ্তির পর, জার্মানিতে দুরারের, স্পেনে ভেলাকুয়েজ আর মুরিলোর, হল্যান্ডে রুবেন্স আর ভ্যান ডাইকের পর থেকেই শিল্পের কিছুই আর অবশিষ্ট ছিলো না। আর ইংরেজদের বেলায় সেটা হুসারের পর থেকেই ধরা হয়, তারা বোড়েনৌড়ের দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই আঁকতে পারতো না।^{১৬} ফ্রান্সোরা আনাতোল ফ্রান্সের ১৮৯১ সালে তাঁর

ভয়েস আউডোর দু' সাপোর্টার করে জা মিউজি দু' লুডর বইতে লিখেছিলেন—‘সোমার্স দ্য ডিভিই আমেরের জাতীয় জালুখটাকে অন্যতম কৃতা আর অকুসমীর মৌলিক দান করেছেন।’^{১০} এই মন্তব্যের ১৯০০ সালে ইংরেজিভাষী ব্যসেকারের প্যারিসের গাইডেও কুটে উঠেছিলো : ‘লিওনার্দো দ্য ডিভি, যাকে ফরাসিরা মিজেসের একজন শিল্পী দাবি করতেই বেশি আগ্রহী।’^{১১}

পূজনীয় হতে হলে বখসীতি পূজা করার জন্য একটা চরিত্র বা মেহাকশের অথবা তীর্থযাত্রার জন্য নির্দিষ্ট একটা স্থানের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু লিওনার্দোর জন্মস্থানটি অশেখাকৃত অনেক দূরে ছিলো, আর তাঁর মেহাকশেরও সন্ধান পাওয়া যায় নি : ১৮৬৩ সালে আরসিন হুসেই সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন। আরবোরাতে অবস্থিত সেই ফ্রেজের্টিন চার্চের আশপাশ এলাকার খোঁড়াখুঁড়ি করেছিলেন তিনি, যেটা ১৮০৮ সালে খনন হয়ে গিয়েছিলো। সেখানে একমিক কয়লা পাওয়া গিয়েছিলো। তাইয়ের মধ্যে থেকে খান খেয়ে যায় এ কয়লা একটিকেই তিনি এই মহান ব্যক্তির বসে দাবি করেছিলেন। কিন্তু এই অবিদ্যারটি এই বসে বাতিল করা হয়েছিলো যে, তিনি তুল জারপার খুঁজেছেন।^{১২} কেনেদার এই প্রতিজ্ঞাবান ব্যক্তির মেহাকশের, ত্রিশটিও বেশি অটোপসি করার পর আজো পর্বন্ত অশুনখাটিতই রয়ে গেছে, যদিও পর্বটক আর ত্রহন শিলাসূত্র এখনও আরবোরাতে তাঁর কবর রয়েছে বসে হয়ে নেন।

ক্যাথলিকরা এটাকে বিবেচনার রাখে। যদিও কেউ কেউ কেনেদা এবং এর সব কাজগুলোকে আক্রমণ করে থাকে, কিন্তু অন্যরা—যেমন আলেক্সিস রিও তাঁর ১৮৫৫ সালের সোমার্স দ্য ডিভি এন্ড সন ইকোলোজে লিওনার্দোকে একজন ভালো ক্যাথলিক হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। চার্লস ফ্রেমন্ট অসারির ইমিত থেকে এই ধারণা করেন যে, লিওনার্দো একজন অর্থারিক ছিলেন।^{১৩} লিওনার্দো কি তাঁর উইলে বিশদভাবে ধর্মীয় শেককৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য নির্দেশনা দিতে যান নি? এই কাজটি (নির্ভরযোগ্য অথবা সত্যিকারের কম্পোকখন) দৃঢ় চিন্তা করে যাঁরা, যেমন প্যারিসেল সেইলেন, তাঁদেরকে বিব্রত করে।^{১৪} তদায়নের অবশ্য কোনো সন্দেহ ছিলো না : ‘লিওনার্দো তাঁর শতাব্দীর ধর্মকে যেনে নেয়ার মতো বুদ্ধিমান ছিলেন।’^{১৫} এই দৃষ্টিভঙ্গীটাই বর্তমানে বিরাজ করছে। বুদ্ধিমান মানুষদেরকে হতে হয় অটল এবং দৃঢ়। আদর্শ বিজ্ঞানী হলেন প্যালিসিওর মতো চরিত্র, তাঁর কর্তৃক সাজা পাওয়া, নিজের কাজগুলোকে বন্ধ করার জন্য নিজের বক্তব্য

প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছিলেন। আইজ্যাক নিউটনের ধর্মানুরাগের কথা ভুলে যাওয়া হয়েছিলো অথবা সেটাকে কালবিরুদ্ধ এবং নীতিভ্রষ্ট হিসেবে দেখা হয়। মিশেলের মেয়ের জামাই আলফ্রেড দুমেনিল লিওনার্দোকে গ্যালিলিওর মতো একজন মানুষের উত্তরসূরি হিসেবে প্রশংসা করেছেন যাঁর কাজ স্বীকৃত হতে তিনশ' বছরেরও বেশি সময় লেগেছিলো।^{৭০}

১৮৫০ এবং ১৮৬০ সালে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময়কালে, লিওনার্দোর উদারপন্থী ভক্তরা ছিলো বিরোধীপক্ষে। মিশেলেকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তৃতীয় সাম্রাজ্য কর্তৃক গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে অধিষ্ঠিত হবার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন (তিনি ১৮৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন)। পরবর্তীকালে তাঁর বই বিদ্যালয়ে পড়ানোটা জরুরি হয়ে পড়ে এবং একদল শিক্ষক তাঁর ব্যাখ্যাসমূহকে নতুন জেনারেশনের মাঝে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যাজকতন্ত্রবিরোধী মনোভাবের উদ্ভব ঘটেছিলো, মিশেলের ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়বস্তু গভীর আগ্রহের সাথে গৃহীত হয়েছিলো। ১৯০৮ সালের দিকে রেনে বোনায়েন লিওনার্দোকে প্রশংসা করেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন একজন 'স্বাধীন সত্তা' যিনি ক্যাথলিকবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন (অথবা বোনায়েন এমনটি ধারণা পোষণ করতেন)। তাঁকে উনিশ শতকের মহান বিজ্ঞানীদের পূর্বসূরী হিসেবে প্রশংসা করা হয়েছিলো, ক্রুদ বার্নার্ডি থেকে লুই পাস্তুর, জঁ বাপতিস্ত লামার্ক থেকে চার্লস ডারউইন, এর আগে মিশেলে এরকম ধারণা করেছিলেন।^{৭১}

মিশেলের একশ' বছর পর মারিও দে মিকেলির মতো মার্ক্সবাদীরা সহ যাজকতন্ত্রবিরোধী লেখকেরা সত্যসন্ধানী হিসেবে লিওনার্দোর প্রশংসা করতে থাকেন।^{৭২} আধুনিক চিন্তাভাবনার একজন অগ্রপথিক হিসেবে বহুদিন ধরে লিওনার্দোকে গণ্য ক'রে আসছে কমিউনিস্টরা। ১৯৫২ সালে, লিওনার্দোর পঞ্চম জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ফরাসি কমিউনিস্ট পত্রিকা *আভঁ গার্দে* (Avant-garde) লেখে :

বিশ্বের মানুষ ইতালির মহান সন্তানকে প্রসিদ্ধ করেছে, প্রতিক্রিয়া আর অজ্ঞতার বিরুদ্ধে একজন বস্তুবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে খুবই উচু অবস্থান রয়েছে তাঁর। সোভিয়েত রাশিয়ার বিশাল একটি নদীর গতিপথ বদলে সাইবেরিয়াকে সুন্দর আর উর্বর ভূমি হিসেবে বদলে দেয়াটা আসলে লিওনার্দোর

কাজেরই ধারাবাহিকতা। এটার লক্ষ্য ছিলো মানুষের উন্নয়ন করা। তিনি কেন ফ্রান্সে গিয়েছিলেন? কারণ, তখন সেটা ছিলো অপেক্ষাকৃত স্বাধীন একটি রাষ্ট্র, অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করা একটি দেশ।^{৭৩}

পরবর্তীকালে পুঁজিবাদীরাও প্রশংসা ছুড়ে দেয় লিওনার্দোর। তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পাণ্ডুলিপির জন্য নিলামে বিপুল পরিমাণ অর্থ চালতে প্রস্তুত ছিলো তারা। সেগুলোর একটি তথাকথিত লিসেস্টার কোডেক্স (১৭১৫ সালে কিনেছিলেন নর্ড লিসেস্টার) বিক্রি করা হয়েছিলো আর্মান্ড হ্যামার ফাউন্ডেশনের কাছে, তারা দ্রুত সেটার নতুন নামকরণ করে হ্যামার কোডেক্স নামে (ড্যান ব্রাউনের 'দ্য দ্য ভিক্স কোড' উপন্যাসে এর উল্লেখ রয়েছে, অনুবাদক)। ১৯৯৪ সালে সেটা বিল গেটসের কাছে বিক্রি করা হয় ৩ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলারে, বিল কিন্তু সেটার নতুন নামকরণ করেন নি গেটস কোডেক্স বা মাইক্রোসফট কোডেক্স নামে।

উনিশ শতকে, ব্যক্তিকে তার নিজের ভাগ্যের স্রষ্টা হিসেবে বিখ্যাত হতে হতো। ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরেই মহান ব্যক্তিদের ইতিহাস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে, কিন্তু বীরত্বের ধারণা নতুন একটি মাত্রা যোগ করে, কার্নলাইন তাঁর নিজের *On heroes, Heroes—Worship and the Heroic in history* (1841) বইতে গুণকীর্তন করেছেন। আধুনিক বীরেরা কোনো সৈনিক নয়, তারা হলো শিল্প-সংস্কৃতির ব্যক্তিত্ব, আধুনিক চিন্তাধারার নির্ভীক ব্যাখ্যাকার।^{৭৪} লিওনার্দো এই রীতির একমাত্র সুবিধাভোগী ছিলেন না। নতুন পাঠকেরা জীবনী পড়ে বিমোহিত হয়ে উঠেছিলো।

অবশ্য উত্তরসূরিও ছিলো : পুতার্কেসের জীবন ভাসারির কাছে ছিলো অনুসরণীয় বা মডেল, শেক্সপিয়ারের কাছে যেমন ছিলো রোমান নাটক। বসওয়ার্ডের জনপ্রিয় *লাইফ অব জনসন* নতুন ধারার সূচনা করেছিলো : এক মহান ব্যক্তি (ই,জি গ্যাতে) আর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভক্তের (জোহান পিটার একারম্যান) মধ্যকার সংলাপের বিবরণ—আধুনিক ইন্টারভিউ তথা সাক্ষাৎকারের অগ্রপথিক। আত্মজীবনীও খুব বেশি ফ্যাশনেবল হয়ে উঠেছিলো। প্রথম দিকে সেগুলো ছিলো কারোর একান্তই ব্যক্তিগত অনুভব বিষয়ক—জ্যাক ক্রুশোর *কনফেশন*,^{৭৫} তাঁর পূর্বগামী সেন্ট অগুস্ত সহ—কিন্তু তাঁরা খুব দ্রুতই অপেক্ষাকৃত কম অনুশোচিত হয়ে উঠেছিলেন :

গোতের *Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit* (১৮০৯-১৪, ১৮৩০), থমাস দ্য কুইঙ্গি'র *Confessions of an English Opium-Eater* (১৮২২), সিলভিও পেল্লিকো'র *Le mie prigioni* (১৮৩২), স্তুদালের *Vie de Henry Brulard* (১৮৩৬), *History de ma vie* (১৮৫৪), জন স্টুয়ার্ট মিলের *Autobiography* (১৮৭৩) এবং আরো অনেকের।

১৮৫০'র মাঝামাঝিতে আত্মজীবনী'র ধারা বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিলো, বিশেষ ক'রে ফ্রান্স আর বৃটেনে। ভাসারির বিশাল আকৃতির ফরাসি প্রকাশনা *Lives* ১৮৩৯ সালে শুরু হয়েছিলো, ইংরেজি সংস্করণ বেড়িয়েছিলো ১৮৫০ সালে। 'বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী'র বাজার বিস্তৃত হচ্ছিলো (ক্ষেত্র বিশেষে বিখ্যাত নারীরও)। প্রকাশকেরা 'ইংরেজ জ্ঞানীব্যক্তিবর্গ,' 'আমেরিকান রাষ্ট্রনায়ক,' 'লে গ্রাঁ এক্টিভোয়াঁ ফ্রান্সেই'র মতো সিরিজ বের করতে শুরু করলো।^{৭৩}

এই বিশাল দৃষ্টিকোণ থেকেই লিওনার্দো এবং অন্যান্য রেনেসাঁ শিল্পীর পূজনীয় হিসেবে বেড়ে ওঠাকে দেখতে হবে। রেনেসাঁর সময়কাল থেকেই সত্যিকারের শিল্পীরা সমাদৃত হয়ে আসছিলেন। শিল্পের কাজগুলো প্রতিভাবানদের অনন্য আর অতুলনীয় কাজ হয়ে ওঠেছিলো। লিওনার্দো নিজেও এই নতুন অবস্থার সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন, তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, চিত্রকর্ম ভাস্কর্যের চেয়ে উৎকৃষ্টমানের (এই কাজটি তিনি নিজে কখনও করেন নি)। তিনি দাবি করেন চিত্রকর্ম বিজ্ঞানের মতোই বুদ্ধিবৃত্তিক একটি কাজ, কারণ এর লক্ষ্য হলো প্রকৃতির ত্রিমাত্রিক জগৎকে ভিন্ন আর সমতলে তুলে আনা। ভাস্কর্য হলো ভৌত ব্যাপার, কারিগরের কাজ, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টমানের :

এর প্রমাণ হলো ভাস্কর যখন তার কাজ করে তখন নিজের হাত দুটোকে হাতুড়ির মতো করেই ব্যবহার ক'রে থাকে...এটা একেবারেই যান্ত্রিক একটি কাজ, সাধারণত ঘাম ঝরিয়ে ধুলোবালিকে কাদায় পরিণত করার একটি প্রক্রিয়া। তার মুখে পাউডার আর প্রাস্টার লেগে থাকে যাতে ক'রে তাকে রুটিওয়ালার মতো দেখতে লাগে...

অন্যদিকে, একজন চিত্রকর হলেন সত্যিকারের

একজন ভদ্রলোক, সে তার কাজের সামনে আরামে বসে থাকে, পরিপাটি পোশাক পড়ে...তার বাড়ি খুবই পরিষ্কার থাকে আর সেখানে চমৎকার সব ছবি দিয়ে থাকে সাজানো। প্রায়শই সে সময় কাটায় গান শুনে অথবা বিভিন্ন ধরনের লেখকের সাহচর্যে।^{১০}

শিল্প-ইতিহাস চর্চা উনিশ শতকে খুব একটা ছিলো না, যাতে শিল্পের মধ্যকার বিষয়-বস্তু বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা হয়, যা শিল্পী এবং তার কাজ অথবা 'জীবন এবং কর্ম' নিয়ে আলোচনা করে। এটা কোনো পুরা নিদর্শন সংক্রান্ত কাজ নয় যার স্রষ্টাকে চিহ্নিত করা যায় না। শিল্প-ইতিহাস যদি পুরা নিদর্শনের কাজই হতো তবে সেটা কেবল কাজটির মধ্যেই ব্যপ্ত থাকতো না। এটা যদি মধ্যযুগের শিল্পের উপর ভিত্তি করে হতো, তবে সেটা সমন্বিত কর্মকাণ্ডের উপর এবং নির্দিষ্ট দ্রব্যের উপরই আলোকপাত করতো। চর্চার ক্ষেত্রে রেনেসাঁকে মূল সারবস্তা হিসেবে বেছে নেয়া, অথবা বলা যায়, নিদেনপক্ষে গুরুত্ব জন্য এটাকে বেছে নেয়ার কারণে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণার উল্লেখ ঘটেছে।

এর সাথে সমান্তরালভাবে আলোচিত হয় শিল্প-কর্মের কাজের অনন্যতার ধারণার প্রসার, আর একই কারণে শিল্পীরাত্তর। নির্দিষ্ট শিল্পীর শিল্প-কর্মের গুণাগুণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক সময়ের এবং পাশ্চাত্যের একটি ধারা।^{১১} শিল্পায়ন পরিচিতিজ্ঞাপক উৎপাদিত পণ্য বিশাল মাত্রায় পরিচিত জায়গায় চলে যেতো, এভাবে মূল শিল্পকর্মটি আরো বেশি মূল্যবান হয়ে পড়তো।^{১২} এরপর আছে শিল্পকর্মের বাণিজ্যিক অনন্যতা। যে কোনো অনন্য শিল্পকর্মের বাজার থাকে একচেটিয়া। মোনালিসা পৃথিবীতে আছে একটাই। এর দ্বিতীয়টি তৈরি হবে না কখনও। যেখানে একই পণ্যের অসংখ্য উৎপাদন সম্ভব এবং যেখানে উৎপাদন খরচও কম, সেখানে 'এক ও একমাত্র' হওয়াটা বাজারমূল্যের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘটনাই বটে। এরজন্যে অবশ্য উৎপাদককে হতে হয় ব্যতিক্রমি; বেশি ভালো হয় সে যদি হয় শিল্পজগতের কোনো স্বীকৃত প্রতিভা। অস্বীকৃত শিল্পী, কিংবা সৌখিন, এমন কেউ আগে যার পরিচিতি ছিলো না, এমন কারো আঁকা ছবির মূল্য হয় অতি নগন্য অথবা একেবারেই শূন্য। অতীতের গুস্তাদ শিল্পীরা খ্যাতির সাহায্যে তাদের সমকালীন প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর একটা সুবিধা আদায় করে নিতে পারতেন। এই ধরনের খ্যাতি খুব ভালোভাবেই সমর্থিত হতো যারা এসব

ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ হিসেবে উল্লেখিত হতো। একদল বিশেষজ্ঞ, জাদুঘরের কিউরেটর, শিল্প ইতিহাসবেত্তা, দক্ষ ব্যক্তির অন্যদের কর্তৃক ছাড়পত্র পেতো, মেনে নিতো শিল্পকর্মের অনন্যতা, এককত্ব এবং গ্রহযোগ্যতা। কোনো প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর ছবি হোক অথবা অন্য কারো যে ছবিটা আঁকতে সাহায্য করেছিলো, কিংবা নবীন কোনো শিল্পীর, তারা ছাড়পত্র দিতো। যে নাম তালিকাটা তারা দিতো সেটা সবসময়ই আর্থিক এবং গুণগতমানের উপযোগীতা থাকতো : ‘প্রথম দিককার’ অথবা ‘প্রত্যয়গত’ কাজ, একজন ‘নগন্য’ শিল্পী, ‘একটি ধারার’, ‘অমুকের ছাত্র’, ইত্যাদি বলা মানে ‘খুব একটা গুণগত মানের নয়,’ ‘তেমন ভালো নয়’।

এটা অবশ্য প্রায়োগিক ক্ষেত্রের কথা। জাদুঘরের কোনো মাস্টারপিস কেবল মাত্র প্রতিষ্ঠিত মাস্টার কর্তৃকই আঁকা হতে হবে : একজন প্রতিষ্ঠিত মাস্টার হলেন এমন একজন যার শিল্পকর্ম প্রধান প্রধান জাদুঘরে পাওয়া যায়। রেনেসাঁর পরে, যখন শিল্পকর্ম নিয়মিতভাবেই নির্দিষ্ট শিল্পীর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে উঠতে থাকে, তখন থেকেই শৈল্পিক গুণাগুণ ব্যাপকভাবে শিল্পীর পরিচয়ের উপরই নির্ভর করতে শুরু করে।

কেউ এটাতে বহুমুখী আপত্তি জানাতে পারে। আমরা রোসেট্টা স্টোন, অথবা এলজিন মার্বেল, কিংবা লুভরের ভেনাস দ্য মিলো আর দ্য উইঙ্গ ভিক্টোরি অব সামোথ্যাস-এর স্রষ্টার কথা জানি না। তা সত্ত্বেও সেগুলো মোনালিসা’র মতোই ‘অমূল্য’।

যা ঘটে তা হলো, যেখানে প্রাচীন শিল্পকর্মের স্রষ্টাকে চিহ্নিত করা যায় না, সেখানে শৈল্পিক গুণাগুণ অন্য কোনো পরিমাপকের উপরে নির্ভর করে, যেমন বয়স, মালিকানা এবং অবস্থান। তা না হলে শিল্পীর খ্যাতির উপরেই তাঁর শিল্পকর্মের শৈল্পিক গুণাগুণ নির্ভর করে—আধুনিক শৈল্পিক ধারণা এরকমই। অবশ্য ব্যতিক্রমও রয়েছে : মুনচের দ্য ক্রিম হলো আধুনিক শিল্পকলায় এমন একটি বিখ্যাত শিল্পকর্ম যা তার স্রষ্টার চেয়েও বেশি পরিচিত। কিন্তু মোনালিসা তার বিশেষত্ব অবস্থান অর্জন করেছে এ কারণে যে, এর স্রষ্টা লিওনার্দো, অন্য কেউ নন।

শৈল্পিক গুণাগুণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্রষ্টার মর্যাদার বিষয়টি প্রমাণিত হয় যখন আমরা মালিকানা এবং জাদুঘরের প্রতিক্রিয়ার কথাটা ভাবি, সেক্ষেত্রে রেমব্রান্টের রিসার্চ প্রজেক্টের কথা বলা যায় (যা ১৯৬৮ সালে শুরু হয়েছিলো)। তারা খুঁজে বের করেছিলো, রেমব্রান্টের অনেক শিল্পকর্মই আসলে তাঁর আঁকা নয়, তাঁর ছাত্রদের আঁকা। এ ধরনের আবিষ্কার সেইসব ছবির শৈল্পিক

গুণাগুণের উপর কোনো প্রভাব ফেলার কথা নয়, কিন্তু দেখা গেলো শত শত ছবি এতে ক'রে নিম্ন মানের হয়ে গেলো, বা বলা যায় করা হলো। সাম্প্রতিক সময়ে ডালউইচ আর্ট গ্যালারি রেমব্রান্টের জ্যাকব'স ড্রুম প্রদর্শন করেছে, তার পরে সেটা অসাধারণ মস্টারপিস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ছবিটা এখনও সেখানে রয়েছে কিন্তু সেটা এখন অর্ডা গেলদারের ছবি হিসেবে, আর ফলস্বরূপ খুব কমই গুরুত্ব পাচ্ছে সেটা। রেমব্রান্টের সাসকিয়া এ্যাজ মিনার্তা ১৯৩১ সালে মিউনিখে ৬৭০০ পাউন্ডে বিক্রি হয়েছিলো, আর লন্ডনে ১৯৬৫'তে ঐ একই ছবি ১২৫৩০০ পাউন্ডে ছুঁয়েছিলো। এর পরই ডাচ বিশেষজ্ঞরা এর স্রষ্টার ব্যাপারে সন্দেহ করতে শুরু করে, আর ১৯৭৫ সালে এটার মূল্য নেমে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ২৫০০ পাউন্ডে।^{১০} ছবিটা কিন্তু একই আছে, শুধু বদলে গেছে এর সিগনেচার।^{১১} আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শিল্প হবে এর স্রষ্টার প্রকাশভঙ্গী।^{১২}

শিল্পীর পরিচয় শিল্পকর্মেও শৈল্পিক গুণাগুণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক'রে থাকে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ও হিসেবে থাকে : খুব বিখ্যাত লোকের অধীনে থাকলে, যেমন রাজা, বাদশাহ, অথবা বিখ্যাত কেউ, শিল্পকর্মের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। খ্যাতি খ্যাতিকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে।

উনিশ শতকে লিওনার্দোর প্রাথমিক 'মার্কেটিং' বিষয়টি ব্যাপকভাবে ছিলো ফরাসি বিষয়ক। এর অবশ্য বাস্তব কারণ ছিলো। ইতালির তুলনায় ফ্রান্সেই অধিক পরিচিত ছিলেন লিওনার্দো। তিনি ফ্রান্সে বসবাস করেছিলেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। লুভরে লিওনার্দোর ছবির সংগ্রহ ছিলো সেই সময় বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সহজগম্য। ১৯৭৯ সালের শেষভাগ পর্যন্তও দাবি করা হতো যে, লিওনার্দোর 'বার্তা ফ্রান্সের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিল্প ঐতিহ্যের অংশ... কারণ এবং প্রধান উপাদান মহান ফরাসি প্রতিভার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ।'^{১৩}

লিওনার্দোর কান্ট প্রতিষ্ঠিত হতেই ফ্রান্সে তাঁর শেষ বছরগুলোর ঐতিহাসিক বিবরণে ছিলো—'তাঁর সত্যিকারের দেশ', সেখানেই তাঁর প্রতিভা স্বীকৃতি অর্জন করেছিলো। প্রথম ফ্রান্সোয়ার দরবারে লিওনার্দোর গুরুত্ব সম্পর্কে মনোগ্রাফী বিবরণ দিয়েছেন মিশেলে। তিনি লিখেছেন, যদিও লিওনার্দোর বয়স ছিলো আশি (যখন ফ্রান্সোয়ার রাজ দরবারে আসেন লিওনার্দো তখন প্রকৃতপক্ষে তার বয়স ছিলো চৌষট্টি), তবু ফ্যাশনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন তিনি, তাঁর চুল ও দাড়ির স্টাইল ও পোশাক এবং এমন কি তার ইতালিয় কখনভঙ্গি পর্যন্ত অনুকরণ করতেন রাজ-সভাসদরা।^{১৪}

উনিশ শতকে চিত্রকলায় প্রায়ই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে লিওনার্দোর মৃত্যু । ভাসারি এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেছেন । শিল্পী অসুস্থ; উদ্বিগ্ন রাজা গেছেন তাঁর শয্যাপাশে; লিওনার্দো উঠে বসেছেন, স্বীকার করছেন অতীতের ভুলত্রুটি; রাজা হাতের ওপর তার মাথা নিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন; এর চেয়ে বড় সম্মান আর কিছু আশা করতে পারতেন না, যেনো এই কথা স্বীকার করতেই প্রথম ফ্রাঁসোয়ার হাতে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন লিওনার্দো । এ বিবরণী অবশ্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে অনেক বার । এতে মনে হয় যেনো রাজা সেই দিন অ্যামবোয়ায় থাকতে পারতেন না । যাহোক, গল্পটা অতিশয় আবেদনময় আর ১৯৯১ সাল পর্যন্তও তা পুণরাবৃত্তি হয়েছে ।^{৯৮}

শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা এ ধরনের অ্যানেকডট পছন্দ করতেন, পছন্দ করতো রাজা ও রাজপুত্ররাও । ক্ষমতাবান ব্যক্তির শিল্প এবং বুদ্ধিবৃত্তির সামনে নিজেদেরকে অবনমিত ক'রে ফেলতেন । ভাসারির সময়ে এ ধরনের গল্পের বেশ চল ছিলো, তখন থেকেই এটা চলে আসছিলো : যেমন, অসুস্থ তিতিয়ানের হাত থেকে পড়ে যাওয়া একটা বুরুশ তোলার জন্য পঞ্চম চার্লস মাথা নুইয়ে ঝুঁকে পড়ছেন ইত্যাদি নিঃসন্দেহে মাইকেলএ্যাঞ্জোলোকে বিবৃত করেছিলো ।^{৯৯}

ঐতিহাসিক নির্ভর শিল্পকর্মের ফ্যাশন বা রীতি এধরনের মিথ তৈরিতে সাহায্য করেছে । রাজার হাতে মাথা রেখে মারা যাচ্ছেন লিওনার্দো, এ বিষয়ে জানা মতে প্রথম যাঁর ছবি পাওয়া যায় তিনি অ্যাঞ্জেলিকা কফম্যান (১৭৪১-১৮০৭), সুইস এই শিল্পী বসবাস করতেন লন্ডন, রোম এবং ভেনিসে । যিনি ইতালিয় শিল্পকর্মকে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার জন্য নিরলসভাবে কাজ ক'রে গেছেন । সেই সময়ে বৃটিশরাই পর্যটক হিসেবে খ্যাতিমান ছিলো, তারাই ছিলো ইতালিয় শিল্পকলার প্রধান সংগ্রাহক । অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে তারাই কানাট্টো এবং অন্য চিত্রকরদের ভাগ্য নির্মাণ করেছিলো (এবং তাদের বৃটিশ অনুকরণকারীরা) যারা ভেনিস, রোম এবং অন্যসব পুরাকীর্তিগুলোকে তুলে ধরেছিলো ।

কফম্যান ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় । স্তুঁদাল তাঁকে উল্লেখ করেন *lacelebre peintre* হিসেবে ।^{১০০} গোয়ায়েতে যখন রোমে ছিলেন সে সময় তার নিয়মিত সঙ্গী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন অ্যাঞ্জেলিকা, রেনেসাঁর মহান কাজগুলোর সঙ্গে গোয়ায়েতেকে পরিচয় করিয়ে দেন তিনি । গোয়ায়েতে তাঁকে বর্ণনা করেছেন প্রতিভাময়ী ও আর্থিক দিক থেকে সফল শিল্পী হিসেবে । কেননা প্রচুর কাজ পেতেন তিনি, স্বামী তাঁকে এ ব্যাপারে উৎসাহ

জোগাতেন।^{৭১} রয়্যাল অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন অ্যাঞ্জেলিকা। পাঁচশ'রও বেশি ছবি এঁকেছেন এই শিল্পী। তাঁর *Leonardo's Death in the Arms of Francois I* ছবিটি ১৭৭৮ সালে রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শিত হয়েছিলো—ছবিটি এখন হারিয়ে গেছে, ধারণা করা হয় ছবিটা আঁকা হয়েছিলো ভেনিসে।^{৭২}

১৭৮১ সালে, অ্যাঞ্জেলিকা কাউফমানের ছবিটি প্রদর্শনের তিন বছর পর, ফরাসি শিল্পী ফ্রাঁসোয়া-গুইলেমে মেনাগিওত লিওনার্দোর মৃত্যু নিয়ে আঁকা তার ছবির প্রদর্শনী করেন সালোয়াঁতে (সেটা এখন অ্যামবোয়ায় *Musce de l'Hofel de Ville*-এর রয়েছে)।^{৭৩} প্রায় একই সময়ে (১৭৮৩-৮৫) ফরাসি বংশোদ্ভূত একজন ইতালিয় গুইসেপ্পে কাদেস একই বিষয়ে একগুচ্ছ প্যাস্টেল ড্রইং অঙ্কন করেন (সেগুলোর এখন সংরক্ষিত আছে অক্সফোর্ডের অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ামে) আনুমানিক ১৮১৫ সালে রিচার্ড কজওয়ে রাজা ফ্রাঁসোয়ার সঙ্গে মৃত্যুপথযাত্রী লিওনার্দোর একটা জলরঙ আঁকেন। ইতালিতেও লিওনার্দোর মৃত্যুশয্যার ছবি আঁকেন ১৮১১ সালে সান্তি মোলাদাইনি (জল রঙের ছবিটা এখন সংরক্ষিত আছে মিলানের ব্রেরায়) এবং ১৮২৮ সালে রেজার মুসিনি। পরবর্তী সময়ে কিছু লিথোগ্রাফও করা হয়, যেমন গিগোর *Derniers moments de Leonard de Vinci* (আনুমানিক ১৮৩৫), এখানে রাজা অনুপস্থিত। সবচেয়ে সুপরিচিত ছবিটা আঁকেন ইংল্যান্ডে ১৮১৮ সালে (২৪ নম্বর ছবিটি দেখুন), এবং পরে একটি এনগ্রেভ করেন রুদ-মারি দিও।

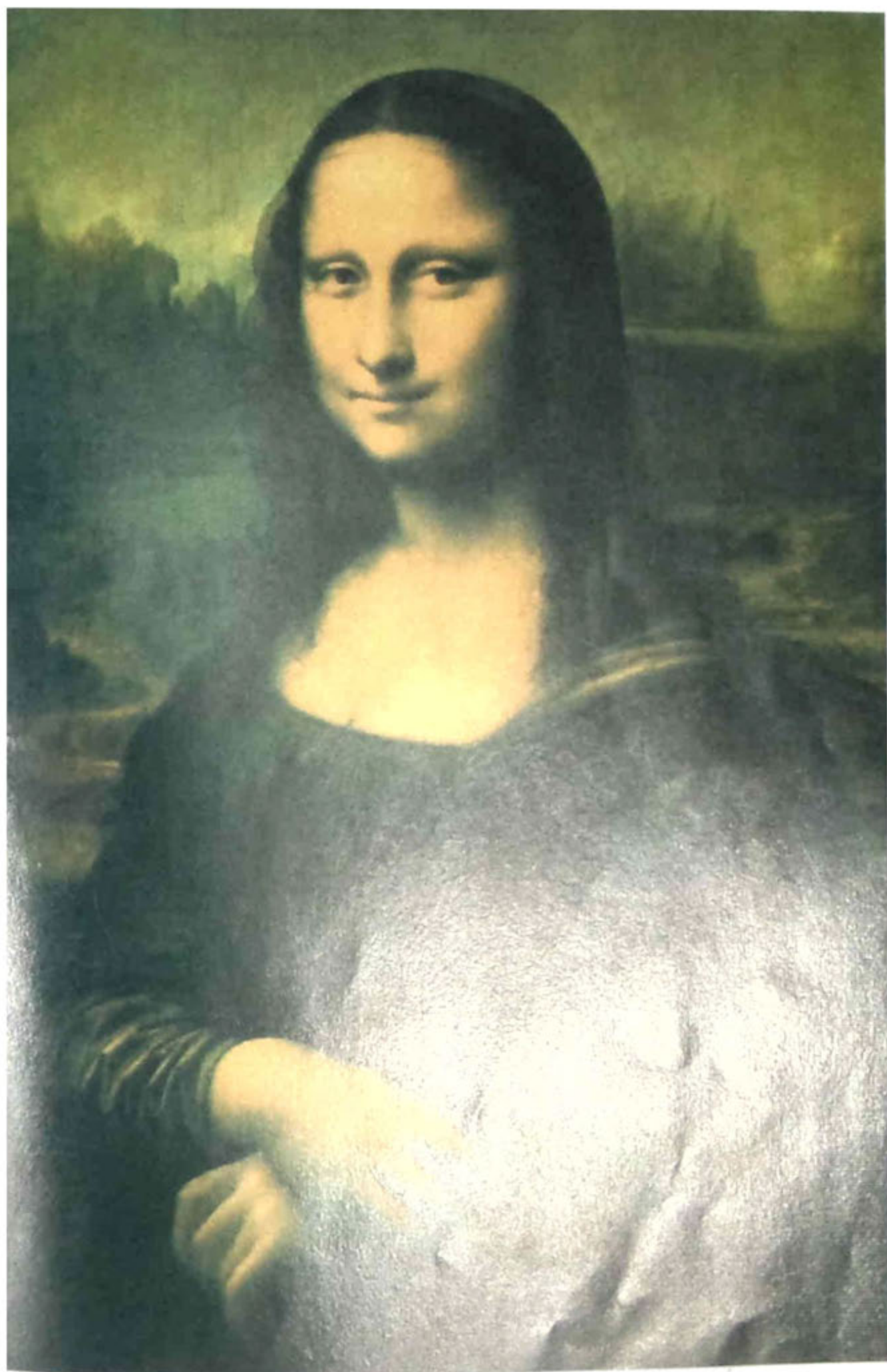
উনিশ শতকের প্রথম দিকে, উত্তর-নেপোলিওনীয় পুনরুজ্জীবনের মাঝামাঝি, এই বিষয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে রাজনীতির ছায়া। রাজার হাতের মধ্যে মুহূর্তে লিওনার্দো জন্য শেষ স্যাক্রামেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে (তাই অবধারিতভাবেই ছবিতে এসে যাচ্ছে ক্রুশ, যাজক, কার্ডিনাল, বাইবেল ইত্যাদি)। ওই সময়কার রাজকীয় ক্যাথলিকতন্ত্রেরই প্রকাশ ঘটানো হয়েছে এভাবে।^{৭৪} লিওনার্দোকে যাজক বিরোধী *ante litteram* হিসেবে উপস্থাপনের উদার নৈতিক উদ্যোগের বিপরীত ধারায় এটা করা হয়।

লিওনার্দো কাল্ট বা লিওনার্দো ভক্তির একমাত্র সহজলভ্য ঐতিহাসিক থিম হচ্ছে মৃত্যুশয্যার দৃশ্য। ইতালিতে বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন এবং ইতালিয় বিজ্ঞানীদের প্রায়ুক্তিক সাফল্য সেখানকার শিল্পীদের বিজ্ঞানী লিওনার্দোকে তুলে ধরায় উৎসাহিত করে। এই ভাবেই ১৮৪৩ সালে নিকোলা কিয়ানফানেল্লি একটা ছবি আঁকেন, তাতে দেখা যায় গণিতবিদ ও বহুলপঠিত *De Divina Proportione* (১৫০৮) গ্রন্থের লেখক লুকা পাকিওলি লোদোভিকো ইল

মরোর সঙ্গে লিওনার্দোকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন—ওই বইটির ষাটটির মতো ছবি এঁকে দিয়েছিলেন লিওনার্দো। চেরুবিনো কর্নিয়েস্তি তার ছবিতে দেখান, লোদোভিকোর কাছে *naviglio* বা মিলানের খাল (১৮৫৮-৫৯) সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন লিওনার্দো। কর্নিয়েস্তি আরেকটি ছবি আঁকেন যাতে দেখা যায়, সান্তা মারিয়া দেল্লে গ্রাজিয়ে'তে লিওনার্দোকে *The Last supper* নিয়ে কাজ করতে দেখছেন বিশিষ্ট দর্শনার্থীরা (১৮৫৭)। অন্যদিকে আরেকজন ইতালিয় ফ্রান্সেস্কো পোদেস্টি তাঁর ছবিতে দেখান, একই কাজ নিয়ে লোদোভিকোর সঙ্গে আলাপ করছেন লিওনার্দো (১৮৪৬)। মিলানে লা স্কারার মুখোমুখি লিওনার্দোর একটা মূর্তি স্থাপন করা হয় ১৮৭২ সালে, যে চারজন শিল্পী ও অনুগামী রয়েছে তাকে ঘিরে তাদের সবার হাতেই নানারকম যন্ত্রপাতি। কিন্তু লিওনার্দোর হাতে কিছুই নেই। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, গভীর চিন্তায় মগ্ন। মূর্তি উৎকীর্ণলিপিতে বলা হয়েছে : *Al rinnovatore delle arti e delle scienze* (শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের পুনর্জন্মদানকারীকে)।

মোনালিসা'র শিল্পী হিসেবে লিওনার্দো অন্যান্য শিল্পীদের বিষয় ছিলেন না খুব একটা। এমন কি তার মৃত্যুশয্যার যে ছবি এঁকেছেন সেজার মুসিনি ও মেনাগিও তাতে লিওনার্দোর *St. Anne with Virgin and child* শিল্পকর্মটি দেখানো হলেও মোনালিসা নেই। প্রথম যার ছবিতে মোনালিসা ঠাঁই পেয়েছিলো তিনি আইমে পেজেস (১৮০৩-৬৬), নিজের সেই শিল্পকর্মটা তিনি সালোয়া'তে প্রদর্শন করেন ১৮৪৫ সালে। শুধুমাত্র পল-প্রসপার অ্যালাই'র এনগ্রেভিংটা এখনও টিকে আছে (২৫ নম্বর ছবিটি দেখুন)। যদিও ছবিটার শিরোনাম 'রাফায়েলকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে লিওনার্দোর সঙ্গে'। আইমে পেজেস বিখ্যাত প্রতিকৃতিটা রেখেছেন মাঝখানে। লিসা গেরার্দিনি ডান দিকে ব'সে আছে, মুখে হাসি, দর্শকদের দিকে মুখোমুখি, তার পেছনে সেইসব গায়ক যাদের কথা উল্লেখ করেছেন ভাসারি। লিওনার্দো গর্বের সঙ্গে প্রতিকৃতিটা দেখাচ্ছেন তরুণ রাফায়েলকে। রাফায়েল তাকিয়ে আছেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

ততোদিনে মোনালিসা সবে সাহিত্যের একটা পূজনীয় বিষয়ে পরিণত হতে শুরু করেছে। ১৮৬৩ সালে সেজার মাকারি *Leonardo che ritrae la Gioconda* (গিওকোন্দা আঁকছেন লিওনার্দো; ২৬ নম্বর ছবিটি দেখুন) ছবিটিতে দেখান লিওনার্দো ব'সে আছেন ডান দিকে, প্রতিকৃতিটার পাশে। লিসা তার বিপরীতে, বাম দিকে, অনেকটা দূরে। ইস্তিতুতো পের লে বেগ্নে আর্তি দি সিয়েনার প্রতিযোগিতার জন্য এই থিম বেছে নিয়েছিলেন মাকারি।



১. মোনালিসা, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৫০৩-৬৭, লুভ্র)



২. পোর্ট্রেইট অব আননোন ম্যান, আনতোনেত্তো দা মেসিনা (১৪৭০, মিউজিও
মাস্ত্রালসকা, সিফালু, সিসিলি)



৩. বাভাস, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৫১৩, লুভর)



৪. সেন্ট জন দা ব্যাপ্টিষ্ট, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি



৫. জেই এন টইদ মিলিস হাউ চাইল্ড, দি ডেড ক্রিস্ট (১৪৪৮-১৪১০ এর মধ্য সঙ্কলিত, পুজা)



১২. পোর্ট্রেট অব বালদিসার কাব্রিলিওয়ন, রাফায়েল (১৫১৪-১৫, লুভর)



১০. মোনা ভক্স, লিওনার্দো অ্যানুসরণে আঁকা (১৫১৩, মিউজি কনসে, চার্লস), ছবিটা নেকচে পিওকোকা নামেও পরিচিত



১৪. পোর্ট্রেট অব কলোফিনা, ফ্রান্সেসকো মেলজি (হার্মিটেজ, সেন্ট পিটার্সবার্গ)



১৫. লা ফেমে এলা পালে, কামিলে কোবাত (১৮৬৯, লুভৰ)



১৬. দা প্যালাৰি অব দি লুভৰ, সামুয়েল এক বি মোৰ্স (১৮৩৩, মিউজি অ'ফেৰিকান, পিভাৰ্ণ)



১৭. লেডি কপিষ্ট এট দি স্কুতর, শুভাভমারিও
(১৮৫০, মিউজি শুভাভ, প্যারিস)



১৮. কোরোরে হিউরেল বা সালোয়া, ক্রাসোয়া বেয়ার্ড (১৮৪৭, লুভর)



১৯. দ্য সালোয়া ক্যারে গ্র্যান্ড দি গ্র্যান্ড গ্যালারি অব দি লুভর.
জন ফারলেট ডেভিস (১৮৩১, ব্রিটিশ এ্যামবাসি, প্যারিস)

তিনিই প্রথম পুরস্কারটি পান, ইস্তিতুতো ছবিটি সংরক্ষণের দায়িত্ব পায়। তবে ওই ইন্সটিটিউটের পরিচালকের অভিভাবকত্বে থাকার ফলে এটা সম্ভব যে, মাকারি আগেই জানতে পেরেছিলেন ওই ধরনের থিম নিয়ে ছবি আঁকলে বিজয়ী হওয়ার ভালো সুযোগ রয়েছে।

বিখ্যাত লাল-চকের ড্রয়িং, যেটাকে লিওনার্দোর আত্মপ্রতিকৃতি বলা হয়ে থাকে (২৭ নম্বর ছবিটি দেখুন), এইসব ছবিতেও সেভাবেই দেখানো হয়েছে। উনিশ শতকে শেষ নাগাদ এটা লিওনার্দোর আদর্শ প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয়, আর সেই থেকে এখন পর্যন্তও তেমনি আছে।^{১৭} ড্রইংটা প্রকৃত পক্ষে ১৮৪০-এর দশকের আগে খুঁজে পাওয়া যায় নি।^{১৮} তবে এর বিভিন্ন এনগ্রেভিং আগেই প্রচারিত ছিলো। এতে দেখা যায় একজন জ্ঞানী বৃদ্ধের চেহারা, যিনি বৃদ্ধ হলেও দৃঢ় এবং পুরুষোচিত। দীর্ঘ সাদা রঙের চুল আর দাঁড়িতে তাকে দেখাচ্ছে মুসা নবী অথবা ঈশ্বরের মতো। বাস্তবতার সঙ্গে কোথাও এর একটা মিল থাকতে পারে : রাফায়েলের *School of Athens* (১৫০৯-১০, ভ্যাটিকান মিউজিয়াম) ছবিটিতে বিখ্যাত দার্শনিকদের উপস্থাপন করা হয়েছে—যেমন অ্যারিস্টটল, সক্রেটিস, জেনো, জেনোফোন প্রমুখ—যেখানে প্রোটোকে সমতুল্য আঁকা হয়েছে লিওনার্দোর মতো ক'রে, দীর্ঘ চুল-দাড়ি সহকারে। ১৫৯০ সালে (লিওনার্দোর মৃত্যুর ঠিক সত্তর বছর পর) জিয়ানপাওলো লোমাস্কো—যিনি ছিলেন একজন চিত্রকর কিন্তু অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর লেখকে পরিণত হোন, লিওনার্দোর চুল-দাড়ি সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি দীর্ঘ চুল-দাড়ি রেখেছিলেন জ্ঞানের প্রকৃত মহত্বকে রূপ দানের জন্য।'^{১৯}

প্রত্যাশা অনুযায়ী যদি প্রচলিত শারিরীক সৌন্দর্য মিলে যায় তাহলেই কার্যকরী হবে, এই হলো জনপ্রিয় ধারা : নায়ক ও নায়িকা হবে সুশ্রী, ধূর্তরা হবে কদাকার, ভগুরা দেখতে হবে হালকা গড়নের আর তাদের চোখ হবে ছোটো ছোটো। শিল্পীদের ক্ষেত্রেও যে এমন কল্পনা করা হয়েছে অনেক ছবি দেবে তেমনটাই বোঝা যায়। 'আত্মপ্রতিকৃতি'র লিওনার্দোকে দেখায় একজন পয়গম্বর, একজন জাদুকর কিংবা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির মতো। একজন চিত্রকর বা শিল্পীর মতো নয়, অন্তত উনিশ শতকে চিত্রকর বা শিল্পী সম্পর্কে যেমন ভাবা হতো : আবিষ্ট, ধ্যানমগ্ন, ভ্রমন্ত, খানিকটা বাতিকগ্রস্ত—মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর মতো। 'আত্মপ্রতিকৃতি'র লিওনার্দো শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত। তার দীর্ঘ চুল সমতুল্য আঁচড়ানো, বিংশ শতাব্দীর 'পাগল' বিজ্ঞানী অনেকটা আইনস্টাইনের বিখ্যাত ছবির মতো, কিন্তু আত্মভোলা অধ্যাপকদের মতো নয়।

লিওনার্দোর এই প্রতিচ্ছবির একটা এনগ্রেভিং করেছিলেন ওইসেপ্পে বসি। সেটা অন্তর্ভুক্ত করা হয় *Del cenacolo di Leonardo da Vinci, libri quattro* নামক লিওনার্দোর ওপর রচিত প্রথম দিককার বইটিতে (মিলান, ১৮১০), ওই এনগ্রেভিং বইটিকে পরিচিত করে তোলে। এই বইতে বসি যে কিনা নিজেও একজন শিল্পী, কেবল বিখ্যাত জনেরই পোর্ট্রেট আঁকেন নি বরং সন্দেহাতীতভাবে লিওনার্দোর ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচাইতে বিখ্যাত চিত্রকর্ম *The Last Supper*-এর মতো শিল্পকর্মের উপরেও কাজ করেছেন।

১৮০০ সালে রাফায়েল মরগেন *The Last Supper*-এর একটি এনগ্রেভিং করলে ছবিটার খ্যাতি আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এক সংস্করণে এর পাঁচশ'টি কপি করা হয়। বিখ্যাত কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত যতো মুরালের এভাবে প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছিলো ঊনিশ শতকে সেগুলোর মধ্যে এটাই ছিলো শীর্ষে।^{৭৮} তবে সৃষ্টি থেকেই মূল তৈলচিত্রটা বিখ্যাত ছিলো। ১৪৯৯ সালে মিলান দখল করেন ছাদশ লুই। তিনি সেটার প্রতি এতোটাই আকৃষ্ট হন যে, সান্তা মারিয়া দেল্লা গ্রাজিয়ের দেয়াল থেকে সেটা বিচ্ছিন্ন করে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অ্যামবোয়া'র কার্ডিনাল নিজের বাসভবনের জন্য সেটার কপি তৈরি করিয়েছিলেন একটা। প্রথম ফ্রাঁসোয়া ট্যাপেস্টি হিসেবে একটা কপি করান পোপ সপ্তম ক্রেমেন্তের জন্য। রুবেন্স সেটার এনগ্রেভ করেছিলেন।^{৭৯} পরে পর্যটন বেড়ে গেলে এর খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪২ সালে জন মারে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত সর্বাধিক সফল ট্রাভেল গাইডগুলোর অন্যতম ফ্রান্সিস প্যালগ্রের *Handbook for Travellers to North Italy* বইটি হাতে নিয়ে ১৮৪৪ সালে বিখ্যাত মুরালটির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন চার্লস ডিকেন্স।

লিলিয়ান সোয়ার্জ তাঁর 'লিওনার্দো'র মোনালিসা' নামক বইতে বলেছেন :

সান্তা মারিয়া দেল্লা গ্রাজির দিলাপিদেত আশ্রমের পুরনো
ভোজনকক্ষের চিত্রকর্মগুলো সম্ভবত এই বিশ্বের
সবচাইতে বেশি সুপরিচিত : দ্য লাস্ট সাপার লিওনার্দো
দা ভিন্সির আঁকা।^{৮০}

১৮৫৩ সালে আলগারনন সুইনবার্নকে তার বোন মিলানের কোন্ কোন্ দ্রষ্টব্য বস্তু দেখা উচিত তা জানতে চেয়েছিলেন। সুইনবার্ন তাকে একটা তালিকা দিয়ে তাতে আরো উল্লেখ করেন, 'তোমাকে আমার স্মরণ করিয়ে

দেয়ার দরকার নেই, মিলানের সবচেয়ে বড় মুকুট আর গৌরব হচ্ছে লিওনার্দোর লাস্ট সাপার...এটা দেখা মাত্রই তুমি অভিভূত হবে।^{১১}

এ সময়ে লিওনার্দো ছিলেন রেনেসাঁর মহান বিজ্ঞানী যিনি *The Last supper* সৃষ্টি করেছেন, মোনালিসা'র স্রষ্টা নন। গোয়ায়েতে ১৭৮৮ সালের মে মাসে মিলানে *The Last supper* প্রত্যক্ষ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'শিল্পের সুরক্ষাগারে এ এক সত্যিকারের কিস্টোন।'^{১২} কিন্তু আসল বস্তুটা দেখার আগে থেকেই তাঁর মধ্যে এই ধারণা বিরাজ করছিলো : ১৭৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে রোমে এর একটা কপি দেখেন তিনি এবং অভিভূত হয়ে লেখেন : 'আমি চেষ্টা করছি একটি ইচ্ছা কপি তৈরি করতে, হয় এটার কপি থেকে না হয় অন্যটার থেকে। এটা হবে বিশাল একটি আশীর্বাদ, যদি একটি বিশ্বাযোগ্য অনুলিপি তৈরি করা যায় তবে সেটা বৃহত্তর জনসাধারণের জন্য একটি আশীর্বাদ হবে।'^{১৩}

প্রায় বিশ বছর পর যখন বসির বইটা পর্যালোচনা করেন গোয়ায়েতে, ততোদিনে তিনি পরিণত হয়েছেন ইউরোপের প্রধান সাহিত্যিকে। তাঁর সে পর্যালোচনা অনূদিত হয় ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায়, ফলে বসির আর মরগেনের কাজ আরো সাফল্যের মুখ দেখে।^{১৪} এর ফলেই *The Last supper*-এর আরো এনগ্রেভিং তৈরি করা হয়, সেসবের মধ্যে ১৮৩১ সালে জিওভান্নি ফলোর কাজ বিশেষ যশ লাভ করে। ১৮৬৪ সালে মরগেন সেই কাজটি ধরেন যা এনগ্রেভারদের জন্যে বড় একটি বিষয় : তিনি লিওনার্দোর *Last Supper* এনগ্রেভ শুরু করেন (জি, কাস্তাগনোলা, *Raffaello Morghen che incide il Cenacolo di Leonardo*)। কয়েক দশক পরও মার্সেল প্রাউস্ট মরগেনের প্রিন্ট দেখে গভীর আলোড়ন অনুভব করেন।^{১৫}

সবাই এক বাক্যে না হলেও বিশ শতকের শিল্প ইতিহাসবিদেরাও *The Last Supper*-এর প্রশংসা করেছেন। কেনেথ ক্লার্ক সমর্থন করেছেন গোয়ায়েতের মতামত : এটা 'ইউরোপিয় শিল্পের একটি কিস্টোন।'^{১৬} লিওনিদ বাতকিন ঘোষণা করেন যে, 'এটা লিওনার্দোর সর্বাধিক সাংস্কৃতিক গুণসমৃদ্ধ, সর্বাধিক দৃষ্টান্তমূলক এবং সর্বাধিক বিস্তৃত সাফল্য।'^{১৭} আধুনিক সমাজতত্ত্বের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জর্জ সিমেল ১৯০৫ সালে এক লেখায় দাবি করেন, *The Last supper* দৃশ্যত আধুনিক সমাজের জীবন-জটিলতা সমাধান করেছে— অর্থাৎ 'বিভিন্ন ব্যক্তিকে একটি সংঘে কিভাবে মিলিত করা যায়।'^{১৮}

সুঁদাল তার *Histoire de la peinture en Italie* গ্রন্থের *The Last supper*-এর বিবরণী দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'আপনি এই পেইন্টিং

সম্পর্কে জানবেন না তা অসম্ভব, এটা মরণের প্রকৃত চমৎকার এনথ্রোপিং।^{১১৯} তিনি *La Joconde* সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এ ছবিটা সম্পর্কে তিনি কিছু জানতেন না। ১৮১০ থেকে ১৮১১ সালের মধ্যে নেপোলিয়নের জন্ম করা চিত্রকর্মগুলোর ক্যাটালগ তৈরির কাজে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন স্তঁদাল, তাছাড়া *Musee Napoleon* (অর্থাৎ *Louvre*)-এর পরিচালক দোমিনিক দিভাস্ত দেনোনের সঙ্গেও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিলো তাঁর। সুতরাং লিওনার্দোর অন্যান্য কাজ সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা থাকাই স্বাভাবিক। অতঃপর ১৮১১ সারে স্তঁদাল যখন প্রথম বার ইতালি সফল শুরু করেন, তখন বিশেষ করে ইতালির শিল্পকলার মোটামুটি জ্ঞান নিয়েই সেখানে যান। অন্যদিকে ইতালিতে গিয়ে তিনি লুইগি লানজির *Istoria pittorica dell' Italia*-এর তৃতীয় সংস্করণটি পড়েন (১৮০৯, প্রথম সংস্করণ ১৭৯২), এর পাশাপাশি পড়েন ভাসারির *Vite* এবং বসির লেখা লিওনার্দোর ওপর একটি বই।^{১২০} কিন্তু শীগগিরই এসব বিষয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন স্তঁদাল এবং আরো উত্তেজনাকর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন—নেপোলিয়নের ব্যর্থ রুশ অভিযান। সেখানে দুর্ধর্ষ কসাকরা তাঁর মালপত্র লুটে নেয় বিভিন্ন লেখার পাণ্ডুলিপিসহ। ১৮১৩ সালে তিনি প্যারিসে ফিরে আসেন কপর্দকহীন অবস্থায়, আবার তাঁর *Histoire* লেখা সম্পূর্ণ করার কাজে মন দেন, কিন্তু ১৮১৭ সালের আগে আর সেটা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে।

বইটার কাজ অত্যন্ত অসংগঠিত, দুর্দশাপূর্ণ, ইংরেজি ও ইতালিয় ভাষায় প্রকাশিত কাজের ওপর প্রচণ্ড নির্ভরশীল, কিন্তু ফ্রান্সে প্রকাশিত এটাই পেইন্টিংয়ের প্রথম জনপ্রিয় ইতিহাসগ্রন্থ। এ বইয়ের তারকা যদিও মাইকেলএ্যাঞ্জেলো এবং রাফায়েল, তাসত্ত্বেও এর এক-দশমাংশ স্থান ছেড়ে দেয়া হয়েছে লিওনার্দোর জন্যে। তারও মধ্যে বেশি আলোচনা করা হয়েছে *The Last Supper* নিয়ে।^{১২১} ‘মোনালিসা’ উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র দু’বার, প্রায় ঘটনাক্রমে : ‘লিওনার্দো সমাজের সম্ভ্রান্ত নারীদের পেইন্টিং শুরু করেন : জিনেভা দে বেনচি...মোনালিসা...’ মোনালিসা সম্পর্কে তিনি সাদামাটাভাবে বলেন, ‘এমন মনোহর এক নারীর ভুরু না থাকাটা সত্যিই বিদঘুটে ব্যাপার।’^{১২২}

স্তঁদালের বিবেচনায় লিওনার্দোর তিনটি মহান কাজ হলো *The Last supper*, *The Battle of Anghiari* এবং *Cavallo* মূর্তি।^{১২৩} প্রথমটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, বাকি দুটো হারিয়ে গেছে। বিষয়টা রোমান্টিকদের জন্যে লিওনার্দো-ম্যাজিকের অংশ হয়ে উঠতে পারতো : একজন বিষন্ন প্রতিভা যিনি তাঁর পেছনে তাঁর মহত্ত্বের শুধু ধারণাই রেখে গেছেন।

Histoire de la peinture স্টুদালের বাজারজাতকরণের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে সফল হয় নি। অবশ্য তিনি নিজের পক্ষে রিভিউ পেয়েছিলেন অনেকটা বিজ্ঞাপনের মতো ক'রেই ২৩ শে সেপ্টেম্বর ১৮১৭ সালের *Le Moniteur universel* পত্রিকায়।^{৯৪} ছয় মাস বাদে আরেকটি পত্রিকায় তাঁর পক্ষে রিভিউ হয় সেটা হলো রক্ষণশীল *Journal des debats* এ।^{৯৫} রিভিউকারী লেখেন, বইটা এক শূন্যস্থান পূরণ করেছে : ভাসারি ছিলেন খুব বেশি বিস্তৃত, ইংরেজি বইটা অনেক বেশি জ্ঞান ধারণ করেছে, আর ইতালিয়টা অনেক বেশি শব্দবহুল। এখানে, অবশেষে পড়ার মতো কিছু পাওয়া গেলো : 'এটাই প্রথম নয় যে, কোনো ফরাসি তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত নিয়ে বিদেশীদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন।' লিওনার্দো সম্পর্কে স্টুদালের মন্তব্য 'দুদার্ত্ত মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর সাথে তাঁর বৈসাদৃশ্য তৈরি করেছে।'^{৯৬} এর পরই, তিনি ভাষ্যকারদের বিশাল অংশের মন্তব্য পেতে শুরু করেন।^{৯৭} প্রথম ইতালিয় রিভিউ *Biblioteca italiana* (এপ্রিল, মে এবং জুন ১৮১৯) তে বেরোয়। সেটা প্রধানত ছিলো নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা।^{৯৮}

Edinburgh Review (অক্টোবর, ১৮১৯) অবশ্য পক্ষে লিখেছিলো। স্টুদাল 'অনেক বছরের মধ্যে একটি চমৎকার বই লিখেছেন', যদিও তিনি তাঁর বইতে অন্যদের অনুচ্ছেদ ব্যবহার করেছেন এবং 'খুবই আগ্রাসী ভাষায়' ধর্মের বিরুদ্ধে লিখেছেন। কিন্তু একজন 'বোনাপার্ট অনুসারী'র কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আর কী আশা করা যেতে পারতো; এমন একজন সৈনিক যিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন...যুদ্ধ এবং ভালোবাসার মধ্যে'। *Edinburgh Review* এই মত দিয়েছিলো যে, লিওনার্দো চারুকলার দিক থেকে মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর চেয়ে নিকৃষ্টমানের, তাছাড়া, সবদিক থেকেই সেরা, বিমূর্ত্ত বিজ্ঞান থেকে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের আনন্দের দিক পর্যন্ত।' দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং যন্ত্রপ্রকৌশলে তাঁর অবদান প্রশংসিত হয়েছে। স্টুদাল লিওনার্দোকে ফ্রান্সিস বেকনের সাথে তুলনা করেছিলেন। লিওনার্দোর সেরা ছবিটা হলো *Last Supper*, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় হলো—*Edinburgh Review*'র মতে—আমাদের কাছে এখনও রয়েছে মরগেনের নিখুঁত এবং বিখ্যাত অনুলিপিটি।^{৯৯}

অন্যেরাও প্রশংসায় মেতে ওঠেন। প্রশংসায় উচ্ছ্বাসই বেশি দেখা যায়। তবে স্টুদালের কাছে ঋণও স্বীকার করা হয়।^{১০০} স্টুদালের নিজের লেখারও প্রশংসা করা হয় বিভিন্ন রিভিউতে।^{১০১}

স্টুদালের *Histoire* কখনই তার লেখককে যথেষ্ট টাকা এনে দেয় নি, তবে ১৮২৫ সালে পুণর্মুদ্রিত হওয়ার পর শিল্প-সাহিত্যের পরিমণ্ডলে তা বিশেষ প্রভাব ফেলে।^{১০২} ওই গ্রন্থে *The Last Supper*-কে যে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছিলো, সময়ের পরীক্ষায় তা উত্তীর্ণ হয়েছে। এই শিল্পকর্ম অদ্যাবধি মিলানের প্রধান পর্যটন স্থান। সান্তা মারিয়া দেল্লে গ্রাজিয়ে সব সময় ভর্তি থাকে পর্যটকে, আর এই দেয়ালচিত্রের সাম্প্রতিক সংস্কার (১৯৯৯) এবং যশ আরো ছড়িয়েছে নতুন করে। সুদূরতম স্থানেও এর গুণগ্রাহীতা লক্ষ্যণীয়। মধ্য ফিজির গাউ নামক একটি দ্বীপে *The Last Supper*-ট্যাপেস্ট্রিতে ফুটিয়ে তুলে তা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে অধিকাংশ গ্রামীণ গির্জা ও বাড়ির দেয়ালে। গাউ-এবং যেসব গ্রামবাসী লেবাননে জাতিসংঘ বাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করেছিলো, ১৯৭৮ সালের পর দেশে ফেরার সময় লেবানন থেকে তারা ওগুলো নিয়ে আসে।^{১০৩}

এক বছর পরে স্টুদালেন বইটি এডিনবরাহ রিভিউ পত্রিকায় রিভিউ করা হয়, ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর *Memorials of a Tour on the Continent* (১৮২০) নামক বইটিতে একটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেন, সেটির নাম 'The Last Supper by Leonardo da Vinci, in the Refectory of the convent of Moria della Grazia-Milan' তবে মুরালের অবস্থা দেখে হতাশ হলেও ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেন, 'কয়েক বছর আগে লন্ডনে প্রদর্শিত কপি আর মরগেনের এনগ্রেভিং দুটোই মনোগ্রাহী; কিন্তু আসলটাতে এমন এক শক্তি আছে যা ওইসব কাজে ঝুঁজে পাওয়া যাবে না।'

গৌণ কবিরাজ লিওনার্দোর প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। চার্লস ল্যাঙ্ক (১৭৭৫-১৮৩৪) লিওনার্দোর *Virgin of the Rocks*-এর ওপর একটি কবিতা রচনা করেন। ভবিষ্যৎ সেন্ট জনের সঙ্গে শিশু জিস্তর খেলা দেখছে মেরি, আনমনে।

...তখন পর্যন্ত সেইসব ধীরগতির পুরো ঘটনা, যেখান থেকে আমরা আমাদের বিজয়ের দেখা পেয়েছিলাম।^{১০৪}

ডব্লিউ.সি বেনেটের 'Sonnet at Milan in the Convent of the Madonna delle Grazie' (১৮৬২) শীর্ষক কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে :

ওহু কী চমৎকার আমাদের প্রতিভাবান লিওনার্দো...
ও শক্তিশালী মাস্টার, ঠিক আমাদের প্রিয় রাফায়েলের
মতো

অব্রে দ্য ভেরেও এই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করেছেন তার 'Leonardo's Last Supper at Milan'-এ (১৮৮৪)।

এবং আমাদের মোনালিসা? সামান্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে কাউকেই এ ছবির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন ব'লে মনে হয় না। আইরিশ জাতীয় কবি হিসেবে একদা বিবেচিত টমাস মুর তার *Rhymes on the Road* (১৮১৯) লেখেন ইতালি সফরের সময়। তাতে তিনি 'দাড়িওয়ালা পরম বিজ্ঞ' ব্যক্তির যে সাধারণ ধারণা আছে লিওনার্দো সম্পর্কে সেটাই গ্রহণ করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ইতালিয় রেনেসাঁ যুগের নারীদের পেইন্টারও বটে, যাদের সৌন্দর্য এখনও বিকল্পহীন, মুর বলেন, বর্তমান যুগের তরুণ ফ্লোরেনটাইনদের বর্ণনা দিতে গিয়ে, 'আরনো'র কালো চোখের যুবা' ব'লে, যারা স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁকে 'মোনালিসা, যার চোখে/ এক চিত্রকর যিনি সারা বছর তাকিয়ে থাকেন।'

আরো কয়েক বছর পর 'Summer Fete' (১৮৩১) কবিতায় আবার মোনালিসার কথায় ফিরে আসেন মুর।^{১০৫} এই দীর্ঘ স্যাটায়ার-ধর্মী কবিতায় টেম্‌স নদী তীরে একটি ফ্যান্সি-ড্রেস পার্টির বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যাতে অংশ নেয় 'সৌন্দর্য, মর্যাদা আর ক্ষমতার লোকেরা,'

অবিবাহিত কুমারী, এইতো বেড়িয়ে এলো, বৃদ্ধ
প্রধানমন্ত্রীর কাছে, অনেক সময় ধরে।

হৈচৈপূর্ণ পানভোজনোৎসবকারী দলের মধ্যে ছিলো একজন লিউট গায়িকা

দখিনা সূর্যালোকের মতো সেই কণ্ঠস্বর যেনো ভেসে বেড়ায়
শূন্যে।

গভীর কালো চোখের সুন্দরী কুমারী, পরিপাটি পোশাক
পড়া, যার শিল্পকর্ম মৃত্যুহীন,

উজ্জ্বল মোনালিসা—ভুরু দু'পাশে এলিয়ে পড়া চুল, এবং
ছোট্ট একটা মণি যা জ্বলজ্বল করছে

মাঝখানে—চেহারাতেও দা ভিক্কি'র সৌন্দর্য পূর্ণতা লাভ
করছে যেনো...

নুভরের পেইন্টিংটার সঙ্গে এই বর্ণনা খাপ খায় না। হয়তো মুর একটা কপি দেখেছিলেন। ফেলিসিয়া ডরোথি হিম্যানস তার 'The Maremma'

কবিতাটা লেখার সময় মোনালিসার কথা মাথায় রেখেছিলেন হয়তো, কবিতাটা প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর : 'দক্ষিণের কন্যার মতো বিস্ময়/এখনও নিঃশ্বাস নিচ্ছে, দুটি ছড়াচ্ছে, ভিক্ষুর রঙের উষ্ণতায়।' একটা (অ)সাহায্যকারী পাদটীকা—সম্ভবত তাঁর বোন হ্যারিয়েট হিউজের লেখা—থেকে জানা যায়, এটা লিওনার্দোর স্ত্রী মোনালিসার বিষয়ে পরোক্ষ উল্লেখ, যার প্রতিকৃতিটা ছিলো 'সম্ভবত পেইন্টিংয়ে প্রদর্শিত প্রকৃতির সর্বকালের নিখুঁত অনুকরণ।' ^{১০৫}

প্রথম পর্যায়ে মোনালিসাকে সাহিত্যে ইতালিয় সৌন্দর্যের প্রতিনিধি হিসেবে এভাবেই উপস্থাপন করা হয়। এখন যে হাসি প্রধান বিবেচ্য বিষয় তখন তা অনুল্লেখ্যই থেকে গিয়েছিলো। তখনও পর্যন্ত সে পরিণত হয় নি প্রহেলিকাময় *Femme Fatale*-এ, এটা ছিলো ফরাসি রোমান্টিক লেখকদের কাজ। স্তম্ভালের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৮৫০ সালে থিওফাইল গতিয়ের যখন ইতালি সফরে যান তখন তিনিও আর সবার মতো সান্তা মারিয়া দেল্লে গ্রাজিয়ে গির্জায় থেমে দাঁড়ান, এবং আর সবার মতোই ধ্বংসপ্রায় *Last Supper* দেখে চমকিত হন। লিওনার্দো সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, 'রহস্যময় অনির্বচনীয়, গোধূলিকালীন শিল্পী।' ^{১০৬} কিন্তু মোনালিসা সম্পর্কে এসব আখ্যা প্রস্রোগ করেন নি তিনি।

লিওনার্দোর যশ যতো বেশি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলো, লিসা গেরার্দিনির প্রতিকৃতির সাহিত্যিক উপস্থাপনাতেও ততোই প্রয়োজন হয়ে পড়ছিলো নতুন এক অর্থ। রোমান্টিকদের কাছে বিজ্ঞান ছিলো এক ধরনের জাদু। তারা বিজ্ঞানী লিওনার্দোকে *Eternal Feminine*-এর চিত্রকর হিসেবে পুনঃনির্ধারণ করে। প্রথম লিওনার্দোর যশ দ্বিতীয় লিওনার্দোর সাফল্যে ভূমিকা রাখে। তাঁকে বাছাই করাটা কোনো দুর্ঘটনা ছিলো না। এ দ্বৈত ভূমিকায় এমন নিখুঁতভাবে রেনেসাঁর আর কোনো শিল্পীকে পাওয়া সম্ভব ছিলো না। কেবল একজন জাদুকরই আঁকতে পারতেন এমন এক ঐন্দ্রজালিক নারীর ঐন্দ্রজালিক হাসি। কেবল একজন বিশ্বজনীন প্রতিভাই আঁকতে পারতেন এমন বিশ্বজনীন এক নারীর ছবি।

রহস্যময়ী হয়ে উঠলো মোনালিসা

ভাসারি মোনালিসা'র প্রশংসা করে বলেছেন এটা রাফায়েলকে অনুপ্রাণিত করেছে, এটাকে ব্যাপকভাবে অনুকরণ আর নকল করা হয়েছিলো; কিন্তু বিখ্যাত হবার জন্য তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। *Gazette des Beaux-arts* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শার্ল ব্রাঁ এবং *Ecole des Beaux-Arts* পত্রিকার পরিচালক ১৮৫৯ সালে ঘোষণা করেন যে, একমাত্র তাদের দেশই মোনালিসা'র মূল্য বুঝতে পেরেছে। আঠারো শতকে তারা মোনাকে 'কোলাহলপূর্ণ, অসাধারণ এবং শ্রেষ্ঠপূর্ণ' বলে অভিহিত করেন—তার মধ্যে অপরিহার্য ধ্যানমগ্নতার চেতনার ঘাটতি রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়।

মোনালিসার পরিচিতি আরো ব্যাপ্ত না হওয়ার মূল কারণ সেই সময়ে সহজে অনুলিপি করার সুযোগের সীমাবদ্ধতা। সমালোচনামূলক খ্যাতি অর্জনের জন্য এ ছবির নকল কপি সহায়ক ছিলো, কিন্তু মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর কাছে জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য এ ছবি মুদ্রিত হওয়ার দরকার ছিলো, কারণ মুদ্রিত ছবি খুব সহজে পাওয়া যায় আর দামও হয় অনেক কম। *The Last Supper* মরগেনের নিজের ছবির চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণেই। কিন্তু মরিন, এদলিংক, ফ্রাঁসোয়া দ্য পালি কিংবা জেরার্দ অদ্রানের মতো খ্যাতিমান অনুলিপিকারদের কেউই মোনালিসার কপি তৈরির উদ্যোগ নেন নি। এ ছবিটির কপি তৈরি করা আসলে খুব সহজ ছিলো না। এমন কি একজন দক্ষ খোদাইকারও অনেক চেষ্টার পর এ ছবির সুস্ব ফুমাতে রীতিকে কপি করার জন্য প্রয়োজনীয় ছাঁচ তৈরি করতে ব্যর্থ হন। রাফায়েলের আঁকা ছবিগুলো কপি করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হলেও তা প্রিন্ট ফরম্যাটে আনা সম্ভব হয়েছিলো।

অনেক চেষ্টার পর ১৮৫৭ সালে ইতালির বিখ্যাত খোদাইকার লুইজি কালামাস্ত্রা মোনালিসার কপির ছাঁচ তৈরি করতে সমর্থ হন। আসলে এর আগে বেশ কয়েকবারই মোনালিসার নকল তৈরির চেষ্টা করা হয়। ১৮২০ সালের দিকে এঙ্গেলম্যান শিরোনামহীনভাবে শুধু মোনালিসার মাথার অংশ খোদাই করে প্রিন্ট তৈরি করেন। ১৮২৪ সালে এর কপি করেন দব্রে-লার্কোং, ১৮৪০ সালে হার্মান আইখেন এবং এমন আরো অনেকে মোনালিসা কপি করার চেষ্টা করেছেন। ১৮৩৮ সালে কালামাস্ত্রা স্বয়ং মোনালিসার কপি করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।*

তো লিওনার্দোর আঁকা একটি ছবির খোদাইর কাজ শেষ করতে কালামাস্ত্রার বিশ বছর সময় লেগে গিয়েছিলো। শিল্প সমালোচক ব্রাঁ এ বিষয়ে লিখেছেন : 'কিছু কাজ আছে যা নিয়ে শিল্পী তাঁর কর্মযজ্ঞ চালাতে পারেন কেবল ভালো একটি দিনেই। পরম বিতর্কভাবাদী লিওনার্দো এ ছবিটা নিয়ে কাজ করে গেছেন কিন্তু কখনও সম্বুট হতে পারেন নি। কালামাস্ত্রাও তাঁরই পদাংক অনুসরণ করেছিলেন।'

শিল্পসমালোচক ব্রাঁ ছিলেন কালামাস্ত্রার ছাত্র। হয়তো শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তিনি নতুন আরেকটি খোদাইকৃত অনুলিপি তৈরি করেন। তিনি স্মৃতিচারণমূলক লেখায় কালামাস্ত্রার জনাকীর্ণ স্টুডিও এবং বুদ্ধিজীবীদের নিত্য আগমনের কথাও বর্ণনা করেছেন : 'যে কেউ দেখতে পাবে জর্জ স্যাভকে চপিনের সাথে, 'পোলিশ টানে ফিস্ফাস্' করে কথা বলছে', ইংগ্রেস এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে। তাঁর স্টুডিওতে ঢোকান মুখেই চোখে পড়তো মোনালিসার ড্রয়িং। কালামাস্ত্রা এবং তার প্রধানসহকারির চিত্রকর্মের উপরে ওই ড্রইং শোভা পেতো। দর্শনাধীদেব প্রথমেই বিমোহিত করতো ওটা :

আধো আলো ছায়ায় ঢেকে থাকে রহস্য, এই মনোহর মুখখানি, অচঞ্চল আর অহংকারী, তা থেকে খুব কমই উদ্বেজনা প্রবাহিত হয়, এতে রয়েছে সূক্ষ্ম হাসি, বিক্ষিপ্তভাবে অস্তিত্ব কিছু দিকে এটা আমাদেরকে তুলিয়ে রাখে তার চিরন্তন ইন্দ্রিয়পরায়ণ চাহনি দিয়ে।*

সর্বত্র ছিলো মোনালিসার জাদু। এটা ছিলো এক অবিশ্বরণীয় শিল্পকর্ম এবং ব্রাঁ-এর স্মৃতিগান পরবর্তীতে রোমান্টিক কবিদের উপরেও প্রভাব ফেলে। তখন থেকেই এক হাস্যোজ্জ্বল সাধারণ গৃহিণী অসাধারণ এক রহস্যময়ী হয়ে উঠতে থাকে। এজন্যে দরকার হয়েছিলো নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নতুন একটি প্রেক্ষাপট : *femme fatale*-এর উদ্ভাবন।*

উনিশ শতকের আগে নারীর নেতৃত্বের ব্যাপারটি ছিলো একেবারেই দুর্লভ। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এবং রূপকথার দেখা যায় নারীরা পুরুষদের সাহায্যে পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষদের বিপর্যয়গামী করার জন্য বিভিন্ন হুলাকলার আশ্রয় নিয়েছে।*

কিন্তু এই সমস্ত সুন্দরী রমণীরা কদাচিৎ রূপ এবং চরকের হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। রাজা ও রাজপুত্রদের ভয়ে তাদের বিনয়ী হয়ে থাকতে দেখা যেতো। হয়তো কোনো উপলক্ষ ও উদ্দেশ্যে তাদের হস্তবাহীনার মতো কাজ করেছে। শরতানের প্রতিনিধিত্বপূর্ণ কোনো চরিত্রের চিত্রায়ন ছাড়া কোনো পৌরাণিক কাহিনীতে নারীকে রূঢ় ও ভয়ংকর হতে দেখা যায় নি। জর্জ কুজিনের *Eva prima Pandora* শীর্ষক তৈলচিত্রে দেখা যায় একটি মানুষের কাটা মাথা, একটি আপেলের ডাল, প্যানডোরার বাসর এবং বিশাল একটি সাপের পাশে অনুভূতিহীন এক নারী।*

রোমান্টিক সাহিত্যে নারীর রূঢ়তা ও রূপতা প্রকাশ পায়, সে পৌরাণিকভাবেই হোক বা সাহিত্যিকভাবেই হোক রোমান্টিক মূর্খে আমরা পাই মিডিয়া, ফ্রিগেস অথবা স্বামী স্যামসনকে বিপর্যয়গামী করেছিলো যে সেই ডেলাইলাকে। সর্বোপরি আমরা পেয়েছি সালোমকে, তার কাজে মাথা দেয়ার জন্য স্বামী জন দ্য ব্যান্ডিস্টকে যে নিরোয়েমস করেছিলো। এই চরিত্রটি ওস্তাত মরোক (Salom dausant devant Herode, ১৮৭৬) শীর্ষক তৈলচিত্রটি আঁকতে অনুপ্রাণিত করেছিলো। ওস্তাত মরোর পল 'Herodeas' প্রতিহিংসাপরায়ণ আরেকটি নারী চরিত্র নিয়ে লেখা হয় যেখানে কন্যার চেয়ে মরোর নৃশংসতা বেশি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অন্য দুটো ঐতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক চরিত্র হলো হেলেন এবং ক্রিওপেট্রা, যাদের কেন্দ্র করেই রোমান সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো। এছাড়া রয়েছে আরো দুটো ভয়ানক চরিত্র, একজন স্ত্রী ক্রুডিয়াসের বৌবোনন্ত যুনি স্ত্রী মোনালিসা এবং অন্যজন লুক্রেজিয়া বর্জিয়া, যে তার প্রেমিককে বিষ পান করিয়ে হত্যা করে।

মধ্যযুগীয় লেখকদের লেখায় যে সব নারী চরিত্রকে ভয়ংকরী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে দেখানো হয়েছে যে তারা শরতানের দূত, চেহারা কদাকার ও শরতানসুলভ, তারা শহর-নগর ধ্বংস করেছে, তাদের বিশ্বাস্যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সমস্ত জনপদ।* পর্গন এদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু উনিশ শতকের নেতিবাচক নারীচরিত্রগুলো তাদের মতো নয়, এ সময় রূপ রূঢ় চরিত্রের নারীদের সুন্দরী হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সব সুন্দরীদের ধ্বংসাত্মক সৌন্দর্যের শিকার হয়ে পুরুষদের নিঃশেষ হতে হয়েছে।

এই সৌন্দর্যের মোহে অন্ধ ও পাগল হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে বহু পুরুষ । লিওনার্দোর সমসাময়িক শিল্পী ও লেখক লোদোভিকো আরিস্তো তাঁর *l'orlando Furioso* নামক উপন্যাসে এই অন্ধ ভালোবাসাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন । অবশ্য তাঁর এ অভিনন্দন ছিলো ব্যঙ্গাত্মক, কারণ অধিকাংশ লেখায় এ বিষয়টি এতোবার এসেছে যে, এক সময় ভয়ংকর সৌন্দর্যের ধ্বংসাত্মক ব্যাপারটি যেনো প্রতিষ্ঠাই পেয়ে গিয়েছিলো । কিন্তু আরিস্তোর যেসব নারীচরিত্রের প্রেমে তার নায়ক চরিত্রগুলো অন্ধ হয়েছে তারা সবাই ছিলো নির্দোষ । ভুল মানুষ ও ভুল ক্ষেত্রে ঈর্ষাপরায়ণা থেকেই তার পুরুষ চরিত্রের উন্মত্ততা সৃষ্টি হয় । ওখেলো নাটকের ডেসডিমোনার মতোই তাঁর অ্যানজেলিকা চরিত্রটিও নির্দোষ ও নিষ্পাপ । সাহিত্যের সুখী ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে অন্য পুরুষ শ্রেণী । ঈর্ষাকাতর স্বামী, একগুঁয়ে পিতা, নিষ্ঠুর রাজা, স্বার্থপর অভিভাবক অথবা কোনো অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বীর কারণেই সমস্ত অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে । কাহিনীগুলোতে দেখা যায়, সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ভালোবাসারই জয় হয় এবং কাহিনীর একটি সুন্দর সমাপ্তি ঘটে । সুন্দরী রমণীটি যাকে ভালোবাসে সেই পুরুষটির সঙ্গে অবশেষে তার মিলন হয় ।

সে সময়ের অধিকাংশ কাহিনীর নারী চরিত্রকে দেখা যায় হয়তো কোনো বেশ্যা কিংবা সাধ্বী হিসেবে । কিন্তু তখনও ক্ষমতাসীন ও প্রভাবশালী নারী ছিলো, ছিলো বুদ্ধিমত্তি, শিক্ষিত, কামাতুর, ধার্মিক নারীও । তবে তখনকার সাহিত্যে তাদের চরিত্রের সেইসব দিক একেবারেই অনুজ্জ্বল রয়ে যায় ।^১

১৫০০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তাতে নির্বিচারে ব্যাভিচারে লিপ্ত বেশ্যাসুলভ নারীদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে একের পর এক । কিন্তু এই চরিত্রগুলো নৃশংস ছিলো না । ফার্নান্দো দে বোজোয়ার *La celestina* (১৫১৯), গ্রিমেশাউনের *Courashe* (১৬৭০), ডিফোর *Moll Flanders* (১৭২২), প্রিভোস্তের *Manon Lescaut* (১৭৩১), এবং জন ফিল্যান্ডের *Fanny Hill* (১৭৭৪) উপন্যাসে এ ধরনের চরিত্র অঙ্কন করা হয়েছে ।^২

জ্যাকোবিন নাটকে নারী চরিত্রগুলো নোংরা প্রকৃতির—নোংরা পুরুষের পাশাপাশি তারাও হত্যা ও নষ্ট খেলায় মেতে ওঠে । গোথিক উপন্যাসে ইংরেজ লেখকদের লেখায় প্রবল কামাতুর ও দুষ্টচরিত্রা নারী দেখা যায় । তবে তাদের বেশির ভাগকেই দেখানো হয়েছে ইতালি অথবা প্রাচ্যের নারী হিসেবে ।

তাদের কেউ কেউ উনিশ শতকের *Femme Fatal*, কিন্তু তারপরও তারা প্রতিষ্ঠিত কোনো টাইপ হতে পারে নি ।^৩ সাহিত্যে ওটিকয়েক *Femme*

Fatal নির্দিষ্ট ছাঁচ তৈরি করার জন্যে যথেষ্ট ছিলো না। এর জন্যে প্রয়োজন ছিলো বিরামহীনভাবে অনুকরণ এবং পুনঃউৎপাদনের, গ্রহণযোগ্য সংখ্যক লোকের কাছে পৌঁছানো অবধি। উপন্যাসের পর উপন্যাস আর নাটকের পর নাটকে বর্ণনা এবং চরিত্রের উপস্থিতির মধ্যেই কেবল জনগনের মনে *Femme Fatal* প্রোথিত হতে পারে। তারপরই কেবল তাকে মুহূর্তেই চেনা সম্ভব হবে। কিন্তু এ ধরনের সাহিত্যরীতি গড়ে ওঠার জন্যে অনেক সময়ের প্রয়োজন। উনিশ শতকে এসে ইংরেজি ভাষায় *Seductress* শব্দটি যুক্ত হয়। এর আগে শেক্সপিয়ার *Seductress*-এর পুংলিঙ্গ হিসেবে *Seducer* শব্দটি ব্যবহার করায় এ শব্দটির উৎপত্তি হয়।

উনিশ শতকের কাহিনীতে দূর্বল, কমণীয়, যৌনভীত নারীর প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে। এই শতকের মাঝামাঝিতে এসে এ প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠে। ১৮৬০ সালে বিখ্যাত *Journal* পত্রিকায় যোগ দেয়ার পর এডমুন্ড ও জুল মিশেল দ্য গনকোর্ট অ্যাডোল্ফ ডেনারির সালাঁয়া পরিদর্শন করেন এবং সেখানে তাঁর রক্ষিতার বর্ণনা দেন এভাবে :

সব নারীই রহস্যময়ী, কিন্তু সে হলো তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রহস্যময়...ষোড়শ শতাব্দীর সভা সুন্দরীর মতো তার কেবলই রয়েছে জৈবিক তাড়না, কোনো নিয়মরীতি নেই। সে পরে আছে ছদ্মবেশি মুখোশ, হাসিটি গিণ্ডকোন্দার রাতের পরিপূর্ণতা।

কেউ কখনও জানতে পারবে না সে তোমার সাথে ঘুমাতে চায় নাকি ঠাট্টা করতে চায়।^{১২} কিন্তু এর পরই এই সব বিখ্যাত ভায়েরা জাগতিকভাবেই সব নারীকে ভয় পায়। এমনকি তাদের অনুগত কাজের মেয়েদেরকেও।^{১৩} ঠিক একইভাবে সাহিত্য সমালোচক সেন্ট বিগ্গভও নারীকে *angelic* ও *diabolic* এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। *Volupte* (১৮৩৪) নামের উপন্যাসে উল্লেখকৃত এক চিঠিতে তিনি লেখেন :

আমি আমার কামনার গহীনে ঝুঁজে পেয়েছি ভয় আর আকাঙ্ক্ষা আসলে এক ধরনের সৌন্দর্য, আমার মতো এক ধরনের মরণঘাতি প্রলোভন...আমি আরো ছেনেছি, এই সৌন্দর্য সত্যি নয়, এটা আত্মার শত্রু, এটা খুন করে, ধ্বংস করে...^{১৪}

নারীসুলভ নিষ্ঠুরতার সাফল্যের জন্যেই এ উপন্যাস সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছিলো। এটা পুরুষ পাঠকদের আকৃষ্ট করেছিলো, কারণ পুরুষের 'এক মুহূর্তের পাগলামীর' সুযোগ গ্রহণ করে যেসব নারী তাদের বিপথগামী করে সে-ই *Seductress* বা হরণকারী। এ উপন্যাসে সমালোচনা করা হয়েছে অন্যদিকে গুণবতী ও সতী বলে দাবি করা স্ত্রী'রা মনে করলো, তাদের প্রতি তাদের স্বামীদের আরো বেশি অনুরক্ত করবে এই উপন্যাসটি এবং তাদের কাছ থেকে কুলটা নারীদের দূরে ঠেলে দিতেও সাহায্য করবে—যারা কেবল যৌনতা পছন্দ করে।

femme fatale বা নারীসুলভ নিষ্ঠুরতাসম্পন্ন চরিত্রগুলো অন্যান্য উপন্যাসের চরিত্রের মতোই ছিলো সামাজিকভাবে নিম্নবর্গের। সাধারণ নারী চরিত্রগুলো সাধারণ ও ভদ্রোচিত এবং নিষ্ঠুরতাবর্জিত ছিলো। অন্যান্য শতাব্দীর মতো ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী চরিত্রগুলোর কাছে পাঠক আত্মত্যাগ ও সরলতা আশা করেছিলো। রাসকিনের এই উক্তি, 'একটি পবিত্র জায়গা, মন্দিরের নির্জন কক্ষ, হৃদয়ের মন্দির, গৃহস্থালী ঈশ্বর কর্তৃক যা নজরদারী করা হয়' অনুসারে ঘরের মেয়েরা ঘরে থাকবে এমনটাই প্রত্যাশা ছিলো পাঠকের।^{১৫}

কিন্তু বিশেষ করে ফ্রান্সের বহু উপন্যাসের নায়িকাকে দায়িত্বশীল কন্যা, পতিভক্ত স্ত্রী অথবা স্নেহময়ী মা হিসেবে পাওয়া যায় নি। যৌনতাড়িত ও কামুক নারীই ফরাসি কবিদের মূল আকর্ষণের বিষয় ছিলো। এই কবিদের মধ্যে শার্ল বোদলেয়ারকে বৃটেনে উল্লেখ করা হতো মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির জন্যে। এজন্যে তিনি অ্যালগানন সুইনবার্নেদের কাছে আরো বেশি সমাদৃত হয়ে ওঠেন, যাঁরা ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যকে বিচার করেছেন অসহনীয় পিউরিট্যানিক্যাল বা বিপ্লববাদী সাহিত্য হিসেবে।

বিবাহ-বিরোধী, দুঃখবাদী, ক্ষমতানুরাগী এবং নমনীয় ও যৌনাচারী নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিলো বোদলেয়ারের কবিতায়। ১৮৫৬ সালে সৌন্দর্যের আদর্শ হিসেবে তিনি লিখেছেন :

মনোহরগী এবং সুন্দর একটি মুখায়ব, একজন নারীর
মুখায়ব, যে মুখায়ব একজনের দুঃখ আর কামনার স্বপ্ন
হতে পারে, তাতে জড়িয়ে রয়েছে দুঃখ-বিষাদের
আবেশ, ক্রান্তি, এমনকি বিরক্তি, আবার যা এর
বিপরীত: বাঁচার জন্য সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা।^{১৬}

অন্যদিকে *Ideal* কবিতায় তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এভাবে :

এই সব দেহসর্বস্ব সৌন্দর্য তন্দ্ৰাচ্ছন্ন শতাব্দীর সৃষ্টি সমূহকে নষ্ট ক'রে ফেলেছে...রক্তাশ্রু নারীদের কবি গ্যাভার্নিকে তাঁর সুন্দরীদেরকে আলতো স্পর্শ করতে দাও...আমার হৃদয়ের জন্য আমার কী দরকার, গভীর সমুদ্রের মতো, তুমি, লেডি ম্যাকবেথ, অন্যায়ের জন্যে উৎসর্গীকৃত এক আত্মা...

তাঁর এক কবিতায় তিনি তাঁর রক্ষিতাকে বলছেন 'আমি কামনা করি, ওহে অপ্রশম্য আর নিষ্ঠুর জানোয়ার, এমনকি এই শীতল ঘৃণ্য, যা তোমাকে আমার কাছে আরো বেশি সুন্দর ক'রে তুলেছে।' তাঁর 'লে ফেয়ার' কবিতাটি অতীতের মহান চিত্রশিল্পীদেরকে উৎসর্গ করা হয়েছে, সেটা মোনালিসা'কে ইঙ্গিত করে। লিওনার্দো উপরে লেখা এক অধ্যায়ে বোদলেয়ার এক অদ্ভুত ভূ-দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে চমৎকার মিষ্টি হাসির বর্ণনা দিয়েছেন :

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি গভীর বিষন্ন এক আয়না, যেখানে সুন্দরী পরীদের মিষ্টি হাসিতে ঝরে পড়ে রহস্য, তারা আবির্ভূত হয় হিমবাহের ছায়ার নিচে আর দেবদারু গাছ থাকে তাদের রাজত্বে জুড়ে।

সৌন্দর্য এবং রহস্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করাটা গতানুগতিক একটি ব্যাপার। থিওফাইল গতিয়ের'র ১৮৫২ সালের *Caeruli Oculi* কবিতাটি ঠিক এ ধরনেরই :

এক রহস্যময়ী নারী, যার সৌন্দর্য আমার চেতনাকে বিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে, দাঁড়িয়ে থাকে নিরবে, এলোমেলো তরঙ্গে।^{১৭}

এগুলো পুরুষের সার্বজনীন ফ্যান্টাসি, বিশেষ ক'রে যুবকদের। ফ্লবার্ট তাঁর প্রথমদিককার এক লেখা নভেম্বর-এ এমন এক যৌনতারিত যুবকের কথা বর্ণনা করেছেন যে সারাক্ষণ কল্পনা করে ক্রিপেট্টোর সাথে এক প্রাচীন গলি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।^{১৮}

শতাব্দীর শেষে *Femme Fatal*-এর বন্ধমূল ধারণাটি খুব ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যা খুব একটা অবাক করার মতো কিছু ছিলো না। প্রখ্যাত

ইতালিয় সাহিত্য সমালোচক মারিও পাজ দাবি করেন সালোয়ার কতিপয় মহিলার রহস্যময় আর উদ্ভেজক পোশাক দেখে।^{১৯} পুরুষেরাও একই রীতি অনুসরণ করেছিলো। ১৮৯৮ সালে ঔপন্যাসিক জুল রেনার্ডের দৃদর্শ্যগ্রস্ত শৈশবের কথা বিবৃত হওয়া *Poil de Carote* গ্রন্থের এক জায়গায় একটি চরিত্র বলে, 'তারা বলে লিওনার্দো এটার ওপরে চার বছর ধরে কাজ করেছিলেন। আর রেবেলের তো লেগেছে সারা জীবন'।^{২০}

আরসিন হুসে তাঁর এক স্মৃতি কথায় রাজকুমারী বেলগিওজোসোর হাসিকে বর্ণনা করেছেন 'অচঞ্চল গিওকোন্দার বিস্তৃত মাস্টারপিস' হিসেবে।^{২১} কাস্তিলো'র কাউন্টেস আরেকজন জোকোন্দোর স্ক্যাপা ভক্ত, ১৮৫৬-৬৫ এবং ১৮৯৫-৯৮ সালের মধ্যে চারশত ছবি তুলেছিলেন অতি উদ্ভেজক পোশাক পড়ে : নিজের ব্যক্তিত্বকে ইচ্ছাকৃতভাবে যৌনতার বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি (২৮ নং ছবিটি দেখুন)।^{২২}

Femme Fatal-এর ইমেজের ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকলে বৈচিত্র্যতার পরিধিও বিস্তৃত হতে থাকে, ব্যবহৃত হতে থাকে লেখক, চিত্রকর আর বিংশ শতাব্দীর চলচ্চিত্রেও। জুল বার্বৈই দাউরেভেল্লি তাঁর ছোটো গল্পে একগাদা নষ্টা-ভ্রষ্টা নারীকে তুলে ধরেছিলেন : 'এখানে একজনও নয়,' তিনি ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'যাদেরকে বিস্তৃত, গুণবতী এবং নিষ্পাপ বলা যায়'।^{২৩} এমিল জোলা'র *Nana* (১৮৮০)-তে নায়িকা না স্ক্যাপাটে না রহস্যময়ী, সে পুরুষের কামনার আশুন জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের সর্বনাশ করে। নানা মৃত্যুবরণ করে গুটিবসন্তের মহামারি আর ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের প্রাক্কালে (২৯ নং ছবিটি দেখুন)। জোলা তাঁর প্রকৃতিবাদ দিয়ে নানাকে রূপান্তরিত করেছেন একজন প্রলুব্ধকারিণী হিসেবে, বস্তি থেকে আর্বিভূত হওয়া এক 'সোনালি মাছি' শোষিত শ্রেণীর হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্যে নিজের অপ্রতিরোধ্য যৌনতাকে ব্যবহার করে বুর্জোয়াদের ধ্বংস করে সে। ফ্রাঙ্ক ওয়েদেকিনের লুলু'র সাথে তার কোনো পার্থক্য নেই। ১৮৮৪ সালের জরিস কার্ল জোলা'র প্রকৃতিবাদ থেকে বেড়িয়ে এসেছিলেন তাঁর *A Rebours* উপন্যাসে। কিন্তু তিনিও *Femme Fatal* থেকে বেড় হয়ে আসতে পারেন নি।

ধ্বংসাতীত কামনার প্রতীকি দেবী, অমর হিস্টেরিয়ার
ঈশ্বরী, নিখুঁত সৌন্দর্য...দানবীয় এক পণ্ড, নির্বিকার,
দায়িত্বজ্ঞানহীন, ভোতা অনুভূতির, পুরাণের হেলেনের
মতো যারা তাকে অবলোকন করে আর সে যা স্পর্শ
করে তার সব কিছুকেই দূষিত করে সে।^{২৪}

এই রীতিটা *Femme Fatal* মিথের সবচাইতে প্রভাবশালী ব্যাখ্যাকার থিওফাইল গতিয়ের কর্তৃক অগ্রগণ্য হয়েছে (১৮১১-৭২)। গতিয়ের মোনালিসা'র রহস্যময়তা আর অদ্ভুত হাসির প্রধান স্থপতিও বটে। এইভাবে নতুন অবস্থানে—কেউ হয়তো বলতেই পারে 'রি ব্র্যাণ্ডেড' করা—মোনালিসা'কে বিখ্যাত করেছে। আর সেজন্যে গতিয়েরকেই কৃতিত্ব দেয়া যেতে পারে। প্রকারান্তরে 'হাসি' আর মোনালিসা এমন গভীরভাবে জড়িয়ে যায় যে, এ দুটোকে আলাদা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। আজকের দিনে যখন লোকজন মোনালিসা'র রহস্যময় হাসি নিয়ে মন্তব্য করে তখন তারা আসলে মধ্য উনিশ শতকের গতিয়ের এবং তাঁর বৃন্তের লোকজনদের কথাই প্রতিধ্বনি করে মাত্র : ১৯৫৬ সালে যখন তরুণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ লুভর পরিদর্শন করেন এবং দীর্ঘক্ষণ সেটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিরবে, তার পর তিনি উচ্চারণ করেছিলেন 'রহস্যময়ী' শব্দটি।^{২৫}

মোনালিসা'র *Femme Fatal* হিসেবে রূপান্তর হওয়াটা বাধ্যতামূলক ছিলো। *Revue des deux mondes*-এর গুস্তাভ প্রাঁশে কোনো ধরনের ফ্যান্টাসি ছাড়াই সুন্দর আর অভিজাত ব'লে অভিহিত করেছিলেন ১৮৫০সালে।^{২৬} অবশ্য প্রাঁশে'র কাছে আরো প্রার্থীও ছিলো। তাঁর আসলে সবচাইতে প্রিয় ছিলো উফিজিঙ্কে রাখা লিওনার্দো'র মেডুসা—বাস্তবে, এটা হলো সপ্তদশ শতকের ফ্রেমিশদের আঁকা যা ভুল ক'রে লিওনার্দো'র ছবি মনে করা হতো। প্রাঁশে শেলি'র *On the Medusa by Leonardo da Vinci in the Florentine Gallery* কবিতার উপর ভিত্তি করেই এই ধারণার বশবর্তী হয়েছিলেন। যা ফ্রান্সে জনপ্রিয় হতে সাহায্য করেছিলো।

মোনালিসা'র প্রয়োজন ছিলো একজন বিখ্যাত লেখকের, অনেকটা গতিয়ের'র মতো। তিনি ছিলেন সফলতম উপন্যাস মাদামোয়াজ্জেল দ্য মর্পিয়া, লো ক্যাপিতেইন ফ্রাঁসোয়া নামক ভ্রমণ কাহিনী এবং কবিতা গ্রন্থের লেখক। তাঁর কবিতা অনেক বিখ্যাত সুরকারের নজর কেড়েছিলো—যাঁরা সেগুলোকে গানে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁর ৪৭৬টি কবিতায় সুর দেয়া হয়েছিলো, গান হিসেবে সেগুলো সমাদৃতও হয়েছিলো।

বোদলেয়ার তাঁর *Fleur du mal* গতিয়েরকে উৎসর্গ করেছিলেন : 'বিশুদ্ধ কবি, ফরাসি সাহিত্যের যথার্থ জাদুকর'কে। ১৮৭৩ সালে গতিয়েরের মৃত্যুর এক বছর বাদে তাঁর স্মরণে একটি স্মরণিকা বের হয় যেখানে খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ যেমন ভিক্টর হুগো, মালার্মে এবং সুইনবার্নের কবিতা ছিলো।

গতিয়ের নিজেও উনিশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি চারুকলায় পড়েছিলেন শিল্পী হবার জন্য, কিন্তু খুব শীঘ্রই সাহিত্যের

দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি। তাঁর লেখনীতে খুব শক্তিশালীভাবেই চিত্রকল্পের ছোঁয়া পাওয়া যায়। ১৮৫৬ সালে তিনি *l'Artiste* পত্রিকার সম্পাদক হোন। এই শিল্প বিষয়ক ম্যাগাজিনটি আরসিন হুসে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তিনি ছিলেন লিওনার্দো'র একনিষ্ঠ ভক্ত। সেই পত্রিকায় বাৎসরিক চিত্রকলা বিষয়ক নিবন্ধে গতিয়ের ধারাবাহ্য বেশ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলো : 'তাঁর প্রশংসা একটি চিত্রকর্ম বিক্রি হবার জন্য যথেষ্ট...' তাঁর প্রথম জীবনিকার ম্যাক্সিম দুকাম্প লিখেছিলেন, 'এমন কোনো চিত্রকর, লেখক, ভাস্কর, অভিনেতা ছিলেন না যারা তাঁর কাছে আনুকূল্য লাভের জন্য লেখেন নি।'^{১৭} ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত গতিয়ের এক হাজারেরও বেশি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং সেগুলোর বেশির ভাগই শিল্পকলার উপরে আর প্রকাশিত হয়েছিলো এমিল গিরার্ডিনির বহুল প্রচারিত দৈনিক *La Presse* পত্রিকায়। শিক্ষিত অভিজাতরা এই পত্রিকাটা শ্রদ্ধাভরে পড়তেন।^{১৮} গতিয়ের ছিলেন প্যারিস তথা ইউরোপিয় সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যমণি। এই জন্যে তিনি নুভোয়া রিচেস, মানে অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া লোকজন এবং তরুণ লেখকদের রুচির উপরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি একজন শিল্প সমালোচক হিসেবে প্রায় বিস্মৃত, এটা অবশ্য বোদলেয়ারের ক্ষেত্রে ঘটে নি, জীবিতকালে তিনি এতো জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁর একটি প্রশংসার কারণে ইংল্যান্ডের একটি ছবি তিন হাজারেরও বেশি দর্শনার্থীর আগমন ঘটতে পেরেছিলো।^{১৯}

গতিয়ের ছিলেন শিল্পের জন্য শিল্প মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম, যার রূপরেখা তাঁর বহুল বিতর্কিত *মাদামোয়াজ্জেল দ্য মঁপিয়া*তে বর্ণিত রয়েছে। এটা তাঁর যৌন উদ্ভিগ্নতা বিষয়ক একটি উপন্যাস। তাঁর গল্প এবং কবিতায় বিরামহীনভাবে চিত্রকর এবং চিত্রকলা উঠে এসেছে। তাঁর লেখার বর্ণনায় চিত্রকল্পের উপস্থিতি তীব্রভাবে ফুঁটে উঠেছে। উনিশ শতকের অন্যান্য শিল্প সমালোচক যেমন ওয়াল্টার প্যাটারের মতো গতিয়েরও মূলত একটি চিত্রকর্ম তাঁর মুক্ত স্বাধীন চিন্তার ওপরে কী প্রভাব ফেলে সেটাই বিবেচনা করতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী মাথামোটা আর অশিক্ষিত পাঠকের জন্যে ছিলো না, যদিও তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন।

গতিয়ের পোট্রেট পেইন্টিংকে নিম্নমানের শিল্পকর্ম বলে মনে করতেন, যদিও এটা সত্য যে, এর মধ্য দিয়েই 'বুর্জোয়া জীবনে শিল্পের অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো।'^{২০} এর মাধ্যমেও একটি অবয়বের পেছনের ব্যক্তিটাকে ফুটিয়ে তোলা যায়।^{২১} লিওনার্দোও ঠিক একই মনোভাব পোষণ করতেন, তিনি

লিখেছিলেন 'একজন ভালো চিত্রকর দুটো প্রধান বিষয় আঁকেন, বলা যেতে পারে মানুষ এবং তার মনোভাব। প্রথমটি সহজ, দ্বিতীয়টি খুব কঠিন।'^{৯২}

গতিয়ের তাঁর শিল্প সমালোচনাকে নিজের গল্প আর কবিতার চেয়ে আলাদা কিছু ভাবতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন লেখকেরা হলেন সবচাইতে ভালো শিল্প সমালোচক। তাঁদের কাজ হলো আপাত অদৃশ্যতাকে আবিষ্কার করা, তখনও অপরিচিত এবং মাস্টার হয়ে ওঠেন নি এমন কাউকে খুঁজে বের করা। এই দৃষ্টিভঙ্গীটা উনিশ শতকে বহুল প্রচারিত ছিলো। পরবর্তীকালে শিল্প সমালোচনা একটি গুরুগম্ভীর একাডেমিক বিষয় হয়ে ওঠে, এজন্যে জার্মানভাষী বুদ্ধিজীবীরা ধন্যবাদ পেতে পারে। পরবর্তীতে এই মত দৃঢ় হয় যে, শিল্প বোঝা এবং ব্যাখ্যা করার কাজটি অন্য কোনো একাডেমিকদের কাজ নয়, নেটা শিল্পী নিজেই করতে পারেন। বোধগম্য কারণেই এই দৃষ্টিভঙ্গী যদিও ব্যাপকভাবে সমাদৃত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এর প্রচলন নেই।^{৯৩}

থিওফাইল গতিয়ের মোনালিসা'র মধ্যে তাঁর নিজের মনোজগতের ফ্যান্টাসিকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর রচনাতে বিরামহীনভাবে রান্ধুসি এবং যৌন উত্তেজক নারীর বর্ণনা দিয়েছেন—*Femme Fatal, belle dame sans merci* ধরনের নারীদের সাথে প্রেমে পড়াটা খুবই বিপজ্জনক। গতিয়ের প্রথা অনুযায়ীই তাঁর নারী চরিত্রগুলো পুরাণ থেকে নিয়েছেন—ক্রিওপেট্রা, ট্রয়ের হেলেন এবং 'অন্যান্য অন্ধকার আর রহস্যময় নারীরা'।^{৯৪} তাঁর লোভাতুর নারীরা যথারীতি দক্ষিণ থেকে এসেছে : ইতালিয়, ইহুদি, জিপ্সি অথবা প্রাচ্যদেশীয়। *Femme Fatal* আসলে আরেক ধরনের সুপরিচিত ছাঁচেরই অংশ : শীতল, নমনীয় এবং সম্ভবত কামশীতলহীন সোনালি চুলের নারীর সাথে দক্ষিণের ইন্দ্রিয়পরায়ণা, যৌনাবেদনময়ী, কামুক কৃষ্ণ-বর্ণের বৈচিত্রপূর্ণ ভূমধ্যসাগরীয় নারীর সংমিশ্রণ।

গতিয়েরের মোহগ্রস্ততা কেবল তাঁর গল্প, উপন্যাস আর ছোটো গল্পেই পাওয়া যায় এরকমটি আশা করা যায় না বরং তাঁর প্রবন্ধ এবং রিভিউতেও সেটা দেখা যায়। ১৮৫১ সালের মে মাসে স্পেনের থিয়েটার জিমনেসি'তে পেটরা কামারা নামক এক ব্যালে নর্তকীর নাচ দেখে অভিভূত হয়ে তিনি লিখেছিলেন যে, কামারা চার্লস নদিয়ারের (১৭৮০-১৮৪৪) একটি উপন্যাসের মূল চরিত্র আইনেস দ্য লা সিয়েরা'র পুনর্জন্ম, যার গল্প যৌনতা আর আধ্যাত্মিকতার জন্য জনপ্রিয় ছিলো। আইনেস দ্য লা সিয়েরা তিন শত বছর আগে মারা যাওয়া এক নর্তকীর আত্মা, যে পুনরায় আবিভূত হয়েছে তার সাবেক প্রেমিক এবং খুনিকে পাকড়াও করার জন্যে। এক বছর বাদেই

গতিয়ের 'আইনেস দ্য লা সিয়েরা' নামে তাঁর একটি কবিতা উৎসর্গ করেন এই নর্তকীকে।^{১০} মৃত নারীর আত্মা প্রেম এবং আকাঙ্ক্ষার জন্য বার বার ফিরে আসছে, এরকম থিম গল্প এবং কবিতায় শত শত বছর ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

তাঁর কিছু গল্পে প্রধান পুরুষ চরিত্রটি প্রায়শই এমন একটি নারীর প্রেমে পড়ে যে কিনা আসলে কোনো মূর্তি অথবা ছবি। *Le Roman de momie* (১৮৫৮)-তে এক ইংরেজ অভিজাত লর্ড ইভানডেল তিন হাজার বছর ধরে সংরক্ষণ করে রাখা এক মমির প্রেমে পড়ে যান। গতিয়ের যাকে 'অসম্ভব প্রেম' বলে অভিহিত করেছিলেন।^{১১} *Arria Marcella : Souvenir de pompeii* (১৮৫২)-তে লাভায় এক জোড়া সুন্দর স্তন সংরক্ষিত থাকে আর সেটা খুঁজে পায় দেখতে অপূর্ব এক অষ্টোভিয়ান যুবক। সে ঐ স্তনের প্রতি যৌনকাতর হয়ে পড়ে : অগ্ন্যুপাতের ফলে 'এক জোড়া স্তন শত শত বছর ধরে সংরক্ষিত হয়ে ছিলো, ইত্যবসরে কতো রাজ্য বিনাশ হয়ে গেছে তার হিসেব নেই'।^{১২} যুবকের কামনায় মার্সেলা জীবন্ত হয়ে ওঠে : 'একজন কেবল তখনই সত্যিকারভাবে মৃত হয়ে যায়,' মেয়েটি বলে, 'যখন কেউ তাকে ভালোবাসে না'। সে তার পাগান মন্ত্রে অষ্টোভিয়ানকে জাদু করে এবং নিজের বিতর্কবাদী বাবার নিয়ম ভঙ্গ করে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ধূলোয় মিলিয়ে যায়।

লা মোর্টে আমুরিউজ (১৮৩৬)-এ রমুয়ান্ড যাজক হবার অনুষ্ঠানের সময় এক নারীর দিকে এক ঝলক তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সে প্রলুদ্ধ হয় : 'এই মেয়েটি আমাকে পুরোপুরি পাগল করে ফেলেছে। তার প্রতি আবিষ্ট হওয়ার জন্য এক ঝলক তাকানোই যথেষ্ট। আমি আর আমাতে নেই, কেবল তার জন্যে, তার মধ্যেই'।^{১৩} অনেক দিন বাদে, রমুয়ান্ড তখন একজন যাজক, এক অভিজাত বংশের মৃত্যুপথযাত্রী নারীর পাশে পাশে এসে বসে। সেই নারীটি হলো সুন্দরী রহস্যময়ী এক ইতালিয় কাউন্টেস ক্লারিমন্ডে, ঠিক সেই নারীর মতোই দেখতে যাকে সে একদিন দেখেছিলো। মেয়েটি মারা যায় আর সেও বৃদ্ধ হয়ে গেছে। বিলম্বিত শেষকৃত্যের পরে মেয়েটাকে কবর দেয়া হয়। মেয়েটার সব প্রেমিকই নাকি রহস্যজনকভাবে মারা গেছে, এরকম গুজব আছে। তরুণ যাজকের কামনা এতোটাই প্রবল যে, ক্লারিমন্ডে পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠে। রমুয়ান্ড কোনো বাঁধা দেয় নি, মেয়েটি তাকে ভেনিসে নিয়ে যায়—পাপ আর কৌতূহলের ক্লাসিক এক শহর। সেখানে তারা ভোগবিলাসে জীবন কাটায় গ্র্যান্ড ক্যানালের পাশে সুরম্য এক অট্টালিকায়। দু'জনে উন্মত্ত যৌনতায় মেতে ওঠে। খুব দ্রুতই ক্লারিমন্ডের শরীর ভেঙে পড়তে শুরু করে, বিবর্ণ আর

পাণ্ডুর হয়ে যায় সমস্ত দেহ। কেবলমাত্র রমুয়ান্ডের আঙুল থেকে ঝরে পড়া রক্ত চেটেই সে সেরে ওঠে। আর রমুয়ান্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে সেটা দেখে। ক্লারিমন্ডে আসলে একজন ভ্যাম্পায়ার—সাহিত্যের সবচাইতে প্রথম দিককার ভ্যাম্পায়ারদের একজন। প্রকারভেদে সে বুঝতে পারে, মেয়েটার জন্য সে নির্রাতি এক বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে। তাই রমুয়ান্ড একটি কবর খোঁড়ে যেখানে ক্লারিমন্ডে শায়িত ছিলো। সেখানে সে দেখতে পায় ক্লারিমন্ডে ঘুমিয়ে আছে মার্বেল পাথরে। অসম্ভব সুন্দর লাগছে তাকে। তার চৌটের এ কোণে এক ফোঁটা লাল রক্ত লেগে রয়েছে। পবিত্র পানি ছিটানোর পরে ক্লারিমন্ডে ধূলায় পত্রিণত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। রমুয়ান্ড একটি বার্তা দিয়ে শেষ করে : 'কোনো মেয়ের দিকে কখনও তাকাবে না। মাটির দিকে চেয়ে হাটবে। তুমি যতোই পুত আর পবিত্র হও না কেন, এক মুহূর্তই যথেষ্ট তোমার সব কিছু বিনাশ হবার জন্যে।'

ক্লারিমন্ডের ভেতরে কিছুটা ক্লিওপেট্রা ছিলো। আর ক্লিওপেট্রা পুরো উনিশ শতক জুড়ে একজন ক্লাসিক *Femme Fatal* হিসেবে বিবেচিত হতো। গতিয়ের তাকে তাঁর মাদামোয়াজ্জেল দ্য মর্পিয়ার্গে এক মহাকাব্যিক নায়িকা হিসেবে তুলে ধরেছেন—নিজের নিয়তি নিজেই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে—সে এমন একজন মেয়ে যে প্রেমিকের সাথে সারা রাত কাটিয়ে সকালেই তাকে হত্যা করে : 'ওহ সুতীব্র ইন্দ্রিয়পরায়ণ নারী, কতো ভালোভাবেই না তুমি মানুষের স্বভাবটাকে বুঝতে, আর তোমার বন্যতায় কী যে প্রজ্ঞা ছিলো!'"^{১০০} 'উনে নুইত দ্য ক্লিওপেট্রা'(১৮৪৫) নামক ছোটো গল্পে একঘেয়েমীতে আক্রান্ত রাণী তার প্রেমিককে হত্যা করে। এইসবের একটাই উদ্দেশ্য, একজন *Femme Fatal*-এর সাথে কেউই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে না।

ছবির নারীর সাথে প্রেমে পড়ার আইডিয়াটা একেবারে গতিয়েরের নিজস্ব নয় : এই থিমের দেখা মিলবে মিথলজি আর রূপকথাতে। অভিনব মেটামোরফিস'র আগে নিজের তৈরি শিল্পকর্মের প্রেমে পড়ার ঘটনা নিয়ে কোনো সাহিত্য রচনা করা হয় নি। গৃক ভাস্কর পিগমেলিওন তার নিজের তৈরি ভাস্কর্যের প্রেমে পড়ে যায়। পরে আফ্রোদিতি'র আশীর্বাদে গ্যালাতিয়া নামক মানবীতে পরিণত হয় সেটা।

লিওনার্দো নিজেও এটা বিশ্বাস করতেন যে, একটি চিত্রকর্মের পেমে পড়া যায়। পেইন্টিংয়ের ব্যাপারে তাঁর এক ব্যাখ্যায় তিনি এটা বলেছেনও :

কোনো ছবির প্রেমে পড়ার মানে এই নয় যে, সেই ছবিটা সত্যিকারের কোনো নারীকে প্রতিনিধিত্ব করে।

আগে আমারও এরকমটি হতো, আমার আঁকা কোনো ছবি একজন পছন্দ করে কিনে নিয়ে সেটার সমস্ত স্বর্গীয়তা উপড়ে ফেলে দিতো এবং কোনো ধরনের অপরাধবোধ ছাড়াই ছবিটাতে চুমু খেতো। অবশেষে তার কামনা আর দীর্ঘশ্বাসকে ডিঙিয়ে বিবেক জাগ্রত হলে বাধ্য হয়ে সেটা তার বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলতো সে।^{৪০}

উনিশ শতকের মধ্যেই সৃষ্টি করা ইমেজের বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে এই ধারণাটি সার্বজনীন হয়ে ওঠে। অস্কার ওয়াইল্ডের ডোরিয়ান গ্রে (১৮৯১) কখনও বৃদ্ধ হয় না, কিন্তু তার ছবিটা বৃদ্ধ হয়—তার আত্মারও বয়স বাড়ে। ওফেনবাখের অপেরা দ্য টেলস অব হফম্যান (১৮৮১)-এ যান্ত্রিক পুতুল অলিম্পিয়ার প্রেমে পড়ে যায় হফম্যান। ভার্নন লি'র আমুর দিউর (১৮৮৭)-এ ফস্টের মতো জ্ঞানী স্পিরিডন ট্রপকা অখ্যাত মিডিয়া দা কাপরি'র প্রেমে পড়ে যায়, যার পাঁচ জন সাবেক প্রেমিকের পরিণতি হয়েছিলো হিংসাত্মক ঘটনার মধ্যে, আর তার স্বামী তাকে একটি কনভেন্টে রেখে আসে এই ভয়ে যে, তার অসামান্য সৌন্দর্য তার খুনিদেরকে প্ররোচিত করবে। ঘটনাক্রমে স্পিরিডন, যে কিনা অপার্থিব প্রেমের খোঁজে আছে, সে মিডিয়ার একটি ছবি পেয়ে যায় : 'কী দারুণ ছবি! —ব্রোনজিনোও এরকম ছবি আঁকতে পারতেন না...তাকে দেখে মনে হচ্ছে ফ্রেম থেকে বের হয়ে আসছে। তার ঠোঁটে মৃদু হাসি।' মিডিয়াকে মূর্ত করা হয় এবং সে তাকে একটি শয়তানী চুক্তি করার জন্য অনুরোধ করে; তার প্রেম হবে তার পুরস্কার। স্পিরিডন রাজি হলেও নির্মমভাবে বুকে ছুরিকাঘাত হয়ে মৃত্যুবরণ করে সে।^{৪১}

আধুনিককালে গতিয়েরই হলেন এ ধরনের থিমের অগ্রপথিক। তাঁর লা ক্যাফেতিয়ার (১৮৩১)-এ রাতের বেলায় ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে, তার মধ্যে এ্যাঞ্জেলা নামের সুন্দরী এক নারী ছিলো যার সাথে নায়ক ভোর অবধি প্রেম করে থাকে। তারপরই মেয়েটি উধাও হয়ে যায়, তাকে মোহগ্রস্ত করে রেখে।^{৪২} গতিয়েরের অন্যতর ইগো-তে গাই দ্য মলিভার্ত আয়নাতে স্পিরিতে নামক সুন্দরী এক নারীর ছবি দেখে : 'তার হাসি লিওনার্দো দা ভিঞ্চিরটার মতোই, তারপরও আরো বেশি আন্তরিক আর কম পরিহাসের, তার ঠোঁটে মোহময় আকর্ষণ।'^{৪৩}

গতিয়েরের পেইন্টিং এবং ছবি ছিলো শুণ্ড এক শক্তি : তারা অতীতকে

ধারণ করতো। তাঁর গল্পে প্রায়শই রোম, মিশর এবং গৃসের রহস্যময় আর প্রলুব্ধকর যুগের বর্ণনা থাকতো যা পরবর্তীকালে নেপোলিওনকে সেইসব জায়গার শিল্পকর্ম আর প্রত্নতত্ত্ব হরণ করতে প্ররোচিত করেছিলো। এতে ক'রে প্রাচীন মিশর সম্পর্কে কেবলমাত্র প্যারিসেই উন্মাদনার সৃষ্টি হয় নি বরং তা লন্ডন, রোম, বার্লিন এবং তুরিন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিলো—যেসব শহরে মিশরীয় প্রত্ন নির্দর্শনের প্রধান সংগ্রহ রয়েছে।

ইতালি ছিলো ফরাসি, ইংরেজ এবং জার্মান লেখকদের গল্পের রসদ আহরণের প্রধান চারণভূমি। এটা গৃস এবং মিশরের চেয়ে যেমন খুব কাছের ছিলো আবার বিপদের দিক থেকে দূরবর্তীও ছিলো বলা চলে। একটি দেশের মধ্যে দুটো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপস্থিতি ছিলো : প্রাচীন রোম এবং রেনেসাঁ। গতীয়ের এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন : 'আমাদের মনে হতো আমরা এমন একটি উপন্যাসে পরিভ্রমণ করছি যাতে রয়েছে অ্যান র্যাডক্লিফ, গয়া, পিরানেসি এবং রেমব্রান্ট কর্তৃক অলংকৃত...তিনটি ইনকুইজিশন, দশ জনের এক কাউন্সিল...মুখোশ পরা গুপ্তচর। এক হিমশীতল সন্ত্রাস, ঘন অন্ধকার চারপাশ জুড়ে আর আমাদেরকে সেটা হরণ ক'রে নেয়।' ^{৪৪}

গতীয়ের সবখানেই রহস্যময় আর উচ্ছৃঙ্খল নারী দেখতে পেতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনি যখন হিপোলাইত-জ্যঁ ফ্রান্দারিনের *La jeune fille l'oeillet* (৩০ নম্বর ছবিটি দেখুন) নিয়ে আলোচনা করেছেন তখন তিনি ঘোষণা দিয়েছেন :

তার সৌন্দর্যে অদ্ভুত রহস্যময়তা আর কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা রয়েছে, চোখ দুটোতে স্কিৎস-এর মতো অস্বিষ্ট কিছু আছে, তার সুবিশাল মুখে এঁটে আছে বিশ্বাসঘাতিনীর তচ্ছিল্যপূর্ণ হাসি। তার চিন্তা-ভাবনাসমূহ কি? আর কার সাথেই বা সে ঠাট্টা করছে? এই ছবিটার সামনে, যা নিশ্চিতভাবেই লিওনার্দো দা ভিন্সি'র ক্যানভাস, আপনি একটু অসুস্থ বোধ করবেন; মনে হয় সে অন্য কোনো জগতের। তারপরও সে মন্ত্রমুগ্ধকর। ^{৪৫}

'মাদাম ডেভনশায়ার এবং এর গ্রেকোর কন্যা হলো মোনালিসা,' তিনি আরো বলেন, 'সবচাইতে চিরন্তন একটি ছবি এটি।' ^{৪৬} অন্যান্য সমালোচকেরাও এই মন্তব্যটি পরবর্তীকালে ধার করেছিলেন।

মাদাম ডেভনশায়ার একেছিলেন ইংগ্রেস, আর সেটা ১৮৩৩ সালে সালোয়াঁতে প্রদর্শিত হয়েছিলো। ১৮৮৫ সালে এটা আলোচনা করতে গিয়ে গতিয়ের তাঁর মোনালিসা'র ভাষা ব্যবহার করেছিলেন :

বড়সড় বিড়ম্বনা ছাড়া আমি কখনও মাদাম ডি-এর ছবিটা দেখি নি। ইংগ্রেস এখানে সুতীব্র ভীতিকর হিসেবেই পরিগণিত হয়েছেন...এই সব কালো চোখ আগুনের শিখার মতো আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে। তারা আপনাকে সব জায়গাতেই অনুসরণ করবে। আপনাকে নজরদারী করবে...তার পাতলা ঠোঁটে লেগে থাকা ইন্দ্রিয়াতীত হাসি যেনো আপনার অসম্ভব ভালোবাসাকেই ঠাট্টা করে। ইংগ্রেস কোনো নারীর ছবি আঁকেন নি, বরং আধুনিক পোশাকে আঁকেছেন প্রাচীন এক অলীক কল্পনার সিংহের মাথা। কেবলমাত্র একটি ছবিই আমার মধ্যে এই ধরনের অনুভূতির জন্ম দিয়ে থাকে, সেটা হলো এল গ্রেকোর কন্যা, যা তার বাবা নিজে আঁকেছিলেন, যিনি তার প্রেমে পড়েছিলেন আর কাজটি শেষ করতে গিয়ে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন।^{৪৭}

মোনালিসা'র কোনো উল্লেখ নেই! কেবল এল গ্রেকো'র 'কন্যা'—সম্ভবত তার রক্ষিতার ছবি, জেরোনিমা দ্য লা কুয়েভা—গতিয়ের এটাকে ১৮৫০ সালে একটি ছবি হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, 'যা আপনাকে সর্বত্রই অনুসরণ করে, লিওনার্দোর মোনালিসা'র মতোই।'^{৪৮} গতিয়ের যে সব ছবির কথা উল্লেখ করেছেন—এল গ্রেকো, ইংগ্রেস, ফ্লাভারিন—সবগুলোই তরুণীদের ছবি, তিন-চতুর্থাংশ দেহ আঁকা, দর্শকের দিকে সরাসরি চেয়ে আছে, তাদের হাত তাদের কোলের ওপর রাখা—ঠিক মোনালিসা'র মতোই। যেনো তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর *femme fatal*-রা কী রকম হবে সেটা। এটা ঠিক যে, তিনি প্রায়শই মোনালিসা'র পরিহাসপূর্ণ এবং ঠাট্টার হাসি খুঁজে পেতেন সমসাময়িক চিত্রকলাতে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ইউজিন ফুয়েরা'র *l'Education de l'Amour*, এবং এডল্ফ দ্য বুর্জোয়ার'র *l'Amour blessé*, এ দুটোই ১৮৫৯ সালে সালোয়াঁতে প্রদর্শিত হয়েছিলো।^{৪৯} এমনকি লিওনার্দো'র ভার্জিন অব দি রক্স'কেও রহস্যময়তা আর দূর্বোধ্য হাসি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে (অবশ্য ঠাট্টা অথবা প্রলুব্ধকর হিসেবে নয়)।^{৫০}

গতিয়ের গল্প-উপন্যাস সৌন্দর্য শিকারের মোহাচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়েছে। ঠোঁটগুলো সবসময়ই জ্বল জ্বল করছে, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, প্রনুদ্ব করছে। দেহগুলো সবসময়ই সাদা, হাতির দাঁতের মতো, স্তনযুগল ভরাট আর পরিপূর্ণ। এক পলক চাহনিই যথেষ্ট গভীরভাবে প্রেমে পড়ার জন্যে। একজন গুণাবলী অর্জন করতে পারে, ভ্রষ্ট হতে পারে অথবা সেটা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য হলো স্বর্গীয় দান, যার এটা নেই তার পক্ষে এটা অর্জন করা সাধ্যাতীত। গতিয়ের নারী চরিত্রগুলোর অবয়বে অসাধারণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ বর্ণনা রয়েছে। কদাচিৎ তিনি তাঁর গল্পে অসাধারণ সুন্দর পুরুষের কথা বলেছেন, কিন্তু সেটা যেনো সৌন্দর্যকে নারীর নিজস্ব বিষয় হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্যেই। তিনি প্রায়শই বর্ণনা করতেন যে তারা 'অপরূপ সুন্দর,' প্রায় মেয়েদের মতোই। গতিয়ের গল্প-উপন্যাসের আরেকটি বিষয় হলো *Androgyny* বা মেয়েলি-পুরুষ। তিনি 'সত্যিকারের' পুরুষ পছন্দ করতেন না। মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর প্রখ্যাত ভাস্কর্য 'ডেভিড'কে তাঁর মনে হতো খুব বেশি পূর্ণাঙ্গ, খুব বেশি বলিষ্ঠ, দৈত্যাকারের বাহুবিশিষ্ট, 'এক শক্তিশালী মুটে কাঁধে বোঝা বহন করার জন্যে অপেক্ষা করছে'।^{৭১}

লেখকের অভিপ্রায় অনিবার্যভাবেই অজ্ঞাত থাকে, কিন্তু গতিয়ের বেলায় বর্ণনাগুলো নিখুঁতভাবেই সৌন্দর্যের ধারণাকে আত্মস্থ করে থাকে। তাঁর গল্প-উপন্যাসে বর্ণনার বিস্তার খুব বেশি (গল্পের পুট খুবই দুর্বল), যেখানে তাঁর চিত্র সমালোচনা খুব কঠিনভাবেই এবং নির্দিষ্টমাত্রায় ন্যারেটিভ চরিত্রের (পোট্রেট আমাদের সাথে কথা বলে, আমাদেরকে আহ্বান করে, ইত্যাদি) আর এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে খুব কমই পার্থক্য নির্দেশ করে।

গতিয়ের চিরন্তন নারীর ধারণাকে খুব গভীরভাবেই আন্তরিক ক'রে তুলেছিলেন যার কাছে পুরুষ পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করবে এবং তার নিজের ব্যক্তিজীবন তার কাছে প্রদর্শন করবে। বিরতিহীনভাবে এবং অসফলভাবেই তিনি ত্রিশ বছর ধরে লেগে ছিলেন কার্লোত্তা গ্রিসিকে পেতে, মেয়েটি ছিলো সেই সময়কার প্রখ্যাত ব্যালেরিনা নর্তকী। তার প্রত্যাখানই অসম্ভব প্রেমের ধারণা বা থিমের যোগান দিয়েছে। কার্লোত্তাই সর্বপ্রথম গিসেল-এ নেচেছিলো (১৮৪১ সালে জুন মাসে), যাতে বিবৃত হয়েছিলো এক অশরীরি (ভূত) মেয়ের প্রেম যে বিয়ের আগে মারা যায়, আর গতিয়ের এই নৃত্যানুষ্ঠানের পরই তার প্রেমে পড়ে যান।^{৭২} এতে অবশ্য তাঁর সাথে ঐ মেয়ের বোন, অপেরা গায়িকা আর্নেস্তা গ্রিসির সাথে তাঁর দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক রাখা থেকে তাঁকে বিরত রাখা যায় নি। তার গভীর গতিয়ের দু'মেয়ের জন্ম হয়েছিলো। গতিয়েরকে প্রত্যাখান করলেও কার্লোত্তা

তাঁর প্রতি প্রকাশ্য অনুরাগ দেখাতো । মধ্য বয়সে লেখা তার চিঠিতে গতিয়েরের প্রতি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আর তাঁর ভালোমন্দ বিষয়ে সজাগ থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় । সেই সময়ে, ১৮৬৫ সালে, তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিলো আর প্রিন্স রদজিওয়েলের সাথেও তার সম্পর্চ্ছেদ হয়েছিলো । গতিয়েরের সাথে তখনই তার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায় । জেনেভার বাড়িতে গতিয়ের প্রায়ই তাকে দেখতে যেতেন । সেখানেই তিনি *Spirite* লেখেন এবং বিশেষভাবে লিখিত এবং ছাপা হওয়া একটি অনন্য কপি তাকে দেন—সেটা কার্লোত্তা হারিয়ে ফেলেছিলো । জানুয়ারি ১৮৬৮ সালে ছাপান্ন বছর বয়সে গতিয়ের তার কাছে এক চিঠি লিখে তাকে তাঁর প্রায় নৈব্যক্তিক এক চরিত্র *femme fatal*-এর ভূমিকায় অভিনয় করতে বলেন । চিঠিটা গতিয়ের কার্লোত্তাকে দেখে আসর পরই লিখেছিলেন, আর গতিয়ের লিখেছিলেন, কেবলমাত্র তার শরীরই 'ফিরে এসেছে...আমার আত্মা তোমার সঙ্গেই আছে, সেটা তোমাকে সব জায়গাতেই অনুসরণ করে' । তিনি এই ব'লে অনুযোগ করেন যে, সে সবসময়ই খুব বেশি করেই তার সঙ্গে থাকে...

এতোটা গুটিয়ে থাকে, এতোটাই অপ্রবেশ্য আর আবদ্ধ যে স্বল্পভাষীর আবরণে সে ঢেকে থাকে তাতে ক'রে তার মনের কথা ধরতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়...

...তুমি আমার জীবন, আমার হৃদয়, আমার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা...

তুমি তোমার হাতে আমার সুখ আর দুঃখ ধ'রে রেখেছো । তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো, হে ছলনাময়ী, হে পাষাণী, হে অবिवেচক! আশা দিয়ে আমাকে কেন এতো দিন প্রতীক্ষায় রেখেছো...তোমার হৃদয় পেতে হলে আমাকে কী অর্জন করতে হবে? আমাকে করুণা করার জন্যে আমার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো না...

...আমাকে কল্পনা করতে দাও, আমি তোমাকে আমার বাহুতে জড়িয়ে রেখেছি, হৃদয়ের কাছাকাছি, তোমার ঠোঁটের ওপর দিয়ে তোমার হৃদয়ের নিঃশ্বাস নিতে দাও আমায়, আমাকে ফিরিয়ে দিও না প্রিয় ।

তোমার ধ্বংসাতীত, দুর্দমনীয় আর আবেগপ্রবণীয় একজন ।

তোমার দাস, থিওফাইল গতিয়ের ।^{১০}

কালোত্তর জবাবের কোনো রেকর্ড অবশ্য পাওয়া যায় নি, কিন্তু তার ২৭শে জানুয়ারির চিঠিটা সবচাইতে বন্ধুত্বপূর্ণ—সম্ভবত খুব বেশিই বন্ধুত্বপূর্ণ। যে কবি নিজেকে ধ্বংসাতীত আবেগপ্রবণ হিসেবে জাহির করেছেন তাঁকে মেয়েটি বলেছে পনেরো ফ্রাঁতে পাওয়া ছয় জোড়া হাতে বোনা মোজার স্থলে যদি তাঁকে দশ জোড়া দেয়া হয় তবে কী হবে। সেগুলো কি প্যারিসে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে? এটা কি গতিয়েরকে হতাশ করেছিলো? হয়তো তিনি মনে মনে সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন যে, মোজার ব্যাপারটি অনিবার্যভাবেই *femme fatal*-এর সত্যিকারের একটি কাজ।

এতে প্রমাণিত হয়, গতিয়ের বিরামহীনভাবেই কাম্বিত রমণীকে প্রভাবশালী *femme fatal*-এ রূপান্তর ঘটিয়েছেন, হয় বাস্তব জীবনে নয়তো গল্প-উপন্যাসে। এজন্যেই এটা অবাক করার বিষয় নয় যে, মোনালিসা'কেও প্রকারান্তরে একইভাবে মূল্যায়িত করা হয়েছে। এ বিষয়টা প্রথমে দেখা যায় ১৮৫৫ সালে পল ফশার আর রেনারের লেখা *লা জোকোন্দে* নামক এক নাটকের ওপর তাঁর একটি রিভিউতে।^{৭৪} এটা ছিলো সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্ম নেয়া জোকোন্দে নামক এক এতিম তরুণীর অতি সাধারণ গল্প, যে এই পৃথিবীতে একেবারেই একা। সে এক বৃদ্ধ ধনী যুবরাজের রক্ষিতা হয় কিন্তু বিয়ে করে দরিদ্র আর সম্ভ্রান্ত এক যুবককে। গতিয়ের রিভিউটা শুরু করেছিলেন দারুণ মেজাজে :

লা জোকোন্দে! এই নামটা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে লিওনার্দো দা ভিন্সির একটি ছবির কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে সৌন্দর্যের ফিংস্ রহস্যময়ভাবে হাসছে, আর যে কিনা, মনে হয়, শতাব্দীর সমাধানহীন এক ধাঁধা হবার জন্য পোজ দিচ্ছে। এ রকম অশরীরি কারো সাথে সংযোগ স্থাপন করা বিপজ্জনক। যার মাথা ঢাকা আছে স্বচ্ছ এক অবগুণ্ঠনে। তার চাহ্নিতে রয়েছে ঘনিষ্ঠ অজ্ঞাত এক আনন্দ, তার চাহ্নি খুবই স্বর্গীয় পরিহাস। তার অভিজাত উপস্থিতিতে আমরা অনুভব করি উত্তেজনা।

তার ঘন কালো গভীর চোখে রয়েছে নিষিদ্ধ গোপনীয়তা, তার 'পরিহাসপূর্ণ ঠোঁট' হলো সেইসব 'সর্ব পরিচিত দেবতার মতো যারা মানুষের অশ্লীলতাকে অবজ্ঞা করে'। আর কোনো 'আদর্শ নারী' এভাবে এতো বেশি

অপ্রতিরোধ্য প্রলুব্ধকর হিসেবে উপস্থাপিত হয় নি। ডন হুয়ান যদি তার দেখা পেতো তবে তার বিখ্যাত তালিকা থেকে তিন হাজার রমণীকে বাদ দিয়ে দিতো। নাটকটির অভাগা লেখকদ্বয় এই 'দুর্দান্ত নাম'টি ব্যবহার করে যে প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছেন সেটা তারাও বুঝতে পারেন নি। এই কাজটি করার আগে তাদের উচিত ছিলো 'লুভরে গিয়ে পুরো একটি দিন অতিবাহিত করা। এই চ্যালেঞ্জিং কাজটি করার জন্যে দরকার ছিলো শেক্সপিয়ার, গ্যোতে আর বায়রনকে একসাথে মিশিয়ে নেবার।'^{৫৫}

গতিয়ের এই ধরনের চিন্তা বার বার পুণঃউৎপাদন করেছেন, কখনও তিনি হুবহু একই শব্দ ব্যবহার করেছেন। ১৮৫৭ সালে আর্টিস্ট পত্রিকায় লিওনার্দোর এক ক্যারিকেচারে তিনি হাসিটিকে বর্ণনা করেছেন এই বলে যে, এটা 'রহস্যময়, গভীর আর প্রজ্ঞাময়। এটা অশান্ত আর মোহগ্রস্ততা তৈরি করে। ভালোবাসা আর ভীতিও বয়ে আনে সেই সঙ্গে।' এরপর, মোনালিসা'র হাসিকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন 'তার চোঁটের বক্রতায় আবির্ভূত হয় স্বর্গীয় এক শ্লেষ, অপার্থিব পরিহাস আর পবিত্র অবজ্ঞা; এমন অর্ন্তগত আনন্দ রয়েছে যার গোপনীয়তা আমরা কোনোভাবেই বুঝতে পারবো না।'^{৫৬}

১৮৬৭ সালে গতিয়ের তাঁর চূড়ান্ত কাজটি করেন যেটাকে বিবেচনা করা যেতে পারে তাঁর মোনালিসা'র সাহিত্যিক পুণঃনির্মাণ হিসেবে। তাঁর *Guide de l'Amateur au mussed u Luvre*-এ নিজেকে তিনি একজন গাইড হিসেবে রূপান্তরিত করেছেন যে আমাদেরকে মহান জাদুঘর সালোঁয়া কারে নিয়ে যায়, সেখানে রাখা হয়েছে পবিত্রের পবিত্রকে, তিনি লিখেছেন, 'বিশ্বের সবচাইতে সমৃদ্ধশালী চিত্র শিল্পীদের সম্মিলন স্থল' বলে। গতিয়ের যেনো আমাদেরকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, ঠিক তার পরে সব গাইডই যেভাবে দর্শকদেরকে দেখিয়ে থাকে। মোনালিসাকে দেখিয়ে বলা হয় যে, 'এটা অলৌকিক এক চিত্রকর্ম, নিখুঁতভাবে যা আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়'।^{৫৭} ১৮৫৫ সালের তাঁর এক রিভিউতে তিনি লেখেন :

আমি তাকে ক্রমাগতভাবে দেখে যাচ্ছি সেই তখন থেকে এই শ্রদ্ধেয় জোকোন্দেকে। সে সব সময়ই ইন্দ্রিয়পরায়ণ হাসি দিয়ে যাচ্ছে, তার অসংখ্য প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করছে। তার রয়েছে নারীর প্রশান্তময় মুখচ্ছবি যা নিশ্চিতভাবেই চিরকালের জন্যে সুন্দর রবে মহান কবি আর শিল্পীর চেয়েও বেশি দিন ধরে।^{৫৮}

ঠিক সেই বছরেই গতিয়ের লিওনার্দোর ওপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন তাঁর *Le Dieux et Dieux et les demi-dieux de la peinture* নামক বইতে।^{৭৮} তিনি আবার মোনালিসা'তে ফিরে যান : তার মায়াজালকে কেবলমাত্র সৌন্দর্য দিয়ে আরোপিত করা যাবে না। রাফায়েলের কিছু নারী খুবই নিখুত সৌন্দর্যের। সে 'কোনোভাবেই তরুণী নয়, কমপক্ষে তার বয়স হবে ত্রিশ'। তার পোশাক বিবর্ণ হয়ে গেছে, একেবারে বিধবাদের মতো। তার পরও তার হাসি 'প্রজ্ঞাময়, প্রগাঢ়, কোমল আর প্রতিশ্রুতিশীল' :

...সর্পিল-তরঙ্গায়িত, বাঁকা মুখ, আধো আলো-
অন্ধকারের কোণ থেকে তাকিয়ে আছে, দর্শকদের দিকে
চেয়ে মিষ্টি ক'রে হাসছে, ঠাট্টা করছে। অভিজাত এবং
কর্তৃত্বপরায়ণ যা ডাচেসের উপস্থিতিতে স্কুলের বাচ্চা
ছেলেদের মতো আমরা ভয় পাই। মাথাটা বেগুনি রঙের
ছায়ায় ঢেকে আছে। তোমাকে সেটা ঘন্টার পর ঘন্টা
ধরে স্বপ্ন দেখায়। কোনো সিফনির মতো তোমার
স্মৃতিকে নিরীক্ষণ করে। সেই অবয়ব থেকে প্রকাশিত
হয় অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট আর অপ্রকাশ্য ধারণার মতো
সঙ্গীতের বিমূর্ত মূর্ছনা...তুমি আবিষ্কার করবে
জোকোন্দের কাছ থেকে এক ধরনের বিষন্ন বসন্ত, তিন
শত বছর ধরে ঠিক একই রকম ঠাট্টা আর তাচ্ছিল্যের
হাসি সে ধারণ ক'রে রেখেছে।^{৭৯}

গতিয়ের অবশ্যই নারীতে মোহাবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু মোনালিসা'তে নয়। তাঁর গল্প-উপন্যাসে মোনার কোনো সরাসরি উল্লেখ নেই। অথচ সেসবে চিত্রকর্ম এবং চিত্রকরের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। তিনি আসলে মোনালিসাকে আর্কিটাইপে রূপান্তর করেছেন, এমন একটা সৌন্দর্যে যা ঐতিহাসিক কোনো চরিত্র নয় তবে পার্থিব, কারণ সে আমাদের কাছে রহস্যময় অতীতের গভীরতা থেকে আবির্ভূত হয় (মিশর, গৃস, রোম); আমরা তাকে কামনা করি, তারপরও সে দূরবর্তী আর অস্পর্শ। আমরা তাকে অধিকার করতে পারি না, সেটা এ জন্যে নয় যে, সে অন্য কোনো লোকের অথবা উচ্চশ্রেণীর, কিংবা সে ঈশ্বর এবং ধর্মের। সে অস্পর্শ, কারণ সে এরকমই থাকতে চায়।

গতিয়ের ভাবতেন 'স্বাভাবিক' নারীরা পুরুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।

সত্যিকারের একজন নারী যে খায়-দায় এবং পান করে আর সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে শুতে যায় সে মাদামোয়াজ্জেল দ্য মোর্পিয়া'র মূল চরিত্র শেভারিয়া দাল বেয়ারকে আদ্যোদিত করবে।^{৬০}

উনিশ শতকে আদর্শ নারী চরিত্র নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। সে আর কারোর অধীনে নয় বরং পুরুষকে নিজের অধীনে রাখে। সে সময়েই আধুনিক নারীকে বিনির্মাণ করা হলো। এভাবেই এ্যাডগার কুইনেট প্রখ্যাত প্রগতিশীল ফরাসি ঐতিহাসিক জুল মিশেলের সাথে মিলে ১৮৫৯ সালে মোনালিসা'র হাসিকে অবশেষে প্রাচীন কুসংস্কার আর ভীতিকর ব'লে যে প্রচার ছিলো তা থেকে মুক্ত ক'রে নতুন একটা ব্যাখ্যা দেন।^{৬১} বুদ্ধিবৃত্তিক উন্মেষের নতুন যুগ এই হাসিকে অবলোকন করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। সেখানে অবশ্য গতিয়ের *femme fatale* ফ্যান্টাসির কোনো স্থান ছিলো না।

অবশ্য গতিয়ের থিমটাকে আরো বিশ্বজনীন এবং আরো বেশি প্রভাবশালী হিসেবে তুলে ধরা হলো। বলা চলে অনেক বেশি আধুনিকও : বায়রনীয় ডন হুয়ান, যে নারী প্রলুব্ধকারী (কাসানোভা) হিসেবে মেয়েদেরকে উন্মাদগ্রস্ত ক'রে আকর্ষিত করতো, তাদেরকে তাদের স্বামী-সন্তান, মানসম্মান পরিত্যাগ করতে বাধ্য করতো, সেটা ছিলো আঠারো শতকের বাস্তবতা। সেই ডন হুয়ান এবার বিপজ্জনক নারীধারণার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতে লাগলো।^{৬২} *l'homme fatale* তিরোহিত হতে লাগলো, সেখানে *la femme fatale* প্রবেশ করলো।

কোনো ইমেজের প্রেমে পড়ার থিমটা এতোটাই সাধারণ হয়ে উঠে যে, লিওনার্দোর মোনালিসা'র বেলায়ও একই কথা খাটে। উনিশ শতকে শিল্পীর মডেল হিসেবে নারীর অবস্থান একেবারেই সাধারণ ঘটনা হয়ে ওঠে, আর নগ্নতার প্রশ্নে নারীদেহ অবধারিতভাবেই এসে পড়ে। বয়স্ক নারীদেরকে এক্ষেত্রে খুবই কম দেখা যেতো। এই ধারণাটি ব্যাপকভাবে এবং সর্বত্রই প্রচলিত হয়ে যায় যে, শিল্পীর সামনে বসা মডেল নারীটি শিল্পীর প্রেমে পড়ে অথবা শিল্পী নিজেই তার প্রেমে আচ্ছন্ন।^{৬৩} জোসেফ লাভেলি তাঁর গ্যালারি দু মিউজি নেপোলিওন-এর ক্যাটালগে (১৮০৪-১৫) মোনালিসাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে :

হায়, এই মনোহরণী নারী যদি কথা বলতে পারতো!
তবে কোন্ গোপন আর অজানা কথা সে আমাদের
বলতো! কোন্ বিজয় সে অর্জন করেছিলো! শিল্পী

হিসেবে লিওনার্দো কতোই না অভিজাত, আকর্ষণীয় আর উজ্জীবিত ছিলেন...লিওনার্দো কি কেবলই মোনালিসার চিত্রকর? আমি জানি না, কিন্তু যে কেউ ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবে ভালোবাসা আর প্রলুব্ধকর ইঙ্গিতের অসাধারণত্ব এর চেয়ে বেশি হতে পারে না।^{৬৪}

তরুণ জুলভার্ন সম্ভবত এই আইডিয়াটা পছন্দ করেছিলেন। ১৮৫১ সালে তেইশ বছর বয়সে, নিজের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলো লেখার অনেক আগে তিনি একটা নাটক লিখেছিলেন। সেই নাটকের প্রথম নাম ছিলো *লিওনার্দো দা ভিঞ্চি*। তারপর, ১৮৫৫ সালে তিনি স্থির করলেন এটার নাম হবে *জোকোন্দো*। শেষে আবার নাম বদলে রাখলেন *মোনালিসা*। কিন্তু নাটকটি আর কখনই যত্নস্ব করা হয় নি। ১৯৯৫ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়।^{৬৫} এক অভিজাত ফ্লোরেন্টাইন ভদ্রলোকের স্ত্রী মোনালিসা, যে কিনা ভালোবাসে লিওনার্দোকে। সে খুব নিশ্চিত লিওনার্দো তাকে ভালোবাসে, তার প্রেমে পড়েছে—তা না হলে লিওনার্দো ছবিটা আঁকতে এতো দেরি কেন করছেন? অবশ্যই তার ভাবনাটা সঠিক, কিন্তু সে ভুলে গেছে লিওনার্দো একজন জিনিয়াস। যেই মাত্র লিওনার্দোকে বলা হলো যে, তাঁর *দ্য লাস্ট সাপার*-এর জুডাস সদৃশ্য একজন মডেলকে মিলানে খুঁজে পাওয়া গেছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিছু না ব'লে চলে যান সেখান থেকে।

লিওনার্দো আর মোনালিসা একে অন্যকে ভালোবাসে এই আইডিয়াটা অনেককে প্রলুব্ধ করলেও এ ব্যাপারে প্রমাণপত্রের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। হিপোলাইত তেইন এরকম ফ্যান্টাসিকে নাকচ ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর ১৮৬৫ সালের লেখা জনপ্রিয় উপন্যাসে।^{৬৬} চার্লস ক্রেমেন্ট এই দাবি করেছিলেন যে, লিওনার্দো আসলে মোনালিসার 'র প্রেমে পড়েছিলেন।^{৬৭} গ্রুইয়ারও সে কথার প্রতিধ্বনি করেছেন : লিসা ছিলো অপ্রতিরোধ্য আর এটা সে জানতো—'*মোনালিসা*' লিওনার্দোকে দখল ক'রে ফেলেছে।' শিল্পী এই ছবিতে তাঁর সমস্ত বিজ্ঞান, মেধা আকাজ্জা আর হৃদয় উজাড় ক'রে দিয়েছিলেন।^{৬৮} দিমিত্রি মেরোকভস্কির লেখা লিওনার্দোর জীবনালেখ্য উপন্যাসে দেখানো হয়েছে, লিওনার্দো ছবিটার প্রেমে পড়ে যান এবং তাঁকে *মোনালিসা*'র হাসি তাড়িয়ে বেড়ায়।^{৬৯} আরসিন হুসে একদম নিশ্চিত ছিলেন যে, লিসার হাসিটি তার স্বামীর প্রতি অবজ্ঞাপ্রসূত একটি হাসি, যে লিওনার্দোর চেয়ে বেশি সুন্দর আর যুবক ছিলো না।^{৭০} বাস্তবে, ফ্রান্সেসকো ইল গিকোকন্দো লিওনার্দোর চেয়ে

আট বছরের ছোটো ছিলো। মেরেকোভস্কি লিওনার্দোকে ফ্রান্সেসকোর চেয়ে কম বয়সী এবং আকর্ষণীয় হিসেবে দেখিয়েছেন—যেমনটি গল্প-উপন্যাসে খলনায়কদের প্রায়শই দেখানো হয়।

গ্যাব্রিয়েল সেইলে দাবি করেন যে, লিসা নামের সুন্দরী নারীটি এক জটিল ও দুর্বোধ্য স্তরের মানসিকতা সম্পন্ন মডেল। সে বিবাহিতা হলেও কখনই স্বামীকে ভালবাসে নি, তার সমস্ত ভালবাসা ছিলো লিওনার্দোকে ঘিরে। যে তার জন্যে অপেক্ষা করেছিলো, তার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলো। আমরা যখন তার দিকে তাকাই তখন 'তাকে চিনতে পারি', এটাও লিওনার্দোর জন্যেই।

সে তার কাছে গিয়েছিলো কোনো রকমের তাড়াহুরো না করেই, এই প্রতিভাবানের জাদুমন্ত্রে বিমুগ্ধ হয়ে, যার কাছে সে মোটেও কোনো আশঙ্কক ছিলো না। তাদের মধ্যে ছিলো একজন *জো নো সোই* কুই, একটি রহস্যময় সংযোগ, যা তাদের চিন্তাভাবনা আর বিষয়বস্তুকে একত্রিত করেছে, তাদের ভালোবাসা জীবনের পূর্ণ বসন্তের উচ্ছ্বাস নয়...আবেগপ্রবণ, নিজের আত্মাকেও চেনে না মেয়েটি এমন এক লোকের প্রেমে পড়েছিলো যার জটিল হৃদয় তার কাছে ছিলো অপ্রবেশ্য।^{৭১}

উনিশ শতকে লিওনার্দোর সমকামিতার বিষয়টি একেবারেই চাপা পড়ে গেছে। ১৪৭৬ সালে যখন লিওনার্দোর বয়স ২৪ বছর তখন তাঁকে সমকামিতার অভিযোগে আটক করা হয়।^{৭২} এরপর বাকি জীবনে কোনো নারীর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক হয়েছে বলে জানা যায় নি। ১৯৭৩ সালে কেনেথ ক্লার্ক ঘোষণা করেন, লিওনার্দোর চিত্রগুলো বুঝতে হলে আগে তার যৌনজীবন বুঝতে হবে। একই সঙ্গে তিনি লিওনার্দোর সমকামিতাকে অনুমোদন করে বলেছেন, তাঁর মহান শিল্পের গভীরতম স্থানে তাঁর সমকামী জীবনের সূক্ষ্মতম প্রভাব রয়েছে। ক্লার্ক ব্যাখ্যা করে বলেন, 'লিওনার্দো বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে-কোনো সৃষ্টিশীল পছন্দই আসলে নারীসুলভ জটিলতায় আবর্তিত। পুরুষের বিষয়-আশয় সংক্ষিপ্ত, সহজ এবং ব্যাখ্যার অযোগ্য; কিন্তু মেয়েলি বিষয় দীর্ঘ, জটিল আর তদন্তযোগ্য রহস্যময়।'।

সৃজনশীল প্রক্রিয়াটি...বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারী প্রক্রিয়া।
পুরুষের দেহসৌষ্ঠব নিয়ে চিত্রকর্ম বা শিল্পকর্ম সংখ্যায়
অনেক কম, পক্ষান্তরে নারীদের সংখ্যা সীমাহীন।^{১০}

লিওনার্দো এবং মোনালিসা সংক্রান্ত বিংশ শতাব্দীর যেকোনো আলোচনাতেই যৌনজ উপাদান বজায় থাকতো। এই মিথ্যের উৎস ছিলো উনিশ শতকে নিহিত, যখন পুরুষেরা অতিমাত্রায় নারীদের নিয়ে আলোচনা করতো।^{১৪}

উনিশ শতকে প্রায়শই শক্তির উৎস হিসেবে নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক দেশকেই লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণে নারী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সে সময় রাশিয়া এবং পোল্যান্ডকে 'মা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিলো। ইতালিতে গৃহযুদ্ধের সময় সে দেশকে এক যুবতী নারী বলে অভিহিত করা হয়। ফ্রান্সের প্রতীক হিসেবে মারিয়ান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 'ফাদারল্যান্ড' শব্দটির চেয়ে খুব বেশি *motherland, la madrepatria, das Mutterland*-এই শব্দগুলো বেশি ব্যবহৃত হতে থাকে।

রোমান ক্যাথলিক চার্চও এই নারীবাদীতায় অংশগ্রহণ করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলমান বিতর্ক শেষে ১৮৫৪ সালের ৮ ডিসেম্বর ওই চার্চ থেকে ঘোষণা দেয়া হয় জিও-মাতা জাগতিক পাপ ছাড়াই গর্ভধারণ করেছিলেন। নারীই শক্তির আধার। ফ্রান্সের লুর্দস ও জার্মানির তৎকালীন নবগঠিত মারপিনজেন মন্দিরের পুরোহিতরাও ওই ঘোষণা সমর্থন করেন।

তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ ধর্মবিশ্বাসের আধিক্যে মাতা মেরিকেই সমস্ত শক্তির আধার বলে স্বীকার করে এবং মোনালিসাকেও কুমারী হিসেবে ধরে নিয়ে তাকেও মেরির সমকক্ষ মনে করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গতিয়ের লিওনার্দোর সেন্ট এ্যান উইথ ভার্জিন এ্যান্ড চাইল্ড-এর প্রতি গভীর অনুরক্ত প্রদর্শন করতেন। এই চিত্রকর্মটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি প্রচুর আবেগীয় শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।^{১৫} ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে নারীকে ব্যবহার করাটা একেবারেই অ-যৌনজ। গতিয়ের সেন্ট এ্যান'র মধ্যে এক ধরনের চার্ম খুঁজে পেয়েছিলেন : 'কোনো চিত্রকর বয়স্ক নারীকে একেঁছেন এটা খুবই কম দেখা যায়।' ^{১৬}

মোনালিসা বিপজ্জনক প্রলুব্ধকারীণী বা মায়াবিনী, সেটা অবশ্য ভিন্ন ব্যাপার, নিদেনপক্ষে গতিয়েরের মতে। তিনি স্বীকার করেন, তিনি যখনই ছবিটার সামনে দাঁড়িয়েছেন তখনই নিজেকে মনে হয়েছে কোনো সম্রাজ্ঞীর

সামনে দাঁড়ানো তুচ্ছ ও ভীত এক স্কুল-বালক। রুশো ১৭৮১ সালে তাঁর কনফেশন-এ লিখেছেন :

এক প্রভূসুলভ অসাধারণ রক্ষীতার সামনে হাঁটু গেড়ে তার আদেশ মেনে, তার ক্ষমা পাবার জন্য আকুতি জানিয়ে আমি পেয়েছি সবচাইতে সূক্ষ্ম আনন্দ, আর আমার বৈচিত্রময় কল্পনার জোয়ার বইয়ে গেছে তার দিকে চেয়ে চেয়ে।^{৭৭}

প্রত্যেক পুরুষের জন্যেই পূজা করার মতো একজন নারীর প্রয়োজন। ক্যাথলিকদের রয়েছে কুমারী মেরি, রিপাবলিকানদের ম্যারিয়ান এবং বর্তমান কালের বুদ্ধিজীবীদের কাছে পূজনীয় হতে পারে রেনেসাঁ যুগের মাস্টারপিসগুলো। ওই সময়ের তৈলচিত্রগুলো তাদের পূজনীয় বলে স্বীকৃত হতে পারে। ওই ছবিগুলোর নারী চরিত্ররা সাধারণত কুমারী অথবা ধর্মযাজক পরিবেষ্টিত এবং তাদের দেখেও সতীসাধবী বলেই মনে হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, ওইসব ছবির মডেলরা প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তির স্ত্রী ছিলেন। সর্বোপরি তাদের সবারই পরিচয় জানা তখন সম্ভব ছিলো। ফলে তাদের মধ্যে রহস্যময়তা ছিলো না। কিন্তু তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম কেবল মোনালিসা। ফ্রান্সেস্কো গিওকোন্দের পরিচয়হীন স্ত্রী হিসেবেই যেহেতু সে পরিচিত সূত্রাৎ এক দিক থেকে সে পরিচয়হীন। তার কোনো নেপথ্য-ইতিহাস নেই। 'মা' এবং 'স্ত্রী' মোনা হিসেবে তার পরিচয় পুরুষের আবেগপূর্ণ কল্পনার নিচে চাপা পড়ে গেছে। তার এই বর্তমান পরিচিতির ভেতর থেকে আরেকটি পরিচিতি উঠে আসতে পারে।

গতিয়ের মোনালিসা সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে লিওনার্দোকে তাঁর চিত্রকর্ম থেকে পৃথক করেছেন। পেশাদার শিল্পীরা এই মহান শিল্পীর অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারেন নি। বিখ্যাত প্রতীক-ধর্মীচিত্রকর ওডিলন রেডন মোনালিসার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেও তাঁর ডায়রিতে লেখেন, চার শতাব্দী ধরে শিল্পীরা মোনালিসার যে প্রশংসা করে আসছে তা তার হাসির জন্যে নয় বরং এক সমতল ক্যানভাসে তার মুখের গভীরতা ও শক্তির উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে লিওনার্দো যে প্রকৌশলীর প্রাজ্ঞতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন সেই কারণে।^{৭৮} কিন্তু গতিয়েরের মতে লুডরের মোনালিসা লিওনার্দোর উন্নতিকেই ইঙ্গিত করে : ছবিটার আলো-আধারির জগৎ রহস্য তৈরি করেছে। ১৮৯২ সালে সেইলে লেখেন যে, তাঁর মনে হচ্ছে মোনালিসা

তার রঙের জৌলুস হারিয়ে ফেলেছে : 'সে কোনো ছবি নয়, এক জীবন্ত নারী, আমরা তাকে চিনি, তার কথা আলোচনা করি। তার যেমন অসংখ্য শত্রু রয়েছে, তেমনি রয়েছে অগণিত ভক্ত ও পূজারী।' ১৯

এইভাবে দিনের পর দিন কোনো শিল্প-কর্ম বারবার ব্যাখ্যাত এবং নতুনভাবে আবিষ্কৃত হতে থাকে : মূলশিল্পী কর্তৃক, সময়ের ধারাক্রমে, দর্শক কর্তৃক এবং তাদের প্রত্যাশার বৈচিত্রের দ্বারা।

গতিয়ের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা ও তাঁর কাঠামোগত নির্দেশনার পরই মোনালিসা সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়। অবশ্য তিনিই যে প্রথম এই শিল্পকর্মের ওপর দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন এবং সে কারণে এর পরিচিতি আরো ব্যাপ্ত হয়েছে তা নয়, তবে লেখক ও সমালোচক হিসেবে গতিয়ের বিশাল খ্যাতির কারণে তাঁর বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছিলো। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ, বুদ্ধিদীপ্ত এবং প্রভাবশালী লেখক, সর্বোপরি তিনি ছিলেন সঠিক সময়ের সঠিক অবস্থানের মানুষ। গতিয়ের কবিতা ও গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো *femme fatale* বা নারীসুলভ রুঢ়তা, যা মোনালিসার মধ্যে উপস্থিত ছিলো বলে গতিয়ের দাবি করতেন।

এটা বলছি না যে, গতিয়ের সচেতনভাবেই সেটা করেছিলেন। এসব জিনিস খুব কমই পরিকল্পনামাফিক হয়ে থাকে, আর যখন সেগুলো পরিকল্পনা মতো হয়, তখন খুব ভালোও হয় না। কিন্তু আমরা এটা অনুমান করতে পারি, গতিয়ের ইচ্ছাকৃতভাবে এটাকে বেছে নেয়ার কারণ ছবিটা তাঁর উদ্দেশ্যের সাথে সবচাইতে বেশি ঋপ খেয়ে গিয়েছিলো। মোনালিসা কেন বেছে নেয়া হয়েছিলো?

প্রথমত *femme fatale* কোনো কুমারি হতে পারে না, কুমারি মেরির কথা না হয় বাদই দেয়া হলো। ফরাসি লেখক এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী আর্দ্রে মার্লো যখন প্রেসিডেন্ট দ্য গলকে বলেছিলেন তখন তাঁর কাছে একটা যুক্তি ছিলো— মনে হতে পারে অবিশ্বাস্য, তাঁরা শাশ্বত নারীর কথা আলোচনা করেছিলেন— যখন একজন চিত্রশিল্পী কুমারীর প্রতিপক্ষ হিসেবে শাশ্বত নারীকে আবিষ্কার করেন তখনই শিল্পের মোড় ঘুরে যায়। ২০

দ্বিতীয়ত আধুনিক পোট্রেট—যে ব্যাপারে গতিয়ের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন— সেটাও খুব বেশি মানানসই ছিলো না। ইংরেস, ডেভিড, দেলাক্রোয়া এবং এমনকি গ্যার কামোসোজিত নারীরা খুব বেশি আধুনিক। ফ্রান্স হাল্‌সের বুর্জোয়া নারীরা খুব বেশি বুর্জোয়া। ১৮৬৯ সালে (গতিয়ের মৃত্যুর কিছু দিন পর) লুভর হাল্‌সের বোহেমিয়ান গার্ল (৩১ নম্বর ছবিটি দেখুন) সংগ্রহ করে কিন্তু সেই ছবির হাসিটি খুব বেশি আগ্রাসী আর সরল।

একই বছর লুভর রেমব্রান্টের বাথশেবাও সংগ্রহ করে। এই ছবিটি রেমব্রান্ট কর্তৃক আঁকা গুটিকয়েক সম্পূর্ণ নগ্ন ছবির মধ্যে অন্যতম। ছবির মডেল হেনরিকে স্টোফেল ছিলো রেমব্রান্টের পছন্দের সিটার এবং রক্ষিতা, পরবর্তীকালে যে শিল্পীর দ্বীরা স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলো। সে একেবারেই নগ্ন হয়ে পোজ দিয়েছিলো। কিন্তু কোনো নারীকে *femme fatale* হতে হলে তার শরীরে পোশাক থাকতে হবে। যেমনটি গ্যাব্রিয়েল সেইলে বলেছেন, নগ্ন মোনালিসা'তে কোনো রহস্য থাকতো না; লিসা হয়ে যেতো একজন কারমেন।^{১১} রুবেন্স, বাউচার আর ফ্রাগোনার্ডের নারীরা খুব বেশি শরীর সর্বশ ছিলো। ক্রানাচের নারীরা ছিলো বড্ড বেশি শুকনো আর রোগা।

তবে নারীর প্রকৃত প্রতিমূর্তি হিসেবে কোনো ছবি নয় বরং ভাস্কর্যই অধিক গ্রহণযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে ১৮২১ সালে মোনালিসার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে লুভরে আসে *Venus de Milo* নামক ভাস্কর্যটি। তার নাকটা ছিলো মোনালিসার কাছ থেকে একটু দূরে। এই ভাস্কর্যটি মোনালিসার চেয়েও বেশি রহস্যময়তায় পরিবেষ্টিত। দু' হাত কাটা এবং অর্ধনগ্ন। আধুনিক রুচিতে এটা অবশ্য বেশি সুন্দর—মোনালিসার চেয়েও। সে মোনালিসার কাছ থেকে লুভরের অর্ধেক দর্শক কেড়ে নেয়। ১৮৭৮ সালে প্যারিসের ব্যদেকার গাইডে এটাকে ঘোষণা করা হয় 'লুভরের সবচাইতে অভিজাত সম্পদ,' হিসেবে এবং সেখানে মোনালিসা'র চেয়েও বেশি জায়গা তাকে দেয়া হয়।^{১২} এই দৃষ্টিভঙ্গীটা ১৯০০ সংস্করণ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিলো।^{১৩} কিন্তু ১৯১১ সালের মধ্যে এটা লুভরের একমাত্র সুপরিচিত ভাস্কর্য হয়ে ওঠে।^{১৪} এটা প্রশ্নাতীতভাবেই বিশ্বের সবচাইতে বিখ্যাত ও সুপরিচিত ভাস্কর্য হিসেবে রয়ে গেছে, দেখেই চেনা যায় এমনই শিল্পকর্ম এটি, হারানো হাত দুটোকে এজন্যে ধন্যবাদ।

ভেনাস মোনালিসার চেয়েও বেশি রহস্যে ঘেরা। এমনকি এটা যে প্রকৃতপক্ষেই ভেনাসেরই প্রতিমূর্তি সে ব্যাপারেও আমরা নিশ্চিত নই। এর নির্মাতা কে? এটা কি কোনো বিশাল ভাস্কর্যের বিচ্ছিন্ন অংশ? তার চেয়েও বড় কথা হাত দিয়ে সে কী করছিলো, যে হাত তার হারিয়ে গেছে? মোনালিসার মতো এটাও ব্যাপক বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আর কে এই নারী? সে কি কোনো দুষ্করিত্রা? নাকি সতী-সাক্ষী? উনিশ শতকের কবি সাহিত্যিকেরা বিশেষ করে থিওডোর দ্য ব্যানভিল (১৮৪২) থেকে আরমা সিলভেস্ট্রে (১৮৮২) ও লকোঁ দ্য লাইলের মতো কবিরা তাদের বিভিন্ন রচনায় এ মূর্তির উল্লেখ করেছেন।^{১৫} এমন কি গতিয়ের নিজেও মুখ ফস্কে বলে ফেলেছিলেন : 'ইউরোপের জাদুঘরে একটি ভাস্কর্য আছে যা আমাদের মনে ঈর্ষা জাগায়।

এটাকে উল্লেখ করা হয় সঠিকভাবেই, সুন্দরের সবচাইতে সুনিপুণ উপস্থাপন হিসেবে, চিরন্তন নারীর নিখুঁত বোধোদয় হিসেবে। সবাই জানে আমি ভেনাস দ্য মিলো'র কথা বলছি।^{১৬}

তবু এতো রহস্যময়তার পরও ভেনাস বিশ্বব্যাপী মোনালিসার মতো পরিচিতি পায় নি।

লিওনার্দোর আরেকটি কাজ আছে যা মোনালিসার ভূমিকা নিতে পারতো। সেটা হলো লেডি উইথ এন আরমাইন, সুন্দরী সিসিলিয়া গ্যালারিনির ছবি (১৪৭৩-১৫৩৬), লোদোভিকোর রক্ষিতা ছিলো সে। এই ছবিটাও শিল্পী এবং ঐতিহাসিকদের কাছে যথেষ্ট রহস্য আর অনিশ্চয়তার গল্প সরবরাহ করতে সক্ষম। ছবিটা কি সত্যি সিসিলিয়ার? ১৯৩৩ সালের দিকে এনসাইক্লোপিদিয়া ইতালিয়ানা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিলো।^{১৭} তাহলে ছবিটা অষ্টাদশ শতকে পোলিশ এডাম জারতোরিস্কির কাছে কিভাবে এলো?^{১৮}

যাইহোক, সিসিলিয়া গ্যালারিনির ছবিটি ফরাসি রাজা কেনেন নি, আর সেটা লুভরেও আনা হয় নি। লিওনার্দো যে ছবিটি এঁকেছিলেন সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো কেবলমাত্র উনিশ শতকে। ছবিটি প্যারিসের জারতোরিস্কি পরিবারের কাছে ছিলো ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত। কিন্তু গতিয়ের হয়তো ছবিটার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাতই ছিলেন না। লেডি উইথ এন আরমাইন সম্পর্কে কোনো ইতিহাসবিদ কিংবা শিল্পীও কিছু বলেছেন বলে শোনা যায় নি। আর ওয়াল্টার প্যাটার বিশ্বাস করতেন ছবিটা হারিয়ে গেছে।^{১৯} ১৮৯৯ সালে লিওনার্দোর প্রথম জীবনিকার ইউজিন মুনজ লেখেন, ছবিটা অতোটা ভালো নয় যে, মনে করা সম্ভব হবে এটি লিওনার্দোর।^{২০} এর পর অনেকেই এই ছবিটাকে লিওনার্দোর নয় বলে মত দেন।^{২১}

মোনালিসার সৌন্দর্যকে গতিয়ের মায়াবিনীর সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যে সৌন্দর্য মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে বিপথগামী করতে সক্ষম। তবে এটা ঠিক, শুধু গতিয়েরই মোনালিসাকে ভয়ংকর নারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন তা নয়, ১৮৫৪ সালে একজন সমালোচক মোনালিসাকে একটি নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং তার সৌন্দর্যের অন্ধরাকাঙ্ক্ষ দিকটি তুলে ধরেন এভাবে :

এটা তার ভয়ংকর সৌন্দর্যকে প্রকাশিত করেছে...তার হাসিতে রয়েছে চরম আকর্ষণীয় ক্ষমতা কিন্তু এই আকর্ষণ হৃদয়কে মোহগস্ত ও অসুস্থ করে তোলে এবং সেই অসুস্থ

হৃদয়ও অন্য হৃদয়ের উপর তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। সর্বগ্রাসী সমুদ্রের মতো তার হাসিও চরম ধ্বংসাত্মক এবং সর্বগামী।^{৯২}

চার্লস ক্রেমেণ্টের সমালোচনামূলক লেখাগুলোতেও রক্তপায়ী ভ্যাম্পায়ারের মতো মোনালিসার দুর্নিবার আকর্ষক সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। লিওনার্দোর মোনালিসার ওপর ক্রেমেণ্ট যতোখানি লিখেছেন সে তুলনায় মাইকেলএ্যাঞ্জেলো অথবা রাফায়েলের চিত্রকলা নিয়ে কিছুই লেখেন নি। ক্রেমেণ্ট লিখেছেন :

‘তিনশ’ বছর ধরে মোনালিসার ডাকিনীসূলভ মোহময় রূপ মানুষকে বশ করে রেখেছে। বিভিন্ন ভাষার হাজার হাজার মানুষ এই ছোট্ট ফ্রেমের চারপাশে শত শত বছর ধরে ভিড় জমাচ্ছে। তারা সেই জ্বলন্ত চোখের আকর্ষণীয় শক্তির আওনে পুড়েছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে তারা যেনো মোনালিসার কথা শুনতে পেয়েছে। তারা তাদের হৃদয়ে সেই বিষময় বানী ধারণ করে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে তা ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রেমিক, কবি, স্বপ্নচারীরা তার পায়ে কাছে আলো-সন্ধানী পতঙ্গের মতো এসে মরেছে! তার হাসিতে রয়েছে উল্লসিত জীবনের হাতছানি এবং মৃত্যুর ধ্বংসবার্তা।^{৯৩}

এ ধরনের তিক্ত কথার প্রচলন হয়ে গিয়েছিলো তখন। জুল মিশেলে এটাকে কেবল মোনালিসার বেলায়ই প্রচলন করেন নি, তিনি লুভরের অন্যান্য লিওনার্দোর সৃষ্টি সমূহকেও, বিশেষ করে সেন্ট জন এবং বাক্সাস-কেও এ রকম আখ্যায় অভিহিত করেন :

এই সব ছবির দিকে তাকালে তুমি অদ্ভুতভাবেই মুগ্ধ হবে...এ বিশ্বের গভীরতার, অজ্ঞাত অতল সময়ের মাস্টার তিনি—সে কথা বলে, আমার কাছ থেকে তুমি কি চাও? এ ক্যানভাস আমাকে আকর্ষণ করে, আমাকে ঘূর্ণিত করে, আমাকে ক্ষয় করে, অজগরের মুখের সামনে ছোট্ট পাখির মতো অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে যেতে হয় তার কাছে।^{৯৪}

মিশেলের মতে লিওনার্দো নিজেও তাঁর সৃষ্টি কর্তৃক তড়িত হয়েছেন, যেনো তিনি নিজের সত্তার বাইরের কিছু সৃষ্টি করে ফেলেছেন।^{৯৭}

মিশেলে যখন ১৮৫২ সালের দিকে এসব লিখেছিলেন তখন তিনি ফ্রান্সের সবচাইতে সুপরিচিত ইতিহাসবিদ হিসেবে পরিগণিত হতেন।^{৯৮}

১৮৪৯ সালে মিশেলে পঞ্চান্ন বছর বয়সে দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ে করেন আথেনিয়া'কে, যার বয়স ছিলো মাত্র সাতাশ। মিশেলে তাঁর নববধূর প্রতি উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে তাঁর জোয়ান অব আর্ক হিসেবে অভিহিত করেন।^{৯৯}

মিশেলের অনুরাগী হিপোলাইত তেইন মিশেলে সম্পর্কে বলেছিলেন : 'ইতিহাস হলো এক ধরনের শিল্প, তবে সেটা বিজ্ঞানও বটে; এটা লোকের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা এবং অনুরণনও দাবি করে...মিশেলে কাব্যিক-দূরকল্পনা থেকে নিজেকে বের করে নিতে পেরেছিলেন।'^{১০০}

হিপোলাইত তেইন ইতালিতে গিয়ে মডেস্টি এ্যান্ড ভ্যানেটি ছবিটিকে লিওনার্দোর ব'লে মনে করেছিলেন, এবং তিনি ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন যে, সেটা মোনালিসার চেয়েও সুন্দর, তার হাসি মোনালিসার চেয়েও বেশি রহস্যময়। ফ্লোরেন্সের পিস্তি'তে গিয়ে আবারো তিনি ভুল করে আরেকটা ছবিকে লিওনার্দোর ব'লে মনে করেন : ছবিটা একজন নানের ছিলো। তাঁর মতে ছবিটা মোনালিসার মতোই দূর্বোধ্য আর জটিল। সে কি একজন নান, রাজকুমারী, নাকি সভা সুন্দরী?^{১০১} যাইহোক, তিনি যখন ১৮৬৫ সালে বুয়ো আর্ত-এ লিওনার্দোর ওপরে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছে কেবল মোনালিসা'কে 'চমৎকার এবং লাস্যময়ী হাসি' হিসেবে মন্তব্য করেন।^{১০২}

ক্রমেস্তের দৃষ্টিতে মোনালিসার রয়েছে এমনই এক রহস্যময় আকর্ষক ক্ষমতা।

গতিয়ের আরেক বন্ধু হুসেও লিওনার্দোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখেছেন :

তাঁর এই দুর্নিবার আকর্ষণী ক্ষমতাসম্পন্ন তৈলচিত্র এক অবিমিশ্র রহস্যের জালে আচ্ছন্ন...এটা এতো বাস্তবতার সমান্তরালে সৃষ্টি হয়েছে যে, আপনি বুঝতেই পারবেন না এটা বাস্তব নাকি শিল্পীর কল্পনাপ্রসূত কোনো ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি। এর সামনে দাঁড়ালে মনে হয়, আমরা যেনো কোনো সুবিশাল পর্বতের নিচে তুচ্ছ কোনো সত্তা। আমাদের পায়েয় নিচে যেনো এক প্রার্থনা-মন্দির যেখানে আমরা

এখনই গড়িয়ে পড়ে যাবো । এ আমাদের স্বপ্ননিঃসৃত এক
সীমাহীন কল্পনার আশ্রয় ।^{১০১}

বাকি তিন পৃষ্ঠায়ও এরকম বর্ণনা রয়েছে :

...এই তরুণী মনোহরনী...মিষ্টি নাম তার
মোনালিসা...প্রভাবশালী, বিজয়ীনি, ইন্দ্রিয়পরায়ণা,
জিজ্ঞেস করো না সে কে, জিজ্ঞেস করো সে কি
নয়...লিওনার্দো যখন তাকে আঁকছিলেন তখন তিনি কী
ভাবছিলেন...? হয়তো তিনি তার মধ্যে ভবিষ্যতের এক
femme dominatrice দেখেছিলেন...^{১০২}

১৮৬৭ সালে পিয়েরে মার্সি তার *Guide populaire dans les
musees du Louvre* শিরোনামের লেখায় মোনালিসাকে লুভরের সর্বশ্রেষ্ঠ
অলংকার ব'লে অভিহিত করেছেন । মূলত তিনি মোনালিসার শারীরিক
প্রকাশভঙ্গিতে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন । মোনালিসার জাদুময়ী দৃষ্টিতে মুগ্ধ
হয়ে তিনি লেখেন :

তার বিষন্নময় চাহনি আর স্বর্গীয় হাসি আমাদের উপর
এক ধরনের মোহময়তা আর আবিষ্টতা আরোপ
করে ।^{১০৩}

১৮৫৮ সালে দৈনিক *La Presse* প্রতিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে এক
মহিলা সমালোচক মোনালিসার চরম তীর্থক সমালোচনা করেন ।^{১০৪} জর্জ স্যান্ড
নামক ওই সমালোচক বলেন, 'লিসা মোটেই সুন্দরী কোনো মহিলা নয় । তার
চোখে তুরু নেই, গাল দুটো অস্বাভাবিক ফোলা, পলকহীন চোখে তাকে বোবার
মতো মনে হয় । তবে তার হাসিতে এক ধরনের শীতলতা রয়েছে, যে দৃশ্য
একবার দেখলে দ্বিতীয়বার আর ভোলা যায় না ।' তার মতে, এ ছবির
রহস্যময়তা এ ছবিতে নয় বরং এর রূপকার লিওনার্দোর মধ্যেই নিহিত ।^{১০৫}

উনিশ শতকে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করা হয় যে, বিদ্যমান ক্রাইটেরিয়া
বা রীতি অনুযায়ী মোনালিসা মোটেও কোনো নান্দনিক সুন্দরী নয় ।^{১০৬}

এ ধরনের বহুমাত্রিক সমালোচনা উনিশ শতক জুড়েই হয়েছে । উনিশ
শতকের শেষ দিকে এসে লিওনার্দোর জীবনীকার গাব্রিয়েল সেইলে বলেন

‘মোনালিসা আসলে এক বিশ্লেষণধর্মী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।’^{১০৭} এটাকে এতো বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কিছু নেই।’ কিন্তু সেইলে বুঝতে পেরেছিলেন, নতুন কিছু বলাটা খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে : ‘তার সম্পর্কে বলাটা এখন এতোই তুচ্ছ হয়ে উঠেছে যে, আমার সাহস হয় না।’^{১০৮} তারপরও তিনি বর্ণিল বর্ণনা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন নি :

বহুল ব্যবহৃত শব্দসমূহ বাদ দিলেও এটা বলা যায়, এই নারীর রহস্যময়তা পুণর্জীবিত হয় বারবার...তার সূক্ষ্মময়তা পরিস্ফুটিত...যেনো বেলাভূমিহীন কোনো সাগর যা তাকে পরিব্যপ্ত করে রেখেছে।^{১০৯}

উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রায় সবখানে মোনালিসার ছবি এতো বেশি প্রদর্শিত হয় এবং এতো জনপ্রিয়তা পায় যে, অনেক শিল্পী ও সমালোচক এর ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এ সময়ের অনেক সমালোচক মোনালিসার মুখাবয়বে যৌনাবেদন অপেক্ষা আধ্যাত্মিক আবেদনই বেশি রয়েছে বলে দাবি করেন। ১৯৫০ সালে দার্শনিক কার্ল জেসপারস মোনালিসা সম্পর্কে লেখেন :

প্রশস্ত কপালের নিচে খোলা চোখ দুটো, স্মিত হাসি, তার শান্তশিষ্ট ভঙ্গীমা, ভাঁজ করা হাতের আভিজাত্যপূর্ণ অবহেলা এই মহিলার অবয়বে এক ধরনের অধ্যাত্মিকতা আরোপ করেছে।

অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন :

মোনালিসার চেহারায় কোনো প্রলোভনের বা বিপথগামী আবেদন নেই, কোনো সামাজিক ভণ্ডামিপূর্ণ আবেদনও নেই, তার মুখাবয়বে রয়েছে এক প্রশান্ত ঐন্দ্রজালিক ও আধ্যাত্মিক পরিসুদ্ধ আবেদন যা মোনালিসাকে আরো রহস্যময়ী করে তুলেছে।^{১১০}

এটা সম্ভবত মোনালিসা সম্পর্কিত শেষ দার্শনিক বিশ্লেষণ, কেননা ছবিটা যতো বেশি বৈশ্বিক হতে শুরু করলো বুদ্ধিজীবীদের কাছে সেটা ততোটাই কম আগ্রহের বিষয় হতে থাকলো। তবে উনিশ শতকে ছবিটা নিয়ে মাতামাতি

যখন চরমে তখন আবারো মোনালিসা বুদ্ধিজীবীদের আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে, তবে সেটা আর ফরাসিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না; বৃটিশরাও তাতে যোগ দিলো। এভাবেই মোনালিসা সেই সময়ের সবচাইতে প্রভাবশালী বিশ্ব-সংস্কৃতির দুটোর মধ্যে একটি হয়ে উঠেছিলো।

সমসাময়িক শিল্পের কথা উঠলে প্যারিসের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এটা সারা বিশ্বের শিল্পীদের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। বৃটেনে জন রাসকিন এবং ওয়াল্টার প্যাটারের মতো সমালোচক থাকলেও তাঁদের প্রভাব ছিলো খুবই সীমিত। রাসকিন রেনেসাকে ঘৃণা করতেন, কিন্তু প্যাটার ছিলেন রেনেসার দ্বারা সবচাইতে বেশি প্রভাবিত। রেনেসার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আগ্রহই শেষ পর্যন্ত লিওনার্দো এবং মোনালিসার প্রতি তাঁকে আগ্রহী করে তোলে। তিনিই মোনাকে ফ্রান্সের বাইরে বিখ্যাত করে তোলেন, ছবিটার সাথে সাথে তাঁর নিজের খ্যাতিও বেড়ে যায় বহুগুণে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুগের দৃশ্যগত রুচি হিসেবে মোনালিসা

১৯৩৬ সালে তাঁর সম্পাদিত *Oxford Book of Modern Verse 1892-1935*-এস্থের ভূমিকায় ডব্লিউ.বি.ইয়েটস কবিতার মতো ক'রে লেখা ওয়াল্টার প্যাটারের একটি বিখ্যাত গদ্যাংশের উদ্ধৃতি দেন। মোনালিসার ওপর প্যাটারের ওই লেখায় শিল্পকর্মটির 'বৈপ্লবিক গুরুত্ব' তুলে ধরা হয়েছিলো। ইয়েটস যে অংশটি উদ্ধৃত করেন সেটি হলো :

যে পাথরের ওপর ব'সে আছে তার চেয়েও সে বেশি প্রাচীন
ভ্যাম্পায়ারের মতো অনেকবার মৃত্যুবরণ করেছে সে,
উপলব্ধি করেছে কবরের নির্জনতা;
গভীর সাগরের ডুবুরী হয়েছে,
রেখে গেছে তাদের পতিত দিনগুলোর বার্তা;
প্রাচ্যের বণিকদের অদ্ভুত জালের রহস্যময়তা :
লেডার মতো, যে কিনা ট্রয়ের হেলেনের মা ছিলো,
আর সেন্ট এ্যানের মতো, যে ছিলো মেরির মাতা;
এসবই তার মধ্যে নিহিত কিন্তু বাঁশি আর লিরেজের সুমধুর
সুরের মতো নিজের ভাঁজ করা দু'হাত আর চোখের চাহনিতে
সে কেবল বেঁচে থাকে সূক্ষ্মতার মাঝে।'

ইয়েটস যে উদ্ধৃতির জন্য এই অংশই বেছে নিয়েছেন তা আকস্মিক নয়। তিনি কখনই তাঁর কবিতায় মোনালিসা সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নি, তাঁর ছিলো নিজেরই ভাবজগতের এক নারী, যার নাম মদগোন, সেই নারী তাকে

অনুপ্রেরণা জগিয়েছে অসংখ্য কবিতায় এবং সে-ই ছিলো তার নারীত্ব বিষয়ক সমস্ত ভাবনার কেন্দ্র ।^২

১৯৩৬ সাল নাগাদ প্যাটারের গদ্যাংশটি বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলো । ১৯৭৩ সালে কেনেথ ক্লার্ক বলেন, ‘পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের সবার কাছে সেটা মুখস্ত হয়ে গিয়েছিলো ।’^৩ ফরাসিদের দৃষ্টান্তের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন মারিও প্রাজ । তিনি লেখেন, ‘বিশাল আবিষ্কারটা ছিলো ওয়াল্টার প্যাটারের গিওকোন্দের বিখ্যাত হাসির মধ্যে *Femme fatale*-এর ইতিহাস পাঠ করা ।’^৪

প্যাটারের গদ্যাংশে মোনালিসার হাসির উল্লেখ নেই । বিষয়টা আগেই সুপরিচিত হয়ে গিয়েছিলো । এক স্থানে অবশ্য তিনি ‘অপরিমাপযোগ্য হাসির’ কথা উল্লেখ করেন, যে হাসিতে ‘অশুভের একটা স্পর্শ থাকে সবসময়’—কিন্তু তিনি এও বলেন, ওই ধরনের হাসি ভেরোক্কিওর কাছেও পাওয়া যায়, আর ভেরোক্কিও ছিলেন লিওনার্দোর শিক্ষক ।

প্যাটারের সেই গদ্যাংশ পুরোটা ছিলো এইরকম :

উপস্থিতিটা যদিও খুব অদ্ভুতভাবে আবির্ভূত হয়েছে জলরাশির পাশেই, সেটা পুরুষের হাজার বছরের কামনারই প্রতিফলন । এখানে মাথাটা উঁচু হয়ে আছে যাতে রয়েছে ‘পৃথিবীর শেষ সময় ঘনিয়ে আসা,’ আর তার চোখের পাপড়ি কিছুটা ক্লান্তও বটে । এটা হলো সৌন্দর্য, যা রক্তমাংসের নিগূঢ় থেকে বেড়িয়ে এসেছে, প্রতিটি কোষের মধ্য থেকে অদ্ভুত সব ভাবনা আর চমৎকার আকাঙ্ক্ষাসমূহ । গৃক শ্বেতকায় দেবীদের অথবা কোনো পুরাকীর্তির সুন্দরী রমনীর পাশে তাকে কিছুক্ষণের জন্যে বসিয়ে দাও, দেখবে তারা এই সৌন্দর্যের কাছে কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়! পৃথিবীর সমস্ত চিন্তাভাবনা আর অভিজ্ঞতা তার মধ্যে ধরা পড়েছে অথবা মিশে গেছে, এভাবে তারা বিস্ময়কর শক্তি অর্জন করেছে এবং গৃসের পাশবিকতা, রোমের যৌনাকাঙ্ক্ষা আর মধ্যযুগের আধ্যাত্মিকতার কল্পনাপ্রসূত প্রেম আর প্যাগান পৃথিবীর প্রত্যাভর্তন ও বর্জিয়াদের পাপসমূহ প্রকাশ্য হয়েছে । সে যে পাথরের ওপর বসে আছে তার চেয়েও সে বেশি প্রাচীন; ভ্যাম্পায়ারের

মতোই সে অনেকবার মৃত্যুবরণ করেছে, উপলব্ধি করেছে
কবরের নির্জনতা; সে গভীর সাগরের এক
ডুবুরী...নিশ্চিতভাবেই লিসা একটি প্রাচীন ফ্যান্টাসির ধারক,
আধুনিক চিন্তাধারার প্রতীক ।^৭

এই গদ্যাংশটি লেখার সময় ওয়াল্টার প্যাটারের বয়স ছিলো তিরিশ ।
লিওনার্দোকে নিয়ে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় *Fortnightly Review*
পত্রিকায়, ১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসে; ১৮৭৩ সালে অন্যান্য রচনার সঙ্গে
সেটা *Studies in the History of the Renaissance*-এর পুনঃপ্রকাশিত হয় । উদ্ধৃত গদ্যাংশটি তারই অংশ । লিওনার্দো ততোদিনে
ব্যাপকভাবে বৃটিশ সংস্কৃতিতে আইকন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন । ১৮৮০
সালে রয়াল অ্যাকাডেমি *Virgin of the Rocks*-এর একটা কপি অর্জন
করে, আর ওই বছরই জ্য পল রিখটার ইংরেজি ভাষায় লিওনার্দোর পাণ্ডুলিপি
প্রকাশ করেন ।^৮ লিওনার্দোর বৈজ্ঞানিক কাজগুলোর ব্যাপারে আগ্রহও
বাড়ছিলো তবে লিওনার্দোর বিজ্ঞান, কিংবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিন্তাধারা, অথবা
উদ্ভাবনের ব্যাপারে প্যাটারের আগ্রহ ছিলো না । তাঁর লিওনার্দো বিশেষভাবেই
একজন চিত্রকর ।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ফ্রুবেয়ারের *La Tentation de saint
Antoine* এই সময়ে প্রকাশিত হয়, যেখানে একই কথা ব্যবহৃত হয়েছে;
হেলেন নামে এক নারী সাধু অ্যান্টনিকে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে,
তবে ব্যর্থ হয় :

সে ছিলো ট্রোজানদের হেলেন...সে ছিলো লুক্রেশিয়া,
রাজা কর্তৃক যে প্যাট্রিশিয়ান ধর্ষিত হয়েছিলো সেই জন ।
সে ডিলায়লা, যে স্যামসনের চুল কেটে ফেলেছিলো । সে
প্রতিটি জাতির কাছেই নিজেকে পতিতা বানিয়েছে । প্রতিটি
চৌরাস্তার মোড়েই তার গান গাওয়া হয় । সে চুমু খায়
প্রতিটি মুখেই ।^৯

ফ্রুবেয়ার তাঁর গল্পটি শেষ করেন ১৮৭২ সালে, শুরু করেছিলেন আরো
প্রায় বিশ বছর আগে, ১৮৭৪ সালের আগে পর্যন্ত সেটা অপ্রকাশিতই থেকে
যায় ।

প্যাটারের গদ্যের মান এমন একটি থিমের ওপর দণ্ডায়মান যা আগেই অস্তিত্বশীল হয়েছিলো। আমরা দেখেছি ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারার সঙ্গে কিভাবে প্যাটারের যোগসূত্র রচিত হয়। নারীর প্রতিরূপ ব্যবহার করে প্রাচীনতার সঙ্গে আধুনিকতার বন্ধন সৃষ্টির প্রয়াস প্রায়শই হয়ে আসছিলো। কিন্তু মোনালিসার মতো সুনির্দিষ্ট কোনো দর্শনযোগ্য উপস্থাপনার দিকে তেমনভাবে তখনও এর প্রকাশ ছিলো না। দাল্‌তে গাব্রিয়েল রসেস্‌তি নির্দিষ্ট নারীদের ছবি এঁকেছেন, যেমন গ্যাতে'র মার্গারিট (*Faust* থেকে) এবং দান্তের বিয়াত্রিস, 'দুর্নিবার আকর্ষণের বস্তু হিসেবে আংশিক প্রলুদ্ধকর, আংশিক সাধ্বী, দুর্নীতিগ্রস্ত ও নির্দোষ দুই-ই।' কিন্তু না রসেস্‌তি না জন এভারেট মিলাইস, না এডওয়ার্ড বার্নরোস, না জর্জ ফ্রেডারিক ওয়াটস—কেউই স্বীকৃতিরযোগ্য শক্তিশালী একটা আইকন গড়ে তুলতে সফল হন নি। তাদের আঁকা নারীদের ছবি শিল্পের চৌহদ্দির বাইরে কখনই পরিচিত হয়ে ওঠে নি। এমনকি রসেস্‌তির *Bocca baciata* (১৮৫৯ *The Kissed Mouth*) বোকাচ্চিওর একটি সনেট থেকে এই শিরোনামটি নেয়া হয়েছিলো; (৩২ নম্বর ছবিটি দেখুন), তরুণ সুইনবার্গ সেটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন যদিও এবং ১৮৬০-র দশকে এর ব্যাপক নকল তৈরি করা হয়েছিলো কিন্তু কখনই তা যশ লাভ করে নি, একই কথা বলা চলে তার অন্যান্য ছবি সম্পর্কে যখন *Helen of Troy* (১৮৬৩), *Aurelna* (১৮৬০), *Lilith* (১৮৬৪-৬৮), *Medea* (১৮৬৬-৬৮)। এছাড়াও ফ্রেডারিক স্যাভিসের *Mary Magdalene* (১৮৫৯), এডওয়ার্ড বার্ন-জোনসের *Sidonia von Bork* (১৮৬০-৬১), জর্জ ফ্রেডারিক ওয়াটসের *Eve Irilog* ইত্যাদি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

অনুরূপভাবে ফরাসি প্রতীকবাদী শিল্পীরা *Femme fatale*-এর নির্দিষ্ট কোনো রূপ তুলে ধরেন নি যেটাকে একটা আর্কিটাইপ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে—গুস্তাভ মরোও নয়, যার আঁকা অনেক নারীর ছবিতেই গিওকোন্দার হাসি দেখা যায়, ওডিলন রেডনও নয়, যিনি লিওনার্দোর ফুমাতো শিল্পকৌশলের অনুরাগী ছিলেন।^{১০} ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের (ফার্নান্ড এখলাফ) প্রতীকবাদী এবং জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার (গুস্তাভ ক্রিম্ট) *Sezession* গোষ্ঠীর পাশাপাশি প্রাক-রাফায়েল যুগের শিল্পীরা সচরাচর এমন ছবি আঁকতেন যেখানে নারীরা জানালার তাকে ঝুঁকে আছে, নিজের দিকে বা দর্শকের দিকে চেয়ে আছে, চুল আচড়াচ্ছে চিরুনি দিয়ে। এই শিল্পীরা সেই একই থিমের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন যার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন গতিয়ের, বোদলেয়ার, সুইনবার্ন : সুখ

আর বেদনা, প্রেম এবং মৃত্যু, কামাতুর নারী, প্রাচীন ধ্যানধারণার নারী, অনুভূতিসম্পন্ন, আধ্যাত্মিক, মেজাজি নারী, চিন্তায় ডুবে যাওয়া নারী ইত্যাদি প্রতিচ্ছবিতে বন্দি হয়ে পড়ে ছিলেন তারা।

তখন শিল্পজগতে ব্যাপারটা এমন হয়ে পড়েছিলো যে, নারী যেনো দূরবর্তী রহস্যময় এক দেশ, অভিযাত্রীরা দেখেছে কিন্তু সে দেশ জয়ের সাহস পায় নি, বুঝতেও পারে নি, দূর থেকে দেখার বর্ণনা দিয়েছে কেবল।

অপরিচিত এক নারীর প্রতিকৃতির সঙ্গে উপযুক্ত শব্দচয়নের মাধ্যমে এই অদ্ভুত *Zeitgeist* বা যুগের দৃশ্যগত ভাবধারা মিলিয়ে দেয়াটাই ছিলো প্যাটারের বিশাল সাফল্য। ততোদিনে যে নারীকে ঘিরে পৌরাণিক আবহ তৈরি হয়ে গেছে, এবং তাকে আঁকাও হয়েছে তারই মতো রহস্যময় ও অজানা ভূদৃশ্যের পটভূমিতে। এই সাফল্যের ফলে প্যাটারের খ্যাতি বহুগুণ বেড়ে যায়। মোনালিসার সংশ্লিষ্টতা থেকে মুনাফা অর্জন করেছিলেন তিনিই প্রথম। গতিয়ের ও মিশেলে ততোটা পরিচিতি পান নি, কারণ মোনালিসা সম্পর্কে তাঁরা যা লিখেছিলেন তার উচ্চ রবে প্রশংসা আগেই করা হয়ে গিয়েছিলো এবং তাদের খ্যাতি ওই প্রতিকৃতির ওপর থেকে মুছে যাচ্ছিলো। কিন্তু মোনালিসা থেকে নিজের খ্যাতি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা পান প্যাটার। এমন কি আজকের দিনেও, বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায়ের বাইরে সাধারণ মানুষদের কেউ যদি প্যাটারকে স্মরণ করে তবে তা করে প্রধানত মোনালিসা গদ্যাংশের লেখক হিসেবেই।

লিওনার্দোর ওই তৈলচিত্রটি এবং সেটা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা লোকদের মধ্যে একরকম মিথোজীবী সম্পর্ক তৈরি হয়েছিলো। প্যাটারকে দিয়েই তার শুরু। মোনালিসার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে তারা নিজেদের দিকেই মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। লিওনার্দোর একটা তৈলচিত্রের নির্দিষ্ট ব্যাখ্যার সঙ্গে প্যাটারের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়েছিলো এমন এক সময়ে যখন লিওনার্দো কান্ট ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিলো বৃটেনে। প্যাটার ১৮৬৩ সালে তাঁর ফরাসি ভাষায় উৎকর্ষ সাধন করেছেন, ১৮৬৪ সালে তিনি প্যারিসে আসেন এবং কুইনেট আর মিশেলের লেখাগুলো পড়েন—উভয়েই তাঁদের লেখায় লিওনার্দোর কথা উল্লেখ করেছেন। প্যাটার অবশ্য তাঁদের প্রগতিশীল আদর্শ তাঁর রাজনৈতিক এজেন্ডার ব্যাপারে নির্বিকার ছিলেন। তিনি *In toto*’তে শিল্পের জন্য শিল্প ধারণাটি প্রবর্তন করেন। অবশ্য ধারণাটি তিনি গতিয়ের এবং সুইনবার্নের কাছ থেকে নিয়ে পরিপুষ্ট করেছেন।”

প্যাটার অনুধাবন করেছিলেন যে, মোনালিসার দিকে তাঁর তাকানোর ধরণটা ছিলো নাটকীয়ভাবে আধুনিক। গতিয়ের *Contes fantastique*

আর *Mademoiselle de Maupin*-এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন প্যাটার।^{১২} তিনি আরসিন হুসের লেখা *Histoire de Leonard de Vinci* পড়েছিলেন। হুসে ছিলেন গতিয়েরের বন্ধু ও অনুরাগী। মোনালিসার ওপর হুসের লেখাও নিশ্চয় তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়েছিলেন যেখানে হুসে লিওনার্দো ও লিসার মধ্যে প্রেমের কল্পনাশ্রয়ী বর্ণনা দিয়েছেন।^{১৩} বস্তুত প্যাটারের রচনার কিছু অংশ হুসের লেখা থেকে অনুপ্রাণিত। কিন্তু বইটি ইংল্যান্ডে সাদরে গৃহীত না হলে প্যাটার তাঁর বই থেকে হুসের সব রেফারেন্স বাদ দিয়ে দেন।^{১৪} এছাড়া লিওনার্দো বিষয়ক গতিয়েরের *Les Dieux et les semidieux de la peinture* (১৮৬৪) রচনাটিও পড়েছিলেন প্যাটার।^{১৫}

তবে প্যাটারের প্রধান সরাসরি উৎস ছিলো—ভাসারির পত্র—রেনেসাঁর তিন মহান শিল্পীর ওপর লেখা চার্লস ক্রেমেন্টের বই (*Michelangelo, Leonard de Vinci, Raphael*, ১৮৬১) বিশেষ করে মোনালিসা সম্পর্কে ক্রেমেন্টের মন্তব্য :

প্রেমিক, কবি, স্বপ্নচারীরা তার পায়ের কাছে গিয়ে মরো! না তোমাদের মরিয়াপনা, না তোমাদের মৃত্যু, কিছুতেই তার বাঁকা মুখের স্মিত হাসিকে মুছে ফেলতে পারবে না, এই অপ্রতিরোধ্য হাসি যা প্রতিজ্ঞা নস্যাত্ন করে আর অস্বীকার করে সুখময়তাকে।^{১৬}

এই হলো ঘূর্ণাপূর্ণ নারীর থিম। নারীরা ভয়ংকর কৌশলবাজ। তারা প্রতিশ্রুতি দেয় এবং পরে অস্বীকার করে। মেডুসা থিমও বটে এটা—মোনালিসা সম্পর্কে প্যাটারের ব্যাখ্যার যা কেন্দ্রস্থল। সে তাকায় দূর্ভাগা পুরুষটির দিকে আর কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুরুষটি তার হয়ে যায়। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, উফিজিতে সংরক্ষিত মেডুসার ছবিটা লিওনার্দোর আঁকা বলে বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছিলেন প্যাটার। তিনি এ ব্যাপারে লিখেছেন : ‘এটার অসাধারণভাবে নির্মিত সৌন্দর্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এক দূষিত মুগ্ধতা।’^{১৭} তবে তাঁর উৎস সম্পর্কে ক্রেমেন্ট সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, ছবিটার স্রষ্টা কে সেটা সন্দেহজনক। ক্রেমেন্ট ঠিকই বলেছিলেন : আসলে লিওনার্দো নয়, উফিজির মেডুসার স্রষ্টা ছিলেন সতেরো শতকের একজন ফ্রেমিশ চিত্রকর। যাইহোক, মেডুসাও ছিলো *femme*

fatals-এর এক পৌরাণিক উপস্থাপনা, স্পষ্টতই, পরে লিওনার্দোর সঙ্গেও জড়ানো হয় তা। ১৮১৯ সালে রচিত শেলির বিখ্যাত কবিতা 'On the Medusa of Leonardo da Vinci in the Florentine Gallery'-তে আকর্ষণ ও বিপদের মিশ্র বিষয়টি তুলে ধরা হয় :

ভয়ংকর আর প্রলুব্ধকর প্রেমময়ী...সব সৌন্দর্য এবং
ভীতির নিশ্চল এক আয়না, বাঁকা চাহনির প্রসন্ন মুখের এক
নারী, স্বর্গের সেইসব আদ্র পাথরের ওপর বসে মৃত্যুর
দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।^{১৮}

অন্যদিকে জর্জ স্যান্ডও মোনালিসার সঙ্গে মেডুসার একটা সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন; তিনি উভয়কেই ভীতিকর ব'লে বর্ণনা করেছেন।^{১৯} এমন এক যোগসূত্র সম্মিলিত অবচেতনায় এখনও রয়ে গেছে, এবং ১৯৮৮ সালে উমবার্তো একো তার *Foucault's Pendulum* উপন্যাসে সেটার প্যারোডি করেছেন, যেখানে প্রধান চরিত্রগুলোর একজন এক রাতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটি জাদুঘরে নিজেকে আবিষ্কার করে আর এই ব'লে নিজেকে আশ্বস্ত করে যে, 'গিওকোন্দার প্রতি কেউ কখনও আগ্রহী হয় নি—একটি মেয়েলী দানবী, কেবলমাত্র নান্দনিকতার এক মেডুসা?'^{২০} এইরকম পরিহাস ১৯৮০-র দশকে শক্তভাবে দানা বেঁধে ছিলো, ১৮৯০-র দশকে নয়, যখন ইউজিন লি হ্যামিলটনের সনেট *On Leonardo's Head of Medusa* তরু হয়েছিলো এই পর্যন্ত দিয়ে : 'বিবর্ণ এবং অকথিত মুখটি/ নিবৃত সেটা, শায়িত আছে সাপের মাথায়।'^{২১}

মোনালিসার চিত্রকর উফিজির মেডুসাও ঐকেছিলেন এ বিশ্বাস এতোটাই জোড়ালো ছিলো যে, ১৮৯৪ সালে ব্রিউয়ারের *Dictionary of Phrase and Fable*-এ 'মেডুসা'র এন্ট্রিতে ঘোষণা করা হয় : 'মেডুসার সবচেয়ে বিখ্যাত তৈলচিত্রটি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি'র আঁকা; এটাকে বলা হয় তার *chef d'oeuvre*।'^{২২}

চিত্রকর লিওনার্দোর দিকে মনোযোগ ফেরাতে বৃটিশ সর্বসাধারণকে বাধ্য করেন প্যাটার। তাঁর আগে লুভর পরিদর্শনকারী বৃটিশরা বলতে পারতো যে, লিওনার্দো রাফায়েল বা মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর মতো মহান নন, কারণ তাঁরা অনেক বেশি ছবি ঐকেছেন। এইসব দর্শনার্থীর হাতিয়ার ছিলো পিলকিংটনের *Dictionary of Painters* বইটি।^{২৩} তবে তারা যদি ১৮৫০ সালে লেখা

বেইল সেন্ট জনের *The Louver; or Biography of a Museum* বইটির ওপর নির্ভর করতো তাহলে হয়তো তারা বলতে পারতো লিওনার্দোর তুলনা চলে তিতিয়ানের সঙ্গে, আর মোনালিসা একটা অতি চমৎকার প্রতিকৃতি।

কী গভীর আর শিল্পের অতি সূক্ষ্মময়তার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে সেটা...ভাসারিকে উদ্ধৃত করে বলছি, অস্থির লিওনার্দো, যাকে তিনি ছবিটি শেষ না করার জন্যে অভিযুক্ত করেছিলেন!

যাহোক, সেন্ট জন লেখেন, ভালো ছবিটা ছিলো এর পাশেই; ইয়ান ভ্যান আইকের *Vierge au Donateur* (যেটা *La Vierge du chancelier Rolin*-শিরোনামেই পরিচিত, আনুমানিক ১৪৩৬ সাল; (৩৪ নম্বর ছবিটি দেখুন)।^{২৪} এ ছবিতে দেখা যায় উপবিষ্ট কুমারী মেরি, তার পেছনে ভূ-দৃশ্য। এটা মোনালিসার কাছেই টাঙানো আছে। সালোয়াঁ কারে'তে, যেখানে আরো আছে পেরুগিনো, পুসিন, তিতিয়ানের দুটো, লিওনার্দোর দুটো (*Mona Lisa* এবং *St. Anne with Virgin and Child*) এবং রাফায়েলের চারটি ছবি।^{২৫} এটা সেই ঐতিহ্যের অনুসৃতি যাতে প্রভাবিত হয় লিওনার্দোর বৈপ্লবিক প্রতিকৃতি। আজকাল ছবি গ্রুপ করা হয় 'জাতীয়তা' দেখে, ফলে কোনো ধরনের তুলনা কঠিন হয়ে পড়েছে। ভ্যান আইকের কুমারী পুরোপুরি ফ্রেমিশ শিল্পরীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, ইতালিদের থেকে যা বহু দূরের।

ইংল্যান্ডে অ্যানা জেমসনই প্রথম শিল্প-সমালোচক যিনি লিওনার্দোর এমন মর্যাদা দিয়েছিলেন যা পরবর্তীতে লিওনার্দো অর্জন করেছিলেন। অ্যানা তাঁর *Memoirs of the Earlier Italian Painters* (১৮৪৫) গ্রন্থে লেখেন, লিওনার্দো যে যুগে বেঁচে ছিলেন সেই যুগের চরিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন।^{২৬} কিন্তু জন রাসকিং, যিনি বৃটেনের প্রধান শিল্প-সমালোচক হিসেবে বিবেচিত হতেন, (অক্সফোর্ডে তিনি ছিলেন প্যাটানের জ্যেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী, যদিও দু'জনের কখনো স্বাক্ষাৎ হয় নি) লিওনার্দোকে উপরের দিকে স্থান দিতেন না :

যেহেতু লিওনার্দো যন্ত্রপাতি বানাতেন, খাল কাটতেন, দুর্গ নির্মাণ করতেন এবং নিজের শিল্প-ক্ষমতার অর্ধেক ব্যবহার করতেন শিল্পবহির্ভূত কাজে তাই তাঁর সম্পর্কে আমরা

অনেক কাহিনী শুনতে পাই—কিন্তু তাঁর ছাত্র লুইনির মাধ্যমে আমরা তাঁর যে শ'খানেক মহান শিল্পকর্ম পেয়েছি তাতে ক'রে তাঁর সম্পর্কিত কোনো গালগল্পের প্রয়োজন পড়ে না...সে লিওনার্দোর চেয়ে দশগুণ বড় একজন মানুষ।^{২৭}

বার্নাদিনো লুইনিকে রাসকিন 'শক্তিমান রঙ প্রয়োগকারী' হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন অথচ তার বিবেচনায় লিওনার্দো ছিলেন কেবলমাত্র 'একজন সুচারু কালো রঙের নকশাকার।' সময় বদলে দেয় দৃষ্টিভঙ্গি আর রাসকিনের দৃষ্টিভঙ্গি এখন মনে হয় খামখেয়ালিপূর্ণ। লুইনি ঠিকই স্থান পেয়েছেন ১৯৬৮ সালে *Penguin Dictionary of Art and Artists*-এ, সেখানে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে এই ব'লে যে, 'তিনি ছিলেন ষোলো শতকের প্রথম দিকে মিলানের অন্যতম সর্বাধিক জনপ্রিয় চিত্রকর, বিশেষ ক'রে লিওনার্দোর স্টাইলকে অশ্লীল করার ক্ষেত্রে তার সাফল্য সুবিদিত।' আসলে রাসকিন যে লুইনির এতো গুণকীর্তন করেছেন তার একটা কারণ আছে। একজন মধ্যম পর্যায়ের মাস্টারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন তিনি এই বাহাদুরি নেয়ার জন্য যে, ওই ওস্তাদশিল্পীকে তিনিই আবিষ্কার করেছেন। কেননা লিওনার্দো ও মাইকেলএ্যাঞ্জেলো আবিষ্কার ক'রে বাহবা নেয়ার কোনো সুযোগ ছিলো না তখন।^{২৮}

১৮৭৮ সালে ব্যদেকারের প্যারিস গাইডে লিওনার্দোর জন্য একটা অনুচ্ছেদ বরাদ্দ করা হয়েছে অথচ রাফায়েলের জন্য দেয়া হয়েছে প্রায় এক পৃষ্ঠা। তাতে মোনালিসা'কে বলা হয়েছে 'লুভরে সংরক্ষিত লিওনার্দোর সবচেয়ে বিখ্যাত শিল্পকর্ম।' যদিও 'অসমাপ্ত' (যেমন মনে করতেন ভাসারিও) এবং 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' তথাপি 'মুখের চমৎকার হাসির জাদু আজও আমাদের বিমোহিত করে।' ^{২৯}

ওই গাইডবুকের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন প্যাটার। তিনি সূত্র হিসেবে নিয়েছেন ফরাসি লেখক ও সুইনবার্নের কাছ থেকে। মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর নারী প্রতিমূর্তি বিষয়ক যাঁর রচনা (*Notes on Designs of the old Masters at Florence*) খুব অভিনিবেশের সঙ্গে পড়েছিলেন তিনি।^{৩০} সুইনবার্ন প্যাটারকে দেখান একটা শিল্পকর্মের ওপর কিভাবে মন্তব্য করতে হয়। বিস্তারিত বিবরণ কিংবা কৌশল ব্যাখ্যা ক'রে অযথা সময় খরচ করা নিঃপ্রয়োজন। আসলে যা কিছু দরকার তা হলো নিজের ওপর যে ক্রিয়া হয়

তা প্রকাশ করা এবং সুন্দর গদ্যে ফুটিয়ে সেটা তোলা। প্যাটার স্বীকার করেছেন যে, প্রচুর দরকারি কাজ ছিলো পণ্ডিতেরা যা করতে পারতেন, ‘অদ্ভুত আত্মার এক প্রেমিক হয়েতো নিজেই বিশ্লেষণ করবে যেসব কাজ তাঁর ওপর ক্রিয়া করে।’^{৩১} অনুসরণযোগ্য স্পষ্ট একটা মডেল দিয়েছিলেন সুইনবার্ন।

প্যাটারের ব্যাপারে সুইনবার্নের নিজের প্রতিক্রিয়া বেশ নম্র। দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেস্টিকে তিনি সে কথাই লেখেন : ‘আমি লিওনার্দোর উপরে প্যাটারের লেখাগুলো খুব পছন্দ করি। আমি স্বীকার করছি সেখানে একটু আধটু আমার ভঙ্গীর মসলা রয়েছে, কিন্তু তাঁর নিজের জিনিসও বেশ রয়েছে, বেশিই রয়েছে, সেটাই আমাকে বেশি আগ্রহী করে তোলে।’^{৩২}

ফরাসি ও বৃটিশদের মধ্যে সুইনবার্নই যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিলেন না; তিনি গ্যাব্রিয়েল দানুনজিওকেও প্রভাবিত করেছিলেন, দানুনজিও ছিলেন ইতালিতে মোনালিসার প্রধান অনুরাগী, ওদিকে গতিয়েরের প্রতি সুইনবার্নের অনুরাগও ছিলো লক্ষ্যণীয়। তিনি বেশ কয়েকটি কবিতা উৎসর্গ করেছিলেন তাঁকে—সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত আছে তাঁর *Tombeau de Theophile Gautier* (১৯৭৩) বইটিতে। সুইনবার্ন মার্কুইস দে সাদ এবং বোদলেয়ারেরও অনুরাগী ছিলেন। তারা দু’জন তখন সেভাবে পরিচিত ছিলেন না বৃটেনে।^{৩৩} আর এ ব্যাপারে বৃটিশ প্রতিক্রিয়াটা ছিলো এ রকম :

মি: সুইনবার্নের যা কিছু খারাপ তার সবটাই বোদলেয়ারের...বিষয় বেছে নেয়ার উদগ্র বাসনা, অপ্রাকৃত আকাক্ষার কথা, ঈশ্বরবিরোধীতা, পশুত্ব...ইংল্যান্ডের সব সুস্থ লোক আর কবিদের এই জিনিসটা বোঝা উচিত! ^{৩৪}

এভাবেই লেখক এবং প্রবন্ধকার রবার্ট ডব্লিউ বুচানান উচ্চস্বরে ঘোষণা দিয়েছিলেন বড়বড় কবিদের বিরুদ্ধে। সুইনবার্ন শক্তিশালী নারীর ব্যাপারে মোহগ্রস্ত ছিলেন : ‘শক্তিশালী নারীর কাছে চাবুক খাচ্ছে দুর্বল পুরুষ, এটা তো দারুণ একটি ব্যাপার।’^{৩৫} তিনি যে *femme fatale*-এর ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠ হবেন তাতে অবাক করার কী আছে।

এরকম নারীর দেখা পাওয়া যায় ‘দ্য মাস্কি অব কুইন বারসাবে’তে।^{৩৬} সুইনবার্নের ‘সানফ্লাওয়ার পয়েম’-এ ‘দ্য কমপ্ল্যান্ট অব মোনালিসা’ নামের একটি কবিতা রয়েছে।^{৩৭}

প্যাটারের লেখাটি তার সমকালীন কয়েকজনের মনে বিরক্তির উদ্রেক করেছিলো। তারা তাঁকে অপেশাদার হিসেবেই গণ্য করতেন। মার্গারেট ওলিফ্যান্ট মনে করতেন, প্যাটারের লেখাটি সেন্স এবং ননসেন্সের একটা মিশ্রণ। তিনি এই চূড়ান্ত মন্তব্য করেন যে, প্যাটার 'একজন ব্যর্থ রাসকিন'।^{৭৮} জর্জ এলিয়টও সুর মিলিয়েছেন তাঁর সঙ্গে।^{৭৯} ডব্লিউ.জে কোটহোপ প্যাটারের রচনা বাতিল ক'রে দিয়ে বলেছেন, 'ছবিটা এমন একটা থিসিস রচনা করেছে যাতে লেখকের গভীর পাঠ এবং তাঁর বিস্তৃত স্টাইলটি প্রদর্শিত হয়'।^{৮০} এক অজ্ঞাতনামা আমেরিকান পর্যালোচনাকারী লেখেন, লিওনার্দোর ওপর প্যাটার যা আরোপ করেছেন তা আসলে *La Gioconda*-র প্রতি তাঁর নিজের আবেগেরই প্রতিফলন।^{৮১}

এসব কিছুই হয়তো সত্যি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সমালোচনার ছায়া মিলিয়ে গেছে কালের গর্ভে আর প্যাটারের গদ্য এখনও টিকে রয়েছে। স্টাইল এবং উপযুক্ত সময় হলো আসল কথা। 'তাঁর সময়ে তিনিই একমাত্র লোক ছিলেন যে কিনা গদ্য লিখতে জানতেন,' বলেছিলেন অস্কার ওয়াইল্ড, এবং আরো বলেছিলেন, প্যাটারের *Renaissance* বইটা সঙ্গে না নিয়ে তিনি কখনও ভ্রমণ করেন নি।^{৮২} মোনালিসা তখনও পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি হিসেবে চিহ্নিত হয় নি, কিন্তু প্যাটার ঠিক সেদিকেই বিষয়টা সিদ্ধান্ত মূলকভাবে চালিত করেছিলেন। যারা ছবিটা কখনও দেখে নি সেইসব পাঠকদের কাছে ছবিটাকে তিনি পরিচিত ক'রে তুলেছিলেন তাঁর লেখার মাধ্যমে। তারচেয়ে বড় কথা, ছবিটা চাক্ষুষ করার আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিলেন তাদের মনে।

প্যাটারের রচনাবলীর ফরাসি অনুবাদ সংস্করণে (১৮৯৪ সালে) পুরো মহাদেশে ফরাসি ভাষা যে বুদ্ধিবৃত্তির একটা মাধ্যম সেটা বলা হয়েছে। প্যাটারের কাজগুলো পরবর্তীকালে শিল্প-ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অনেকেই মূল্যায়িত করেছেন। ১৯৫২ সালে মার্সেল ব্রাইয়ো লিখেন যে, প্যাটার অনুধাবন করতে পেরেছিলেন লিওনার্দো চিরন্তন নারীকে আঁকার চেষ্টা করেছিলেন।^{৮৩} সি. পুয়েল্লি'র ভাষ্যও অনেকটা প্যাটারিয়, কিন্তু তার সাথে ফ্রেডের মসলা মেশানো ছিলো।^{৮৪} কেনেথ ক্লার্ক তাঁর *দ্য রেনেসাঁ বইয়ের* (১৯৬১) শুরুতে লিখেছেন যে, 'এমনকি আজকের দিনেও আমরা প্যাটারের লিওনার্দো দা ভিন্সির যে চরিত্র চিত্রণ তা থেকে বের হতে পারি নি'।^{৮৫} ১৯৭৩ সালেও তিনি একই মত পোষণ করেছেন পুণরায়।^{৮৬} রিচার্ড কার্পেন্টার ১৯৬৩ সালে বলেন যে, 'তার নিরব প্রজ্ঞা, যা ভালোবাসার আমেজ তৈরি করে, মনে

হয় প্রাচীন এবং হাজার বছরের পুরনো।' সে হতে পারে 'রক্ষিতা অথবা একজন মা...সে একজন ডাইনিও বটে যে আমাদেরকে জাদু করে, শিকার করবার বাসিনায়'।^{৪৭} সাম্প্রতিক সময়ে, ১৯৮৫ সালে, ওয়েস্টার স্মিথ উল্লেখ করেছেন, প্যাটারাই হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি সিটারের সাথে পেছনের ভূ-দৃশ্যের একটি সংযোগের কথা উল্লেখ করেছেন।^{৪৮} ১৯৯২ সালে জিয়ান কার্লো মায়রিনো প্যাটারের ভাষ্যকে প্রশংসা করেছেন।^{৪৯}

প্যাটারের প্রভাব শত বছর পরেও লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে 'arty' প্রকাশনায় :

আমরা তার চোখের দিকে তাকাই যা জীবনের গভীরতম উৎস। আমরা দা ভিক্টর রোমান্সটা বুঝতে পারি, তিনি একজন বিজ্ঞানী ছিলেন, যিনি একটি সত্য আবিষ্কার করেছিলেন। আমরা টের পাই তাঁর মোনালিসা'র ভেতর দিয়ে জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস বয়ে যাচ্ছে...তাঁর আদর্শ নারীর মধ্যে আমরা দেখি অভিজাত্য, ক্ষমতা আর সৌন্দর্যময়তা। বিজ্ঞানী দা ভিক্টর চোখ দিয়ে আমরা একজন নারীকে চিনি।^{৫০}

তবে প্যাটারের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রশংসা এসেছে বিশ শতকে। ফাদার ব্রাউন চরিত্রের স্রষ্টা জি.কে চেস্টারটন *The Victorian Age in Literature* (১৯১৩) গ্রন্থে প্যাটারের গদ্যভঙ্গির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন যে, তা রাসকিনের রচনার মতোই উৎকৃষ্ট। চেস্টারটন লেখেন :

প্যাটারের মোনালিসা সংক্রান্ত অসাধারণ লেখাগুলো নিশ্চিতভাবেই সফল হয়েছে; যাতে তিনি তাকে মুহূর্তেই একজন ভালো এবং মন্দের রহস্য বানানোর অশেষা করেছেন। দর্শনটি ভূয়া; একেবারেই ভূয়া যে, আজকাল আর এটাতে কোনো ফলদায়ক কিছু হয় না। এমন কোনো নারী ছিলো না, এমনকি হাওয়াও নয়, যে প্রলুব্ধ করতে পারে, আবার হেলেনের মা এবং মাতা মেরির মতো হাসতে পারে।^{৫১}

অন্যদিকে অস্কার ওয়াইল্ড ১৮৯০ সালে *Nineteenth Century*-তে প্রথম প্রকাশিত তাঁর *The Critic as Artist*-এ লেখেন :

কে পরোয়া করে...মি: প্যাটার মোনালিসা'তে এমন কিছু আরোপ করেছেন যা লিওনার্দো স্বপ্নেও ভেবেছেন কি? শিল্পী এরকম হাসির কাছে দাসত্ব ক'রে থাকবেন...কিন্তু আমি যখনই লুভরে যাই এবং মৃদু আলোতে রাখা অস্বুত অবয়বটার দিকে তাকাই, বিড় বিড় ক'রে বলি, 'সে যে পাথরের ওপর ব'সে আছে তার চেয়েও সে বেশি প্রাচীন...'৫২

ওয়াইল্ড খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন, লিওনার্দো প্রতিকৃতিটিতে কখনই 'গৃসের পত্নত্ব, রোমের কামনা' ঢোকানোর চেষ্টা করেন নি। কিন্তু ঠিক সে কারণেই তিনি লেখেন, 'যে সমালোচনা আমি উদ্ধৃত করেছি সেটা খুবই উঁচু মানের। এতে শিল্পকর্মকে নতুন সৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখানো হয়েছে।'৫৩

অন্যদিকে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত সমারসেট মমের *Christmas Holiday* উপন্যাসে দেখা যায় লেসলি ও ভেনেশিয়া ম্যাসন বাচ্চাদের নিয়ে লুভর পরিদর্শনে গেছে। লেসলি বিস্তারিত শিল্প-সমঝদার, ভেনেশিয়া একজন পেশাদার চিত্রকরের কন্যা। তারা মোনালিসার পাশে থমকে দাঁড়ায় : '“ছবিটা দেখে আমার সবসময় যে অনুভূতির সৃষ্টি হয় সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না”, সে কথাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো।' এরপর তার স্বামী তাকে বলে :

'তোমার কি প্যাটারের ভেনেশিয়ার কথা একটু মনে পড়ছে?...মিসেস ম্যাসনের ঠোটে মৃদু রহস্যময় হাসি...সে বললো : 'এবার রাফায়েলকে দেখি চলো।'৫৪

১৯১৫ সালে তার আত্মজৈবনিক উপন্যাস *On Human Bondage*-এ সমার সেট: মম আরো শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ করেন, যদিও মাত্র এক জায়গাতেই। প্যারিসের এক রেস্তোরাঁয় উষ্ণ আলাপচারিতার সময়ে। বৃটিশ শিল্পকলার শিক্ষার্থীরা অবজ্ঞা করছে রাফায়েলকে, পূজা করছে ইমপ্রেশনিষ্টদের। একজন ঘোষণা করে : 'যখনই আমি পত্রিকা খুলে মহান কোনো ভিস্টোরিয়ানের মৃত্যুর খবর পড়ি, আমার মনে হয়, ঈশ্বর! তাদের আরো একজন চলে গেলো। তাদের একমাত্র প্রতিভা ছিলো দীর্ঘদিন টিকে

থাকা।' তারা রূপকার্থে কার্লাইল, রাসকিন, টেনিসন, ডিমেন্স ও আরো অনেকের সঙ্গে ভিক্টোরিয় যুগের চল্লিশজনকে দাহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সবশেষে আসে ওয়াল্টার প্যাটারের প্রসঙ্গ। '“কোনো ওয়াল্টার প্যাটার নয়,”' ফিলিপ বিড়বিড় করে বলেন। লসন তার দিকে সবুজ চোখে এক মুহূর্ত তাকায় এবং মাথা ঝাঁকায়। 'তুমি ঠিকই বলেছো, মোনালিসা'র জন্য ওয়াল্টার প্যাটারই একমাত্র বৈধতা।'৫৫

পরে ফিলিপকে মোনালিসা দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয় :

সে তার দিকে কিছুটা হতাশ হয়েই তাকালো, কিন্তু সে ওয়াল্টার প্যাটারের রত্নতুল্য লেখা যা পৃথিবীর সবচাইতে বিখ্যাত ছবিটাতে আরো বেশি সৌন্দর্য আরোপ করেছে সেটা শেষপর্যন্ত পড়েছিলো, মুগ্ধ করেছিলো। সেইসবই সে এখন মিস্ প্রাইসের কাছে পুনর্ব্যক্ত করলো। 'এটাতো সাহিত্য,' একটু বিরক্ত হয়েই সে বললো। 'এসব থেকে তোমাকে মুক্ত হতে হবে।'৫৬

অন্যান্য সাহিত্যিক নিজের এতোটা সরাসরি নয়। প্যাটারের মোনালিসা মূলত অন্যান্য কাল্পনিক *Femme fatale*-এরই অনুরূপ। যে কোনো প্রতীকী ভয়ংকর নারীর (যেমন হেলেন অব ট্রয়, ক্লিওপেট্রা, সালোমে, লুক্রেজিয়া বর্জিয়া প্রমুখ) সঙ্গে তার এই সাদৃশ্য নিশ্চিত করে যে, তাকেও এই জাদুবৃন্দে গ্রহণ করা হয়েছে। ওই সব নারীদের একটা পটভূমি ছিলো পুরাণ, কিংবদন্তী বা ইতিহাসের, *মোনালিসা* তার ব্যতিক্রম। তার ভয়ংকর এক নারীতে রূপান্তরিত হওয়ার ঐতিহাসিক কোনো পটভূমি দেখা যায় না। এ ছবির সম্ভাব্য সিটারদের (লিসা গেরার্দিনি, ইসাবেলা ওয়ালান্দা, ইসাবেলা দেস্তা প্রমুখ) যে পরিচয় জানা যায় তাতেও তাদেরকে *seductress* হিসেবে কল্পনা করা সম্ভব নয়। ছবিটিতেও কামুক বা জাদুকরী নারীর সামান্যতম চিহ্ন নেই। আসলে অতীতকালের ভয়ংকর মোহনীয় নারী হিসেবে *মোনালিসা*র সনাক্তকরণ পুরোপুরিভাবে আধুনিককালের প্রয়াস।

মোনালিসা তৈলচিত্রটি এক রহস্যময়ী নারীর প্রতিকৃতি—বিশ্ব এ ধারণাতেই আবিষ্ট। ঔপন্যাসিকেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার অবিরাম চাপের মধ্যে সাদামাটাভাবে প্রতিষ্ঠিত ক্লিশের (ক্লিশে মানে বহুল ব্যবহারের ফলে যে শব্দ ওজন হারিয়ে ফেলে; অনুবাদক) পুনরাবৃত্তি করতে পারেন না। গতিয়ের

ও প্যাটার কোনো ক্রিশে ব্যবহার করেন নি, তাঁরা বরং তা আবিষ্কার করেছেন। অন্য আর সবাই হয় গিওকোন্দার হাসি উপেক্ষা করে গেছে, নয়তো তা ব্যবহার করেছে তাদের পাঠকদের কাছে।

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ মোনালিসার হাসি অসংখ্য সাংস্কৃতিক রেফারেন্সের অংশে পরিণত হয়েছিলো। সেটা লেখক ও পাঠকদের মধ্যে একটা সহগামীর অনুভূতি সৃষ্টি করতো। যেনো পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখক বলছে, 'তুমি জানো আমি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করছি কারণ আমি লিখি চতুর পাঠকের জন্য; তোমার মতো মানুষ, আমাদের মতো মানুষ।' তবু একটা রেফারেন্স যতো বেশিবার পুনরাবৃত্তি করা হতো ততোই সেটা জোরালো হয়ে উঠতো, এবং নিশ্চিতভাবেই স্কুলবালক মার্সেল প্রাউস্ট এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যখন তিনি তাঁর বন্ধু লুসিয়ে দদঁকে ১৮৯৮ সালে একটি 'সুন্দর' চিঠি লিখেছিলেন 'ভিঞ্চির রহস্যময় হাসির ছবিটির কথা উল্লেখ করে'।^{৭৭}

প্যাটারের রচনাবলী প্রকাশিত হবার পর পরই মোনালিসা'র হাসির ব্যাখ্যা যেনো বহুগুণে বেড়ে গেলো। ১৯০৯ সালের মধ্যে এটা গবেষণার বিষয় হয়ে উঠলো। সালোমন রিনাখের লেখায় এর উল্লেখ পাওয়া যাবে।^{৭৮}

প্যাটার অথবা গতিয়েরের প্রভাব সরাসরি পরিলক্ষিত হয় নি। উদাহরণ হিসেবে অস্কার ওয়াইন্ডের কথা বলা যায়, তিনি অক্সফোর্ডে প্যাটারের পায়ের কাছে বসে রেনেসাঁ সম্পর্কে পাঠ নিয়েছিলেন, আর প্যাটার যখন মারা যান তখন তিনি মন্তব্য করেন 'সে কি কখনও জীবিত ছিলো?' কারণ ওয়াইন্ড পরবর্তীতে প্যাটারকে অশ্রদ্ধা করতে শুরু করেছিলেন। তারপরও জেলে বন্দী থাকার সময় ওয়াইন্ড প্যাটারের লেখাগুলো চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, বিশেষ করে তাঁর অসমাপ্ত *গ্যাসটন দ্য লাতুর*।^{৭৯} ওয়াইন্ড গতিয়েরেরও ভক্ত ছিলেন। তাঁর মাদামোয়াজেল দ্য মপিয়াঁ, এবং ১৮৮৫ সালে লেখা দ্য গোল্ডেন বুক অব স্পিরিট এ্যান্ড সেন্স-এরও ভক্ত ছিলেন।^{৮০}

অস্কার ওয়াইন্ডের কবিতা 'দ্য নিউ হেলেন' (১৮৮১) আসলে সুইনবার্নের কাছে ঋণী। কিন্তু এই কবিতায় আফ্রোদিতির যে বর্ণনা সেটা কিন্তু কিছুটা প্যাটারের কাছ থেকে নেয়া : তার আছে 'ঠাট্টার চোখ', 'সমুদ্র-ধোয়া ঠোঁট' এবং 'প্রাচীন স্মৃতির গহীনে' সে শায়িত আছে, এরকম।^{৮১} ১৮৭৪ সালে প্যাটারের লেখা প্রকাশিত হবার কিছু দিন পরে ওয়াইন্ড একটি দীর্ঘ কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। 'দ্য ফ্রিংস' নামের কবিতাটি কি সুইনবার্নের 'ডোলোরেস,' বোদলেয়ার, অথবা প্যাটারের মোনালিসা'র দ্বারা অনুপ্রাণিত? কবিতাটি পড়লে সেরকমই মনে হয়।^{৮২} ওয়াইন্ড তাঁর 'দ্য ফ্রিংস' কবিতার

কয়েকটি লাইন ব্যবহার করেছিলেন 'দ্য ক্রিটিক এ্যাজ আর্টিস্ট' নামক বইয়ে মোনালিসার হাসিকে বর্ণনা করার সময়।^{৬২} কবিতাটির কয়েকটি লাইন এমন :

তোমার চোখ দুটো কোনো স্বচ্ছ লেকের পানিতে
প্রতিফলিত পূর্ণিমার চাঁদের মতো,
তোমার জিভ যেনো টকটকে লাল কোনো সাপ যা নাচছে
সুমধুর সঙ্গীতের তালে তালে...^{৬৩}

ওয়াইল্ড তাঁর 'হিউম্যানিটাড' (১৮৮১) কবিতায় লিখেছেন, 'মোনালিসা তার চুল দিয়ে হাসছে', এটা হলো কম্পিত মেডুসা, ফিংস আর টুটি কোয়ান্টিদের মতোই।^{৬৪}

এই ইমেজটি প্যারোডি হবার জন্য প্রস্তুত ছিলো। ওয়াইল্ডের 'দ্য ফিংস উইদাউট এ সিফ্রেট'-এ লেখক প্যারিসে তাঁর এক পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা করেন। তাঁর বন্ধু জেরাল্ড মারচিসনকে খুব বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিলো। মারচিনসন জানায় সে এক রহস্যময় নারীর প্রেমে পড়েছে যে এখন মৃত। সে একটা ছবি বের করে তাঁকে দেখায়। লেখক তখন প্যাটারের মতোই বলে যান :

আমি সেটা খুব সাবধানে নিরীক্ষণ করলাম...এটার সৌন্দর্য
অনেক রহস্যময়তার সাথে মিলেমিশে আছে...তো, সে
অধৈর্য হয়ে বললো, তুমি কি বলো?

—সে হলো কৃষ্ণবর্ণের গিওকোন্দা, আমি জবাব
দিলাম।^{৬৫}

রোনাল্ড ফায়ারব্যাংক তাঁর ১৯৮৫ সালের *A study in temperament*-এ লেখেন, কোনো পেইন্টিংকে বর্ণনা করতে গেলে প্যাটারের হাঁচ থেকে বের হওয়াটা অসম্ভব হয়ে পড়ে।^{৬৬}

মোনালিসাকে একটা ভয়ংকর নারীতে রূপান্তর করতে বেশ চেষ্টা করতে হয়েছিলো। ১৮৩০'র দশকের শেষ দিকে তার কয়েকজন অনুयागी তাকে কামনা করেছিলো, যেমন চার্লস কোরানের 'Le Portrait de la Joconde' কবিতায় :

কতো প্রেমিক তাঁর (লিওনার্দোর) গিওকোন্দার কাছে ঋণী?
আমারও সুযোগ হয়েছিলো এক সকালে, ভাগ্য ছিলো
আমার সহায়;

লুভরের ভেতরে আমি তার খুব কাছে চলে এসেছিলাম;
আমার আশেপাশে কেউ ছিলো না তখন;
আইন ভঙ্গ করেছিলাম আমি—কমা ক'রে দিও লিওনার্দো
—তোমার মোনালিসা'র হাতে চুমু খেয়েছিলাম আমি ।^{১৭}

সাহিত্যে লিসার খ্যাতি ছড়ানো অব্যাহত ছিলো এভাবে, কেননা সে সময় একটি তৈলচিত্রের গুরুত্ব তুলে ধরার সবচেয়ে দ্রুততম মাধ্যম ছিলো সাহিত্য । মোনালিসার রহস্য ও হাসির সাহিত্যিক উল্লেখ থেকে একটা বিষয় বোঝা যায়; কোনো লেখক একটা গল্পে বিখ্যাত কোনো তৈলচিত্রের প্রসঙ্গ ব্যবহার করলে সেটাই বেছে নেন যেটা বেশ সুপরিচিত । ছবিটার কুখ্যাতির সঙ্গে এর যোগ থাকে আর অন্য আরেকজন লেখকও তার লেখার ওই ছবিটা ব্যবহারে অনুপ্রাণিত হন ।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক ১৮৭৩ সালে রচিত হেনরি জেমসের *The Sweet heart of Mr Briseux* ছোটো গল্পটির কথা । গল্পটি বর্ণনা করছে যে নারী চরিত্রটি লুভর দেখতে গিয়ে অনিবার্যভাবে দাঁড়ায় জোকোন্দের সামনে । তার সঙ্গী একজন চিত্রকর, ছবিটা কপি করার ঘোষণা দেয় সে, যদিও সমস্যার ব্যাপারে সে সচেতন । তবে ভালো পরামর্শ দেয় মেয়েটি : আমার ছবি আঁকো, সে বলে, আমিও সমস্যা হয়ে থাকবো । সেটা করতে গিয়ে মেয়েটি বিদ্রুটে মহিলার অভিনয় করে, ঝগড়াটে এবং ছলনাময়ী, এক 'সত্যিকারের' মোনালিসা'র মতো । চিত্রকর চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত দেয় । আরেক চিত্রকর, দরিদ্র তবে আরো প্রতিভাবান, এ কাজে এগিয়ে আসে এবং প্রতিকৃতিটা সম্পূর্ণ করার প্রস্তাব দেয় । সে সফল হয় এবং বিশাল খ্যাতি অর্জন করে । ফলস্বরূপ তরুণীটি আর কখনও তার দেখা পায় না, কিন্তু সে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় এই বলে যে, এক ধরনের অমরতা পেয়ে গেলো সে...অবিকল লিসা গেরার্দিনির মতো ।^{১৮} মহান এক শিল্পীর দ্বারা অফসৃত হয়ে কোনো নারী অমরতা অর্জন করতে পারে এই আইডিয়ায় দেখা পাওয়া যায় । আরেক বার জেমসেরই আরেকটি গল্পে, যেটার নাম *The Madonna of the Future* (এটাও ১৮৭৩ সালে লেখা)-এ একদা প্রতিশ্রুতিশীল কিন্তু কখনই যে ছবি বিক্রি করে নি এমন এক আমেরিকান চিত্রকরের কথা আলোচনা করতে গিয়ে একটি চরিত্র স্মরণ করে, 'নারীরা তাদের ছবি আঁকার জন্যে তাঁর সামনে গিয়ে বসার জন্য ব্যকুল, তারা লিওনার্দোর জোকোন্দের মতো অমর হতে চায় ।'^{১৯}

জেমস বার্নার্ড লংভিল নামে এক চিত্রকর অ্যানজেলো নামের এক তরুণীর স্কেচ করে। তাতে দেখা যায় দূরবর্তী অদ্ভুত পটভূমির সামনে ঝুল বারান্দায় বসে আছে ওই তরুণী। সিটার 'মনে হয় নিজেকে পীড়াদায়ক সৌন্দর্য হিসেবে উপস্থাপিত করার বাসনা পোষণ করে।' পরে তার বর্ণনা দেয়া হয়, সে বসে আছে, 'তার দু'হাত কোলে ওপর ফেলে, আর ঠোঁটে অবোধ্য হাসি এঁটে দিয়ে।' ^{৭০}

এগুলো ছিলো যৌবনের কাজ, কিন্তু মোনালিসা আইডিয়া হেনরি জেমসকে পরবর্তীকালেও মোহাবিষ্ট করেছে। *The Ambassadors* (১৯০৩)-এ অন্যতম চরিত্র মাদাম দ্য ভিওনেৎকে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে : 'সে বসে আছে আগুনের পাশেই, একটা ছোট্ট চেয়ারে...আর সে পেছনের দিকে হেলে নিজের হাত দুটো কোলের উপর রেখে স্থির হয়ে বসে আছে।' পরবর্তী সময়ে আমেরিকান চরিত্র লিউইস ল্যামবার্ট স্ট্রেথার লক্ষ্য করে : তার হাতটা অসম্ভব নিখুঁত আর মসৃণ, অনেকটা সুখকর কল্পনার মতো, একটি পুরাতত্ত্ব, একটা পুরনো মূল্যবান মেডেলের মতো, যেনো রেনেসাঁর রূপালি মুদ্রা...তিনি তাকে দেবীর সাথে তুলনা করতে পারেন...এবং আরো পরে 'যেভাবে সে স্বচ্ছ-পাতলা অবগুষ্ঠনটি পরে আছে...সেটা তার পোশাকে গভীরতা দান করেছে...সে বসে আছে শান্ত ভঙ্গিমায়, দু'হাত ভাঁজ ক'রে।' স্ট্রেথারের মনে হয়, 'যেনো সে নিজের জমিনের ওপর বসে আছে...আর তার পেছনের রহস্যময় বিস্তীর্ণ পটভূমি ছড়িয়ে রয়েছে।' ^{৭১}

আরো পরিব্যপ্ত চিত্র পাওয়া যায় জেমস জয়েসের *Portrait of the Artist as a Young Man* (১৯১৬) নামক কাহিনীতে। যেখানে লেখকেরই প্রতিমূর্তি স্টিফেন ডিডেলাস যৌনচিন্তায় পীড়িত এক তরুণীর কথা গভীরভাবে কল্পনা করেছে :

সে এমন একজন যার জাদু বদলে গিয়ে সুন্দর আর অদ্ভুত গাঙচিলে রূপান্তরিত হয়েছে...তার স্তনযুগল পাখির পালকের মতোই নরম আর পেলব, নরম আর পেলব কোনো গাঢ় রঙের ঘুঘুর মতো...সে একা, চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে; যখন সে টের পায় তার আশেপাশে ও এসেছে এবং ওর চোখের বন্দনা করেছে তখন সে তার দিকে তাকায়, লজ্জা আর কামনা ছাড়াই। দীর্ঘদিন ধরে সে ওর দৃষ্টিকে দেখেছে, তারপর নিরবে তার চোখ সরিয়ে নিয়েছে ওর ওপর থেকে।

স্টিফেনের ওপর এই ভাবনা প্রতিক্রিয়া হয় তাত্ক্ষণিক :

হায় ঈশ্বর! স্টিফেনের আত্মা চিৎকার ক'রে বলে
অনির্বচনীয় এক আনন্দে...ছবিটা তার হৃদয়ে প্রবেশ
ক'রে ফেলেছে আর তার পবিত্র উচ্ছ্বাসের কোনো
ভাষা সে খুঁজে পাচ্ছে না। ওর চোখ তাকে আহ্বান
করে, তার হৃদয় ছুটে যায় সেই আহ্বানে। এক বন্য
পরী তার সামনে আবির্ভূত হলো, চিরযৌবনা আর
সুন্দর এক পরী যেনো।^{৭২}

দশ বছর পর স্টিফেন যখন যৌন মোহাবিষ্ট, সেই তরুণীর কথা স্মরণ
করেন আর সেই রাস্তার গান যা তিনি রচনা করেছিলেন মেয়েটির জন্য :

গানের কথা তার মধ্যে আবার ফিরে এলো : এখনও তুমি
আমাদের ব্যাকুল দৃষ্টি ধরে রেখেছো নির্বাক মুখে, অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে! এভাবে কি তুমি ক্লান্ত হও না? বলো
আর নয় কোনো বিষন্ন দিশ।^{৭৩}

হিউ কেনারের মতে তাঁর গদ্য এখনও 'কোর্ট নিউম্যান এবং প্যাটার'
তুল্য।^{৭৪} স্টিফেন এক শিল্প সংক্রান্ত আলোচনায় বলেছেন, 'একটা চেয়ারকে
কি ট্রাজিক অথবা কমিকের জন্য চমৎকারভাবে তৈরি করা হয়? মোনালিসার
ছবিটা কি ভালো, যদি আমি সেটা দেখতে চাই?'^{৭৫}

কবি জেমস্ ক্লারেন্স ম্যানগারের ওপর আগের একটি রচনায় জয়েসের
কবিতায় কল্পনাপ্রসূত সুন্দরের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার সময় প্যাটারের গদ্য
অনুকরণ ক'রে লেখেন :

তার মুখকে কেন্দ্র ক'রে একটি দৃশ্য আর একটি জগতের
জন্ম হয়েছে, যেমনটি ভালোবাসা নিহিত আছে এরকম সব
চোখের বেলায় হয়ে থাকে। ভিস্তোরিয়া কোলোনা, লরা এবং
বিয়াত্রিস— মোনালিসার মতোই নিরব ভালোবাসা...^{৭৬}

ইতিমধ্যে মোনালিসা *femme fatale* শ্রেণী থেকে ধীরে ধীরে ভিন্নরূপ

নিতে থাকে। যৌথ অবচেতনে প্রবেশ করলো মোনালিসা। নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়ে গেছে ততোদিনে। গণসংস্কৃতি কাছে ব্যাপকভাবে আবিষ্কৃত হবার মুখে তখন এই প্রতিকৃতি। বিশ শতকের ইতিহাসে এটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তৈলচিত্রের ইমেজের ওপর থেকে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছিলো।

উনিশ শতকের সাহিত্যে মোনালিসার উল্লেখে কিছুটা হলেও নির্দেশিত ছিলো : ঐ তৈলচিত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন বুদ্ধিজীবী, তাঁরা সচেতন ছিলেন না যে, অচিরেই এটি গণসংস্কৃতির অধিকারে চলে যাবে। বিশ শতকের শেষভাবে একজন আঁতা-গার্দে কবি পরিষ্কার কণ্ঠে ঘোষণা করেন, তার সৌন্দর্যের আদর্শরূপ ভেনাস দ্য মিলো এবং মোনালিসা। মার্লমে এ ব্যাপারে ১৮৬৭ সালে বলেছেন : ‘তাদেরকে এ বিশ্বের সবচাইতে সেরা সুন্দরী বলেই মনে হয়’, তিনি রহস্যময় হাসির কথাও লিখেছিলেন সেই লেখায়।^{৭৭}

১৯০০ সালের মার্সেল প্রাউস্টও একইরকম তুলনা করেন হাসিটিকে নিয়ে।^{৭৮} গিওকোন্দার হাসিটি হয়ে উঠলো বিপজ্জনক আর ছলনাময়। এলিমির বোর্হেসের বেস্টসেলিং উপন্যাস *Le crepuscule des dieux*-এর চরিত্র গিউলিয়া বেলফ্রেদি, যে কিনা একজন ইতালিয় সোপ অপেরা গায়িকা, সে তার হাসির আড়ালে ক্ষমতালোভী আর ভয়ংকর একজন। বোর্হেস তাকে ‘পুরুষের আত্মা’ হিসেবে বিবৃত করেছেন।^{৭৯}

জ্যঁ লোরেই’র উপন্যাস *Tress rusee* (১৮৮৬)-তে *femme fatale* চরিত্র মাদাম লিভিভিনোফ ইতালির বাসিন্দা নয়, সে রাশিয়ার, ‘তুষাড় আর রাজহাসের দেশের।’^{৮০} তার অতীত জুড়ে আছে : ‘কাদা, সোনা আর রক্ত।’^{৮১} তার হাসি গিওকোন্দার মতোই প্রহেলিকাময়, তীব্র যন্ত্রণার আর নির্মম। সে বলে, ‘কখনও বৃদ্ধা না হবার বাসনাই সবসময় পোষণ করি।’^{৮২}

ই.এম ফস্টারের এ রুম উইথ এ ভিউ (১৯০৭) উপন্যাসের নায়িকা লুসি হানিচার্চ রহস্যময় হয়ে ওঠে :

এটা তাকে আলো দিয়েছে...এটা তাকে অন্ধকার দিয়েছে...সে যেনো লিওনার্দো দা ভিঞ্চির এক নারী, যাকে আমরা খুব একটা ভালোবাসি না, কারণ সে আমাদেরকে কিছুই বলবে না...^{৮৩}

রূপকটি (বিপজ্জনক নারী=মোনালিসা) ক্রমাগতভাবেই একটি ছাঁচে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছিলো। কেউ কেউ গিওকোন্দাকে অপেক্ষাকৃত কম

স্মৃতিকর হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও করেছেন। ১৯০৮ সালে সমালোচক রেনে বোনাফেন বলেছেন : লুভরের ছবিটা কেবল ছবি নয় বরং সেটা আবিষ্কার করা একটি ইমেজ।^{৮৪} তাঁর মতে লিওনার্দো নগ্ন গিওকোন্দাকে অদ্রুপ দিয়েছেন। তার হাসি চাহনি সব কিছুই মার্জিত করে এঁকেছেন। তাকে পোশাক পরা অবস্থায় উপস্থিত করেছেন। হাসিটি তাই মিষ্টি হয়ে উঠেছে। নারাপ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য একটা অবগুষ্ঠন আঁকা হয়েছে। 'ছোট স্তন জোড়া আর কোমল হাত দুটো কাপড়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। ফলাফল, মোনালিসা হয়ে উঠলো সুপরিচিত এবং প্রেমের প্রতীক। লিওনার্দো এই গুহকিরণ করেছেন কারণ, বোনাফেন মনে করেন, তিনি বুঝতেন পুরুষের জীবনে নারীর ভূমিকা কেমন হবে : তাকে আশ্বস্ত করা যে, সে তাকে ভালোবাসে।^{৮৫} অন্য কথায়, মোনালিসা রোমান্টিক প্রলুব্ধকারিণী থেকে আদর্শ মা এবং বিশ্বস্ত স্ত্রী হিসেবেই প্রতিপন্ন হয়ে উঠলো—সম্ভবত যে রকমটি লিসা গেরার্দিনি বাস্তব জীবনে ছিলেন। বোনাফেনের মতে, হাসিটি মোটেই রহস্যময় নয়, বরং 'প্রেমময়ী স্ত্রীর স্বামীর প্রতি এক ধরনের বিশেষ চাহনি।^{৮৬}

প্রত্যাশিতভাবেই বোনাফেনের প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হয়েছিলো। শাস্তিষ্টি ঘরোয়া স্ত্রীদের তুলনায় বিপজ্জনক নারী বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। অনেক নারীও এটা মেনে নিয়েছে। ১৯০২ সালে মাদাম পারদ্রিন্দ-ভেসিয়ে তাঁর এক কবিতা উৎসর্গ করেন নাট্যকার এদুয়ার্দো শিউরেকে : 'আমরা একাকী, আমরা দু'জন, জোকোন্দে', আরো বলেছেন, 'সুন্দর আর রহস্যময় ছবি, তুমি আমাকে আকর্ষিত করো,/হাসো, জোকোন্দে! তোমার চাহনিতে আমি আবারো পেয়েছি/সব গোপন কথা, যা সবই সীমাহীন, এর সবটাই জীবন!'^{৮৭}

তবে একবার একটা ইমেজ সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তার বদল ঘটানো কঠিন। সত্যিকারের বৈশ্বিক বস্তুতে পরিণত হতে মোনালিসারও বেশ কিছু সময় লেগেছিলো।

উনিশ শতকের শেষেও ইতালিতে যথার্থ *femme fatale* হয়ে উঠতে পারে নি মোনালিসা। ইতালি ভাষায় *Ka Gioconda* শব্দের অর্থ 'The happy one,' মানে 'সুখীজন,' সেখানে এ শব্দ ব্যবহৃত হয় মোনালিসার উল্লেখ ছাড়াই।

গুস্তাভো ট্রাফোরেল্লো'র *Il primo amore di leonardo da vinci* উপন্যাসটি লিওনার্দোর জীবনী ভিত্তিক উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়, সেখানে কিন্তু লিওনার্দোকে তাঁর শিক্ষক ভেরোক্কিও'র মেয়ে এনজেলার সাথে প্রেম করতে দেখানো হয়েছে, লিসার সাথে নয়।^{৮৮} কিন্তু এমনকি ফ্রান্সেও

‘জোকোন্দে’ পদবাচ্যটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছবিটার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না। উদাহরণ হিসেবে মাথিলদে আলানিকের *La Romance de la Joconde* (১৯০৮) উপন্যাসে ক্যাথলিক নৈতিকতাকে মহিমাম্বিত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেখানে মোনার কোনো উল্লেখ নেই।^{১৯} মরিস মতেঁগুয়ে’র লো শেভাশিয়ে দ্য লা জোকোন্দে (‘দ্য রাইড্‌স অব দি জোকোন্দে,’ ১৯০১) বইটি না ভিক্টর অমর মোনালিসা নিয়ে, না এ সংক্রান্ত কোনো কাহিনী নিয়ে।^{২০}

বিশ বছর পর মতেঁগুয়ে তাঁর জোকোন্দেকে মোনালিসাতে রূপান্তরিত করেন। এখানে তাঁর গল্পে এক সুন্দরী সভাসুন্দরীর কাহিনী বিবৃত হয়েছে।^{২১} সেখানে এক জায়গাতে এক চরিত্র বলে : ‘চিরকালের জন্য আশীর্বাদপুষ্ট হও... এবার আমি মরতে পারি : আমি সুন্দরকে চিনেছি।’^{২২}

গ্যাব্রিয়েল দানুনজিও (১৮৬৩-১৯৩৮) কর্তৃক মোনালিসা ‘পুণরায় আমদানী’ হবার আগপর্যন্ত ইতালিতে মোনালিসা অবজ্ঞায়িতই ছিলো। সেখানে লিওনার্দোর *The last supper*-ই সেরা কাজ বলে সবাই মানতো। পরবর্তীতে তারা গিওকোন্দাকে রহস্যমুক্ত হিসেবে দেখতে পেয়েছে, যা কিনা তাদের দেশেরই এক বরণ্য শিল্পী কর্তৃক আঁকা আর ছবিটা এক ফ্লোরেন্টাইন মহিলার।^{২৩} উনিশ শতকের শেষের দিকে লিওনার্দোকে ইতালিয়রা গতিয়ের বা প্যাটারের মতো করে দেখতো না, তারা মনে করতো লিওনার্দো একজন দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীও বটে। ১৯১৯ সালের দিকে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলো তাঁকে—লিওনার্দো কোনো বিশ্বজনীন প্রতিভা নন। ঐতিহাসিক ফ্রান্সেসকো আরসতানো মন্তব্য করেন যে, লিওনার্দো হলেন একজন চিরাচরিত ইতালিয়, তিনি ফরাসিদের মতো নন, আবার ইংরেজদের মতোও নন; তিনি জার্মানদের মতো তো ননই।^{২৪}

দানুনজিও’র অবস্থানটি ছিলো আলাদা। গতিয়ের, সুইনবার্ন, ফরাসি এবং ইংরেজ বংশোদ্ভূত লেখকেরা ছিলেন প্রাক রাফায়েলিয়—তাঁরাই তাঁকে প্রভাবিত এবং মুগ্ধ করেছে।^{২৫} দানুনজিওকে একজন অনুকরণকারী এবং আমদানীকারক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।^{২৬}

তাঁর ফরাসি ইংরেজ আদর্শের মতোই, দানুনজিও ইতালিয় রেনেসাঁর মহান চিত্র-কর্মগুলোর উল্লেখ করতেন নিজের রচনায়। তাঁর কবিতা *Al poeta Andrea sperelli* (১৮৮৯)-এর প্রধান থিম ছিলো লিওনার্দোর ‘উদ্বিগ্ন সত্তা’।^{২৭} ১৯১১ সালে মোনালিসা চুরি হবার পর দানুনজিও কবিতার শিরোনামে *La Gioconda* যোগ করে দেন। ২১শে আগস্ট ছবিটি চুরি

হলে ২৫শে আগস্টেই তিনি নতুন শিরোনামে কবিতাটি প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেন ছবিটি চুরির দিনই কবিতাটি তিনি লিখেছেন।^{৯৮}

দানুনজিও ১৮৯০ সালে *Gorgon* কবিতায় মোনালিসা'র উল্লেখ করেছেন :

উদ্ভাসিত হাসি, কতো সুন্দর, কতো নির্মম, স্বর্গীয় সত্তা
লিওনার্দো সেটা তাঁর ক্যানভাসে উপস্থাপিত করেছেন। এই
হাসিটি বিষন্ন হাসির সাথে বৈসাদৃশ্য তৈরি করেছে; এটা
মহান ভিক্ষুর ভালোবাসার সুন্দর মুখটাকে অতিমানবীয়
আকর্ষণ দান করেছে।

এই অভিজাত রমণী ব'সে আছে—কোথায় আর?—একটা বেলকনিতে।
কবির উপস্থিতিতে আকর্ষিত হয়ে, সে তাঁর দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে।
অপ্রতিরোধ্যভাবেই সে হাসছে। কবি তার প্রেমে পড়েছেন। সে তাই হাসছে
এবং তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে। কবি মরিয়া হয়ে উঠেছেন : 'ওহ রমণী, তুমি,
একমাত্র তুমি, তুমিই সেইজন যাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি!'^{৯৯}

দানুনজিও *La Gioconda* (১৮৯৯) নামের পাঁচ অঙ্কের একটি নাটকও
লিখেছিলেন। নাটকটি তাঁর আত্মজীবনীর ছায়াও বলা যায়—তাঁর রক্ষিতা
দিভা ইলিওনোরা ডিউজ চরিত্রটিও ছিলো, যে কিছু দিন আগে তাঁর স্ত্রীর
শ্রুতিভিষিক্ত হয়েছে। নাটকটি ফ্রুপ হয়েছিলো।^{১০০}

পূর্ববর্তী যুগে প্রচলিত রূপক (ভয়ংকর নারী মোনালিসা) দ্রুত একটা ক্লিশে
(বহু ব্যবহারের ফলে যে শব্দ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে, অনুবাদক) পরিণত
হয়েছিলো। তবে গিওকোন্দাকে আরো কম হুমকি হিসেবে নতুন করে চিত্রিত
করার কিছু চেষ্টাও হয়েছিলো।

উনিশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপিয়ান সংস্কৃতিতে, মোনালিসা'র
হাসি পেইন্টিং-এর মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছিলো, আর যারা লিসা গেরার্ডিনির
প্রতিকৃতি নিয়ে চিন্তা করতো তাদের সবার জন্য প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা
সূচনাবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলো—এটা আজকের দিনেও বিদ্যমান। 'রহস্যময়
হাসি' সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, অন্তত আটলান্টিকের উভয় পাশের সাংস্কৃতিক
অভিজাতদের মধ্যে। তখনও এটা পশ্চিমা মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের
কাছে অপরিচিত ছিলো। ১৯০০ সালে ব্যদেকার পর্যটকদের বলেন যে,
লুভরের সবচেয়ে সেরা সম্পদ ভেনাস দ্য মিলো। অন্যদিকে মোনালিসা হচ্ছে

: 'এই বিশ্বের সবচাইতে বিখ্যাত ছবি (নারীর), স্ফিংসতুল্য হাসিটি যা যুগ যুগ ধরে কবি এবং শিল্পীদের আলোচনার বিষয় হয়ে ছিলো এবং এখনও সেটা মলিন আর বিবর্ণ ক্যানভাসে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও চমৎকৃত করে সবাইকে।'^{১০১}

কেউ কেউ অবশ্য এসব বাগাড়ম্বর ত্যাগ করতে শুরু করেছিলো। ১৮৯৪ সালে *Nouvelle revue* পত্রিকার জন্য লিওনার্দো বিষয়ক রচনা *Introduction a la methode de Leonard de Vinci*-তে পল ভালেরি লেখেন, 'জোকোন্দের হাসি কিছুই ভাবায় না...আমাকে ভাবায় লিওনার্দো।'^{১০২} ১৮৯১ সালে ফরাসি ঔপন্যাসিক ও রাজনীতিবিদ মরিস ব্যারেস লেখেন যে, লিওনার্দোর হাস্যোজ্জ্বল নারীরা 'যন্ত্রণার দিকে তাকিয়ে হাসে আর তাদেরকে কী আকর্ষণ করে সেটাও আমরা খুঁজে দেখি।' ১৮৮৪ সালে আর্নেস্ট ফেনোল্লোসা নামক বোস্টনের এক জাপানি চিত্রকলার পণ্ডিত *The Book of Tea*-এর লেখক কাকুসো কোকুরার সাথে ভ্রমণকালে নারা'র নিকটে একটি ক্যানন-এর মূর্তি আবিষ্কার করেছিলেন, মূর্তিটি বৌদ্ধদের ক্ষমা ও করুণার দেবী হিসেবে পরিচিত। তিনি এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'দা ভিক্সির মোনালিসার মতোই'।^{১০৪}

আর শুধু ইউরোপেই নয়, মোনালিসার শৈল্পিক আবেদন ওই মহাদেশের বাইরেও প্রসারিত হয়েছিলো। রুশ লেখক দিমিত্রি মেরেজকোভস্কির *The Resurrection of the Gods* (১৯০০) প্রকাশ হলে মোনালিসার জনপ্রিয়তা আরো বিস্তৃত হয়। এটি আসলে উপন্যাসের আকারে লিওনার্দোর জীবনীগ্রন্থ। এতে একটা পুট এবং সংলাপও আছে। রুশ লেখক সহজলভ্য সব সূত্রই ব্যবহার করেছেন এবং শূন্যতার জায়গাগুলো পূরণ করেছেন কল্পনা দিয়ে। লিওনার্দো, তাঁর সহকারীদের কাছে পিতৃতুল্য একজন ছিলেন। এক কৌতুহলী মন, যে কিনা বিজ্ঞানী এবং দ্য লাস্ট সাপার'র নির্মাতা, তিনি কোনো কিছুই শেষ করতে পারতেন না। এভাবে মোনালিসা'র স্বামীকে উপন্যাসে নতুন প্রজাতির সিসিলিয়ান গরুর উদ্ভাবনের কৃতিত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।^{১০৫} মোনালিসা লিওনার্দোর প্রেমে পড়েছে, তাই তার ছবিটা যেনো লিওনার্দোর মতো দেখতে হয়—এঁটাই সে চেয়েছিলো। এই মটিফটা বিংশ শতাব্দীতে প্রবল হয়ে ওঠে।^{১০৬} লিওনার্দো বুঝতে পেরেছিলেন মোনালিসার রয়েছে বিশেষ ধরনের বুদ্ধিমত্তা : নারীর বুদ্ধিমত্তা, এক ধরণের 'পয়গম্বরিয় প্রজ্ঞা'।^{১০৭} লিওনার্দো ঘোষণা দেন, তাঁর প্রেম একভাবেই প্রকাশিত হয়েছে : তার ছবিটা এঁকে, তাকে এক অমর চিত্রকর্মে রূপান্তর করা মধ্য দিয়ে।

মেরেজকোভস্কি'র বিশেষ অবদান ছিলো উনিশ শতকীর পেইন্টিংয়ের দৃষ্টি ভঙ্গি তৈরিতে : এটা আর কেবল লিওনার্দোর মানসজাত হয়ে রইলো না। মডেলকে নির্বাসন দেয়া হলো, যাতে সৃষ্টিটা সৃষ্টিকর্তার সমতুল্য হয়ে ওঠে। ১৫০৬ সালে মেরেজকোভস্কির এক গল্পে ইতালির দক্ষিণের পোভেনজার নিকটবর্তী লাগোনেগরো'তে বাহাস্তর বছর বয়সে লিসা মারা যায়, তার স্বামী তখন ব্যবসার কাজে বাইরে ছিলো। ১৯৯১ সালের ২৮শে আগস্ট ইতালিয় দৈনিক *গাজেত্তা দেল মেজ্জোগিওরনা* মেরেজকোভস্কির গল্পটা পুনরায় সামনে নিয়ে আসে। লাগোনেগরো'র অধিবাসীরা এই অপ্রত্যাশিত সম্মানকে লুফে নিয়ে এটাকে তারা পূর্ণ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো।^{১০৬} শহরটা পর্যটকদের আকর্ষণের জায়গা হয়ে উঠলো তখন থেকে।

মেরেজকোভস্কির সফল গ্রন্থটি থেকে অনুপ্রেরণা পান ফ্রান্সেস্কো কাজ্জামিনি মুসি ও মারিনো মোরেত্তি। তারা ১৯০৯ সালে *Leonardo da Vinci* নামে চার-অংকের একটা নাটক লেখেন।^{১০৭} তাছাড়া এদুয়াদ তরেও এতে অনুপ্রাণিত হোন এবং *Leonardo da Vinci* (১৯০৫) নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক লেখেন। এতে লিসা গেরার্দিনির সাথে সাক্ষাতের সঙ্গে লিওনার্দোর আধুনিকত্বকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট বলে দেখানো হয়।^{১০৮}

নাটকটি মিলানের লিওনার্দো ল্যাবরেটরিতে মঞ্চস্থ হয়। লিওনার্দো একজন ভবঘুরে আর ব্যস্ত মানুষ, মেয়েদের ব্যাপারে যার সময় দেবার মতো কোনো সময় নেই।^{১০৯} লোদোভিকোর অল্পবয়স্কা রক্ষিতা লুফ্রেজিয়া ফ্রিভেল্লির নজরে এই বিষয়টা ধরা পড়লো (যার ছবি লিওনার্দো এঁকেছিলেন, *La Belle Ferronmiere*, লুভরে রক্ষিত আছে সেটা)। এই লুফ্রেজিয়া লিসাকে উদ্দেশ্য করে বলে : 'তোমার অতীত, তোমার বর্তমান, ভবিষ্যৎ, সবকিছুই আমার কাছে রহস্যময় লাগে।'^{১১০} লিসা ব্যাখ্যা করে বলে যে, সে গিওকোন্দাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু তার সাথে প্রথম রাত কাটিয়েই তার জঘন্য লেগেছে। 'আমি নিজেকে খুন করতে চেয়েছিলাম,' সে বলে।^{১১১} সে পালিয়ে গিয়ে মনের মানুষকে পেয়ে যায়। 'সে কে?' লুফ্রেজিয়া জিজ্ঞেস করে। তার জবাব : 'সে হলো পুরুষের মধ্যে সেরা।' 'এটা কি লিওনার্দো?' লুফ্রেজিয়া আবারো জিজ্ঞেস করে।^{১১২} লিসার জবাব : 'আমি যখন প্রথম তাঁর ছবিটার দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছি তখনই বুঝে গেছি, সে আমার প্রভু।' কিন্তু লুফ্রেজিয়া আতকে উঠে বলে, 'তুমি কি জানো না লিওনার্দো কখনও কোনো নারীকে ভালোবাসে না, সে কখনই কোনো নারীকে ভালোবাসবে না?'

যাইহোক, তরে'র লিওনার্দো যখন প্রথম মোনালিসাকে দেখলেন তখন তিনি বললেন :

এই একটি অবয়বে আমি খুঁজে পেয়েছি মেঘুসা এবং ম্যাডোনাকে । এই বিষয় হাসিতে আমি পেয়েছি ভালো ও মন্দের বিজ্ঞান...তুমি তোমার ছলনাময়ী চোখ দিয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করো । তুমি তোমার ঐ বাঁকা ঠোঁটের কোণ দিয়ে হাসো ।^{১১৫}

এবার মোনালিসার প্রেমে পাগল হয়ে লিওনার্দো তাঁর ছবি আঁকতে শুরু করলেন । 'বাচ্চাটা হবে আমাদের দু'জনের', লিওনার্দো তাকে বললেন । সে জবাব দিলো, 'হ্যা, তবে, অদ্ভুত এক বাচ্চা যে, তার মা-বাবার সাথে ঠাট্টা করবে ।'^{১১৬} লিসা লিওনার্দোকে তাকে ইলোপ করতে প্ররোচিত করে । কিন্তু লিওনার্দো তখন মানুষের ওড়ার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে ব্যস্ত । তিনি বললেন, 'আমার ডানা দুটো আমাকে ডাকছে, লিসা । তাদেরকে কেটে ফেলার চেষ্টা করো না ।' তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । মরিয়া হয়ে লিসা সিদোনিয়া নামের এলকেমিকে বলে তাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলতে, কিন্তু সিদোনিয়া তাকে উপদেশ দেয় নিজে না মরে তার স্বামীকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলতে । লিসা একমত হলেও শেষে সে নিজেই বিষ পান করে । মারা যাবার সময় সে ভবিষ্যৎবাণী করে :

লিওনার্দো...আমি অমর হয়ে যাচ্ছি, এক বিজয়ী নারী...তোমার গিওকোন্দা হাসছে ।^{১১৭}

মেরেজকোভাকির বইটি প্রভাবিত করেছিলো বিশ শতকের অন্যতম মহান এক তাত্ত্বিককেও । তিনি সিগমুন্ড ফ্রয়েড । তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর প্রিয় বইগুলোর ভেতর মেরেজকোভাকির বইটিও আছে । এরপর মোনালিসাকে নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও যে হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । ফ্রয়েড স্বয়ং সে কাজটি করেছিলেন । মিশরিয়রা এক মাতৃদেবীকে পূজা করতো, সেটার প্রতিনিধিত্ব করতো এক শকুন । ফ্রয়েড মনে করতেন পাখিটির লেজ ছিলো আসলে লিঙ্গের প্রতিচ্ছবি ।^{১১৮} লিওনার্দো ছিলেন অবৈধ সন্তান, তিনি তাঁর মা'র কাছে বেড়ে ওঠেন । তাঁর মা তাঁর সমকামীতার ব্যাপারটা জানতেন ।

এরপর ক্রয়েড 'সুন্দরী ফ্রোয়েটাইন মোনালিসার মুখের দিকে তাকালেন... এই হাসিটি ব্যাখ্যার দাবি রাখে।'^{১১৯} তিনি 'এটাকে ভূকম্পীভূত সত্য' বলে মেনে নেন এবং সন্তব্য করেন যে, 'হাসিটি যতোটা না শিল্পীর সৃষ্টি, তার চেয়ে বেশি বিগত চারশ' বছরের চর্চার ফসল, বিশেষ করে যারা তার দিকে তাকায়, তাদের চর্চার ফসল এটি।'^{১২০} ক্রয়েড সমাধান দেন যে, হাসিটি আসলে লিওনার্দো'র মায়ে'র, এই একই হাসি তিনি সেন্ট এ্যান-এর মুখেও পুনরুৎপাদন করেছেন।'^{১২১} এটা বর্তমান সময়ের প্রতিষ্ঠিত ধারণা যে, পুরুষ তার মায়ীর মধ্যে নিজের মাকে খুঁজে থাকে, সেই মতামতকেই নিশ্চিত করে।

ক্রয়েডের অনেক সমালোচক ক্রয়েডের বা-শকুনের আখ্যানটির সমালোচনা করেছেন কারণ অনুবাদ করতে গিয়ে ক্রয়েড ভুল করে কলেছিলেন বলে। ক্রয়েডও এ ব্যাপারে ১৯২০ সালে সচেতন হয়ে ওঠেন, কিন্তু নিজের রচনা সংশোধন করতে অস্বীকৃতি জানান।'^{১২২} তাঁর প্রথমতম দুর্বলতা ছিলো আসলে যেনো ইতিহাসকে ভুলভাবে বোঝা, যেটা পরবর্তীতে যেরার শ্যাণিরো দেখিয়ে দিয়েছিলেন।'^{১২৩} ক্রয়েড আসলে তাঁর বিশ্লেষণটি তৈরি করেছিলেন উনশ শতকের সাহিত্যের *femme fatale* যিখের ভিত্তি উপর নির্ভর করে।'^{১২৪} পেইন্টিংয়ের শিল্পীর সম্পর্কে কু বোঝার কথা দিয়ে ক্রয়েড শিল্প-ইতিহাস পবেষণার নতুন একটি দিকের উন্মেষ ঘটান কলা যায়।'^{১২৫}

বিশ্লেষকদের কাছে লিওনার্দো অবশ্যই চমককার একটি বিষয়। ইনি হলেন বিশ্বজনীন এক প্রতিভা, যিনি অবেধ সন্তান, কেঁকে উঠেছেন মায়' কাছে এবং সন্তব্য একজন সমকামীও, তাঁর অবশ্যই অনেক সমস্যা ছিলো। সম্ভবত, তিনি একজন স্যাডিস্টও ছিলেন (মৃত্যুদণ্ডের হাতিয়ার নির্বাণ করেছিলেন, বাতাসের পছন্দ করতেন না...), তিনি অবশ্যই একজন নিরানুগত্যবাদী ছিলেন। আর কোনো কিছু শেষ করার কল্যাণ ছিলেন একেবারেই অসমর্থ। পরিত্যক্তভাবেই জটিল এক চরিত্র, আর সেটা উন্মোচিত হবার দাবি রাখে।'^{১২৬}

হাসার জন্য মোনালিসার কিছু একটা ছিলো। ১৮০০ সালের দিকে ছবিটা খুব কম লোকেই চিনতো আর তারা এটাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্মও বলতো না। কিন্তু একশ' বছর বাসে এটা বিশ্লেষিত, আলোচিত এবং সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে। আর বর্তমান ভাষা প্রযুক্তির যুগে এটি এর শৈল্পিক ওশাওণ ছড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। মোনালিসা হয়ে উঠেছে সর্ব পরিচিত এবং চর্চিত একটি বিষয়।

সপ্তম অধ্যায়

মোনা অপহরণ

কুখ্যাত, বিখ্যাত অথবা যশলাভের জন্যে ব্যক্তিগত সক্ষমতা, কিঞ্চিৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এমন কি ধূর্ততারও প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিভাবান হওয়াটা এক্ষেত্রে সহায়ক তবে অপরিহার্য নয়। মৌলিক বিষয় সবসময়ই আলোচিত আর গোচরীভূত হয় এবং সেটি মনোযোগ, তর্ক-বিতর্ক আর রহস্যময়তার কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচিত হয়। সহজলভ্য সবধরনের যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার ও কাজে লাগানোই হলো মূল উদ্দেশ্য।

বিশ শতকের শুরুর দিকে কারো নিজ কীর্তি পুনরাবৃত্তির মতো মোনালিসার মতো অসাড় ও জড় বস্তুটি উল্লেখযোগ্য খ্যাতি অর্জন করে ফেলে। ক্রমে তা বিশ্বের সর্বাধিক পরিচিত শিল্পকর্মগুলোর শীর্ষ তালিকায় উঠে আসতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী কয়েক যুগের মধ্যে তা নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীদের বহু পেছনে ঠেলে খ্যাতির শীর্ষে উঠে আসে আর সারা দুনিয়ার মনোযোগের কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯০০ সালের দিকে এটির কপি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো, গল্পে এর বর্ণনা আসছিলো, এটিকে পূর্ণাঙ্গ নারীর বিস্ময়কর অংশ বলেও মহিমাম্বিত করা হচ্ছিলো। তার স্রষ্টাও বিশ্বমানবের পর্যায়ে উঠে এসেছিলেন সেই সঙ্গে। এতো কিছু পরেও তখন পর্যন্ত এর পরিচিতি ছিলো কিন্তু মুষ্টিমেয় অভিজাত মহলেই।

উনবিংশ শতকের সংস্কৃতির ওপর মূলত আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন ওই সমস্ত বুদ্ধিজীবী যারা অপরাধ ও ভৌতিক গল্প, সায়েন্স ফিকশন, জনপ্রিয় সংগীত, জনপ্রিয় সংবাদপত্র, ভ্যারাইটি শো ইত্যাদির স্রষ্টা ছিলেন। গণসংস্কৃতি কেন্দ্রিক বিষয়াবলীর মৌলিক ভিত্তিকে উন্নত ও বিস্তৃত করেছেন তারা। কিন্তু প্রকৃত উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য প্রকৌশলগত সুবিধাদি ও পরিবর্তিত সামাজিক

অবস্থা উভয়ই জরুরি ছিলো। ১৮৫০ সালের দিকে স্বাভাবিকভাবেই বই ছিলো দুর্মূল্য ও দামি পণ্য। গণমুদ্রণ ব্যবস্থার তখন শৈশবকাল। আলোকচিত্রের ব্যবহার সবেমাত্র শুরু হয়েছে। দুনিয়া জোড়া স্বাক্ষরতা তখন ছিলো না এবং শিক্ষাব্যবস্থাও ছিলো সীমিত পর্যায়ে। সংস্কৃতির অভিজাত-বিশ্ব তখনও ঈর্ষাকাতর অহমিকায় ‘অশিক্ষিতজন’দের কাছ থেকে নিজেদের গোপনীয়তা আগলে রেখেছিলো। জাদুঘরগুলোও আতঙ্কজনক প্রতিবন্ধকতার মতো এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো যা দর্শনার্থীদের (অভিজাত) সমাজ বর্হিভূত সর্বহারাদের ব্যাপারে সতর্ক করে রাখতো।^১

কিন্তু এই শতকের (উনবিংশ) শেষ ভাগে এসে এই সংকীর্ণ বুর্জোয়া বিশ্ব ভেঙে পড়তে শুরু করলো। তবে এই ভাঙন মার্কসবাদীদের বিশ্বাস মতো সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে হয়নি, হয়েছে অবিরাম সামাজিক উন্নয়নের আন্দোলন ও পুঁজিবাদের উন্নয়ন—এই দুটির যৌথ প্রয়াসে। বুর্জোয়া শ্রেণীর ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্য ও সুযোগ-সুবিধা আরো বিস্তৃত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। চলমান এই প্রক্রিয়া সত্যিকারভাবে বৈশ্বিক রূপ লাভ করে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের, ইউরোপ, বৃটেন ও জার্মানির বিছু অংশে এ প্রক্রিয়া এখনও চলমান পর্যায়ে। এ তালিকার সর্বশেষে রয়েছে ফ্রান্স, যেখানে সর্ব প্রথম ডিপার্টমেন্ট স্টোর ধারণার উদ্ভব হয়।

পরিবর্তন প্রবাহের কেন্দ্রবিন্দুতে তখন বিশ্ব সংস্কৃতি। আজকে আমরা যে বই পড়ছি তখনও সেগুলো বেস্টসেলার ছিলো। শুধু বই আকারে প্রকাশিত ডিকশনার ‘পিকউইক পেপারস’ (১৮৩৬ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত যেটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়) প্রকাশিত হবার পরবর্তী ৪০ বছরে বিক্রি হয়েছিলো মোট ৮ লাখ কপি।^২ জোনার *L'Assommoir* ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত মোট ১ লাখ ৪৫ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। জে ক্রনোর (মাদার ফুইলি ছদ্মনামে) লেখা *Tour de la Trance par deny enfants* বইটি যদিও এখন তেমন পঠিত হয় না কিন্তু বছরের পর বছর এটিই ফ্রান্সের স্কুলগুলোতে পড়ানো হয়েছে এবং ওই সময়ে এ বইটির প্রায় ৮১ লাখ কপি বিক্রি হয়।^৩

জনপ্রিয় সংবাদপত্রের কল্যাণেই অবদমিত শক্তিগুলোর নব্য উত্থান সম্ভব হয়েছিলো। ১৮৭০ সালে শুধুমাত্র প্যারিসেই ৩৭টি দৈনিক প্রকাশিত হয় এবং প্রতিদিন সেগুলো মোট ১০ লাখ কপি বিক্রি হতো।^৪ তার দশ বছর পরে দৈনিক ২০ লাখ কপি বিক্রি শুরু হয় এসব দৈনিক, তার মধ্যে *Petit Journal*-ই বিক্রি হতো ৫ লাখ কপি।^৫ সংবাদপত্র বিক্রির এ প্রসার সম্ভব

হয়েছিলো নতুন মুদ্রণ প্রযুক্তি ও সরবরাহ ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমেই। ১৮৭০ এবং ১৯১৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ফ্রান্সের রেলওয়ে নেটওয়ার্ক প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পায় এবং সংবাদপত্রের দামও স্বাভাবিকভাবেই কমে আসে। ঠিক একই সময়ে ফ্রান্সের নিরক্ষর পুরুষদের সংখ্যা ২০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৫ শতাংশের নেমে আসে। ১৯১৪ সালে সেখানকার চারটি প্রধান দৈনিকের *The Petit journal*, *The Petit Perision*, *The Matin* এবং *The journal*-এর মোট বিক্রিত কপির সংখ্যা এসে দাঁড়ালো ৪৫ লাখে।^{১৭} ১৯০০ সালে আলফ্রেড হারমান ওয়ার্থের সম্পাদনায় বৃটেনে প্রকাশিত দৈনিক *Daily mail* প্রতিদিন ১০ লাখ কপি বিক্রি হতো।^{১৮}

১৮৯৫ সালে *Petit journal* এবং *Petit Perision*-এর বর্ধিত সচিত্রকরণ সংযুক্ত হওয়ার সংগে সংগে দুটি পত্রিকারই সার্কুলেশন এসে দাঁড়ায় ১০ লাখ কপিতে।^{১৯} ১৯১০ সালে প্যারিসে *Excelsior* নামের একটি ইলাস্ট্রেটেড দৈনিকের যাত্রা শুরু হয়। আর ১৮৪২ সালে শুধুমাত্র সচিত্রকরণ পছন্দ ওপর ভিত্তি করেই প্রথম বারের মতো বৃটেনে চালু হয় *Illustrated London News* নামের আরেকটি দৈনিক, যা অভিজাত মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে প্রিয় ছিলো।^{২০} উনবিংশ শতকের শেষ দিকে এসে *Tibits* পত্রিকা চলতো ৬ লাখ কপি করে। ১৮৭৩ সালে ইতালির প্রকাশক ট্রেভেস প্রকাশ করেন তার দৈনিক *Illustrazione Italiana*। ১৯০০ সালে এসে রোববারে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *Domenica del corrier* (এটি ছিলো প্রভাবশালী *Corriere della sera* গ্রুপের মালিকানাধীন) সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মান থেকে প্রকাশিত আর্নেস্ট কেইলের *Gartenlube* ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৮৬০ সালে ১ লাখ সার্কুলেশনে উন্নীত হয় এবং ১৮৮০ সালে সে সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৪ লাখে।^{২১} ১৮৬৫ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে পত্রিকার সংখ্যা ৭শ' থেকে ৩ হাজারে এসে দাঁড়ায়।^{২২} মানুষের নতুন নতুন চাহিদা পূরণ, নতুন নতুন আবিষ্কার, যুদ্ধ বিশেষ করে সামন্তবাদী যুদ্ধ, এবং অপরাধই এই সার্কুলেশন বৃদ্ধির মূল কারণ। এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে মোনালিসা বিশ্বজুড়ে পরিব্যাপ্ত হলো? কিভাবে সেইসব লক্ষ্য কোটি মানুষের কাছে পরিচিত হলো যারা সেই রহস্যময় হাসির কথা জানতো না, যারা রেনেসাঁর কথা শোনেও নি, এমন কি লিওনার্দোর নাম পর্যন্ত শোনে নি? ১৯১১ সালের ২৬ এপ্রিল কিছু ইলাস্ট্রেটেড ম্যাগাজিন মোনালিসাসহ বেশ কিছু চিত্রকলার ছবি ছাপে। কিন্তু এ সময় সে ছবি সাধারণ নারীমূর্তি হিসেবেই আর দশটা ছবির মতো ছাপা হয় এবং সেক্ষেত্রে তেমন জনপ্রিয়তারও কোনো লক্ষণ ছিলো না।

জনপ্রিয়তার জন্যে যেটি দরকার ছিলো সেটি হলো চমকপ্রদ ও সংবাদসমৃদ্ধ কোনো অতি নাটকীয় ঘটনা। ১৯১১ সালের ২১ আগস্ট ভোরে ভিনসেনজো পেরুজ্জিয়া নামক ৩০ বছর বয়স্ক এক পেইন্টার-ডেকোরেটর লুভরে কাজ করার সময় একটা দাও মারার সুযোগ পায়। দিনটা ছিলো সোমবার, ছুটির দিন।^{১২} লোকজন না থাকায় ১৯০৯ সালে *comtess de Bearn*-এর উপহার দেয়া এই ছবিটা ষোড়শ শতকের তৈরি ফ্রেম থেকে খুলে পেরুজ্জিয়া নিজের কোটের নিচে লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসে।^{১৩} অবশ্য এটা চুরি যাবার লক্ষণ আগেই প্রকাশিত হয়েছিলো। ১৯০৫ সালে ভিয়েনা থেকে অ্যালবার্ট র্যানিয়েইকো নামক ভদ্রলোক ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে হুঁশিয়ারি দিয়ে একটি চিঠি পাঠান যাতে মোনালিসা চুরি হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে অবস্থিত ফরাসি দূতাবাসকে ওই চিঠির বক্তব্যের নির্ভরযোগ্যতা তদন্ত করার নির্দেশ দেয়। দূতাবাস এ বিষয়ে মাথা ঘামানোর কোনো কারণ খুঁজে পায় নি।^{১৪} ১৯১০ সালের ২৪ জুলাই *Le cir de Paris* নামের একটি দৈনিক ব্যঙ্গ ক'রে ঘোষণা দেয় যে, সংরক্ষিত ছবিটি মূলত আসল ছবির একটি কপি। আসল ছবি আগেই চুরি হয়ে গেছে। এটা ছিলো পত্রিকাটির একটি কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য। ঠিক ওই সময়ে লুভরে রাত্রি যাপনের কারণে এক সাংবাদিক নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে আটক হন। এবং কয়েক দিনের মধ্যে সেখান থেকে একটি মিশরিয় শিল্পকর্ম চুরি যায়।

মোনালিসা চুরি হয়ে যাওয়ার শোকে লুভর এক সপ্তাহ বন্ধ রাখা হয়। সরকার *Musees Nationaux*-এর পরিচালক থিওফাইল হোমোল এবং নিরাপত্তা প্রধানকে বরখাস্ত করে এবং নতুনভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়।^{১৫} পুলিশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন নতুন প্রশাসককে হোমোলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

এতো পদক্ষেপ নেবার পরও জনরোষ থামানো গেলো না। পত্রিকাগুলোও মুখ খুললো। ইতালির পত্রিকাগুলো দেশপ্রেমের কারণেই দাবি করলো 'এ ছবি আমাদের'। *Domenica del Corriere* ১৯১১ সালের ৩ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম পাতায় এ ছবি চুরির প্রতিবাদে কার্টুন প্রকাশ করলো। আঁকা কার্টুনের ছবিতে দেখা যাচ্ছিলো দুটি লোক একটি ছবি সরিয়ে নিচ্ছে। কার্টুনের নিচে ক্যাপশন ছিলো '*Come sia stato Pissibile Pinpossibile*', যার অর্থ 'কী ক'রে এমন অসম্ভব সম্ভব হলো'।

সেই সময়ে বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকের দাবিদার, যার প্রচার

সংখ্যা ১৪ লাখ ছিলো, সেই *Petit Parisien* ২৩ আগস্ট চুরি হয়ে যাওয়া ছবির একটি বিশাল অনুরূপ কপি নিয়ে রাজপথে প্রতিবাদ মিছিলে নেমে আসে। ওই মিছিলের সামনের ব্যানারে লেখা ছিলো, *La joconde a disparu du musee du Louvre*, ওই হেড লাইনের একটু নিচেই লেখা ছিলো “...il nous reste le cadre” (ফ্রেমটি এখনও আমাদেরই হাতে)। আর ওই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদনে বার বার বলা হচ্ছিলো এটা ইতালির জন্য একটা ‘ট্রাজিক লস্’। প্রতিবেদনের এক জায়গায় বলা হয়, ‘এমন নিখুঁত ছবি যে আর দ্বিতীয়টি নেই তা সন্দেহাতীত ও দ্রুতসত্য। মোনালিসা আমাদের উত্তরাধিকারের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা কি আবার সেই মুখের হাসি দেখতে পাবো?’ পত্রিকাটি জোর দিয়ে জানালো, এটা কোনো সাধারণ রেনেসাঁ মাস্টারপিস নয়, এটা এক অসাধারণ প্রতিভাধর শিল্পীর আঁকা রহস্যময়ী নারীর আধিভৌতিক হাসির প্রতিচ্ছবি। এটা নিছক চুরির মতো সাধারণ ঘটনা নয়—এটা অপহরণ ও ধর্ষণের সমান অপরাধ।

ফরাসি দৈনিকগুলো গতানুগতিক ও প্রথাগত সংবাদের ভাষা ভুলে আবেগপ্রসূত ভাষায় তাদের শোকসমৃদ্ধ বক্তব্য প্রচার শুরু করলো এবং এর মাধ্যমে ওই চিত্রকলার সঙ্গে শুরু করলো প্রতারণা। তুচ্ছ ক্ষতির জন্য কেউ এতো পাগলামি করতে পারে না। পত্রিকাগুলো গবেষণা শুরু করলো এই রহস্যময় চোর কি আসলে কোনো চিত্রপ্রেমী ব্যক্তিত্ব, না কি অতিকল্পনাপ্রবণ হয়ে মোনালিসার প্রেমে পড়েছিলো? সে কি কোনো সখবিলাসী কোটিপতি?^{১৬} তারপর তারা মন্তব্য করলো চিত্রশালার দেড়শ’ জন নিরাপত্তা কর্মীর চোখ ফাঁকি দিয়ে চিত্রশালার কর্মচারি ছাড়া আর কে ছবি চুরি করতে আসবে? কবি গিওম আপোলিনেয়ার মন্তব্য করলেন, ‘লুভরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্পেনিয় জাদুঘরের চেয়েও দুর্বল।’^{১৭}

তার এ মন্তব্য *Petit Parisien*-এর মতো পত্রিকাগুলো প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে প্রকাশ করলো। প্রায় প্রতিদিনই প্রথম পাতায় জোকোন্ডে সংবাদ ছাপালো। এ প্রতিবেদনগুলো ফ্রান্সের সামাজিক শ্রেণীগুলোকে এমনভাবে নাড়া দিলো যে, এর ফলে রেনেসাঁ শিল্প আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো। *Petit Parisien* ব্যাখ্যা দিতে লাগলো, লিওনার্দো আসলে কে ছিলেন, কিভাবে ফ্রান্স এ ছবি ইতালির কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছিলো। ছবির মডেলের ব্যাখ্যা দিয়ে জানানো হলো ওই ছবির মডেল ছিলেন লিসা গেরার্দিনি (যদিও এ তথ্যের সত্যতা এখনও সন্দেহাতীত নয়), ছবিটি আঁকা হয় ১৫০১ থেকে ১৫০৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে, ইত্যাদি বর্ণনা দিলো পত্রিকাটি। ‘লিওনার্দো

যখন ছবিটি আঁকছিলেন তখন লিসাকে উৎফুল্ল রাখতে সংগীত শোনানো হয়েছিলো, ভাসারির এ ধরনের কাহিনী সর্বশ্রম রিপোর্ট ঘুরে ফিরে ছাপাতে লাগলো পত্রিকাটি। *Petit Perisien* প্রত্যেকটি সংখ্যায় মোনালিসার রহস্যময় ও বিভ্রান্তিকর হাসির বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিলো। এ ছবির ব্যাপারে গতিয়েরের কথা বলে প্রচারিত গালগল্পের সংখ্যা তখন লাখে লাখে ছাড়িয়ে গেলো। গতিয়ের এ ছবি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন, 'মোনালিসা আপনাকে এতো অভিভূত করবে যে, আপনার মনে হবে আপনি যেনো ডাচেসের সামনে দাঁড়ানো কোনো স্কুলছাত্র।' এছাড়াও উপকথার মতো এ ছবি সম্পর্কে মিথ ও সৃষ্টি করলো তারা। যেমন বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার আলফ্রেদ দ্য মুসেত নাকি সারা রাত কল্পনায় মোনালিসার সৌন্দর্যে বিভোর ছিলেন।^{১৮}

২৬ আগস্ট *L'Illustration* পত্রিকা বিশাল সাইজের মোনালিসার ছবি ছেপে দাবি করলো, লিওনার্দো মোনালিসার প্রেমে পড়েছিলেন।^{১৯} কিন্তু ওই সংখ্যার প্রথম পাতা জুড়ে ছিলো সমরমন্ত্রী এম. আন্দোফ মেসিমির ছবি (যার ছবি মোটেও হাস্যোজ্জ্বল ছিলো না)। এর এক সপ্তাহ পরে *L'Illustration* লুভরের শুধু ফাঁকা দেয়ালের ছবি ছেপে এইভাবে পাঠকদের আশ্বস্ত করলো যে, ওই ছবির বিকল্প ও অনুরূপ আরেকটি ছবি সরবরাহের জন্য আমরা কয়েক মাস ধরে কাজ করে যাচ্ছি। আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের সম্মানিত পাঠকরা তা পেয়ে যাবেন।^{২০} ২৩ সেপ্টেম্বর তারা তাদের সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করলো। দুর্ভাগ্যবশত আমি ওই বিকল্প ছবির গুণগতমান সম্পর্কে বলতে পারছি না কারণ জাতীয় গ্রন্থাগারের কাছে সংরক্ষিত ওই দিনের ওই পত্রিকাটির সেই বিকল্প চিত্রকর্মের ছবিটিও চুরি যায় (কেউ কেটে নিয়ে যায়)।

মোনালিসা চুরি হবার এক সপ্তাহ পরে লুভর যখন ৩০ আগস্ট আবার জনগণের জন্য খুলে দেওয়া হলো, প্যারিসবাসী এমনভাবে তাদের ব্যক্তিগত আবেগ ও শোক প্রকাশ করতে লাগলো যেনো সদ্য তাদের কোনো প্রিয় বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। চিত্রশালায় আগের যে কোনো সময়ের চাইতে বেশি দর্শক এলো ওই গ্যালারিতে এবং মোনালিসার চুরি হয়ে যাওয়া ছবির ফাঁকা ফ্রেমের সামনে দাঁড়িয়ে বিকল্প ছবি হাতে তার গুণগত মান বিচার করতে লাগলো।^{২১} গ্যালারির বাইরে ফেরিওয়ালারা তখন মুচ্চকি হাসছিলো আর মোনালিসার বিকল্প ছবি চিত্কার করে বিক্রি করছিলো। এর এক সপ্তাহ পরে আমবোয়ায় অবস্থিত লিওনার্দোর সর্বশেষ বাসস্থান ক্রুস লুসে এক অনুষ্ঠান হলো।^{২২} ১৮ ডিসেম্বর দৈনিক *Petit Perisien* লুভরে সদ্য নিয়োগকৃত ভয়ানক চেহারার জ্যাক ও মিলোর্ড নামের দুটি কুকুরের কর্তব্যকালীন ছবি ছাপালো প্রথম পাতা জুড়ে।

মোনালিসার চুরি হওয়ার ঘটনার প্রাসঙ্গিক সূত্র ধরে লেখা কয়েকজন সাংবাদিকের রিপোর্টে আরো একটি বিষয় জানা গেলো যে, ওই একই চিত্রশালা থেকে ১৯১১ সালের মে মাসে হারিয়ে যাওয়া দুটি শিলামূর্তি কবি আপোলিনেয়ার সংবাদপত্রগুলোর সহায়তায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়েছিলেন।^{২৩} সাংবাদিকদের ওই রিপোর্টগুলোতে প্রশ্ন করা হয়, যারা ওই শিলামূর্তি দুটি চুরি করেছিলো তারাই কি মোনালিসার ছবিটা হাতিয়ে নিয়েছে? প্রতিবেদনে তারা মন্তব্য করে বসলেন যে, শিলামূর্তি চোরদের মধ্যে একজন ওই কবির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। এই মন্তব্যে কবি প্রথমে অস্বীকার ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেও পরে চাপের মুখে সত্যতা স্বীকার করেন এবং শিল্পী পিকাসোর অনুরোধে মূর্তি দুটি ফিরিয়ে দিতে সম্মত হন। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং কয়েক দিন হাজতে আটকে রেখে ছেড়ে দেয়। পরে *Paris journal* আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কবি ‘আমার কারাজীবন’ শিরোনামের একটি প্রবন্ধ পত্রিকার সম্পাদকের হাতে ধরিয়ে দেন।^{২৪}

ধীরে ধীরে ছবি চুরির খবর শীতল হয়ে এলো এবং ১৪ সেপ্টেম্বর রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী পিওতর স্টোলিপিনের গুপ্তহত্যা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলো।

ছবি চুরির ঘটনাটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো কিন্তু এ সংবাদের গ্রহণযোগ্যতা সর্বত্র সমান ছিলো না। ইংল্যান্ডের এটি সংস্কৃতির কোনো বড় ধরনের ক্ষতি বলে বিবেচিত হয় নি। ইংল্যান্ডের একটি বিশিষ্ট জার্নাল *The Athenaeum* (যার উপশিরোনাম ছিলো, ‘ইংরেজি ও বিদেশী সাহিত্য, বিজ্ঞান, চারুকলা, সংগীত এবং নাটক সংক্রান্ত জার্নাল’) এ ছবি চুরির ঘটনায় মাত্র ১২ লাইনের একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলো (১৯১১ সালে ২৬ আগস্ট সংখ্যায়) কিন্তু *Holbin's Dresden Madoma*-এর স্তব কীর্তনে ব্যায় করেছিলো ১৫ লাইনের রিপোর্ট। ১৯১১ সালের ২ সেপ্টেম্বর ‘দি ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ’-এর প্রথম পাতায় সমুদ্র স্রোতে কবলিত একটি ডুবন্ত জাহাজের ছবি ছাপা হয় এ ছবি বাস্তবিক কোনো দুর্ঘটনার খবর দেবার জন্যে নয়, জাহাজ পরিচালনা বিষয়ক একটি ধারাবাহিক রিপোর্টের অংশ হিসেবেই ওই ছবি ছাপা হয়। ওই কাগজের ১০নং পাতায় সাদাকালো প্রচ্ছদে মোনালিসার ছবি ছাপা হয়। ছবির নিচে ছিলো একটি দীর্ঘ ক্যাপশন, ‘নটরডেম টাওয়ার বিকিয়ে দেয়া যেমন কষ্টকর, লিওনার্দোকে হারানোও তেমন কষ্টকর।’ একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয়, ক্যাপশনে বলা হয়েছে ‘লিওনার্দোকে হারানো,’ ‘মোনালিসাকে হারানো’ নয়। আসলে তখন ওই ‘ছবি’র চেয়ে শিল্পীই বেশি পরিচিত ছিলেন। ক্যাপশনের বাকি অংশ ছিলো :

অনেক বছর আগে গেইসবোরোর আঁকা ডাচেস অব ডেভনশায়ার ছবিটি হারানোর পর জনগণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো, এ ছবি হারানোর পর তার চেয়েও বেশি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ ছবি জগৎবিখ্যাত হোক বা না হোক, এ ঘটনায় এতো বিন্মিত হবার কোনো কারণ নেই।

Illustrated London News আসলে নিজ উদ্যোগে এ খবর ছাপে নি বরং বিদেশী খবর ও খবরের কাগজের বাড়াবাড়িতে শেষমেশ ছাপাতে প্রবৃত্ত হয়। ছবি চুরির ঘটনার সময় এ পত্রিকায় পর্তুগালের নতুন প্রেসিডেন্ট, নতুন ইতালিয় অ্যাডমিরাল, কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী, তুরস্কের যুদ্ধ, ত্রিপোলিতে ইতালিয় সৈন্যদের অভিযানের ছবি ছাপা হয়। এ পত্রিকা একবারই মোনালিসার ছবি ছাপে। ৪ নভেম্বর এ বিষয়ে ছোট একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং ৯ ডিসেম্বর ছবি ছাপে, ছবিতে মোনালিসার মুখের অংশটুকুই ছাপা হয় এবং প্রকাশিত ছবির পেছনে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডও ছিলো না।

ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ওই চুরির ঘটনাকে ব্যঙ্গ করে একেবারে নাজেহাল করে ছাড়ে। সংগীত, পোস্টকার্ড, থিয়েটার ও ভ্যারাইটি শোতে একের পর এক লুভরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে অনুষ্ঠান করা হয়। প্যারিসের সবচেয়ে জনপ্রিয় থিয়েটার অলিম্পিয়ায় অনুষ্ঠিত *duo pip* এবং *Bousquet* নামের দুটি প্রহসনে লুভরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যঙ্গাত্মক অভিনয় দেখিয়ে জনগণকে বিনোদন দেয়া হয়। ওই ব্যঙ্গ নাটকে দেখানো হয় 'চিত্রশালার একজন রক্ষী মূল্যহীন একটি মূর্তি ঝাড়ামোছা করছে। ঝাড়তে ঝাড়তে এক সময় সে মূর্তিটিকে মাটিতে ফেলে ভেঙে ফেলে। আবার অন্য দৃশ্যে দেখা গেলো নিজেদের ঘর সাজানোর জন্যে সে কয়েকটি মূর্তি ও চিত্রকর্ম বাড়ি নিয়ে এলো। আরেকটি দৃশ্যে দেখা গেলো প্রহরীরাই দর্শনার্থীদের জিজ্ঞেস করছে, 'আপনার কি রেমব্রান্ট অথবা রাফায়েলের চিত্রকর্ম নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে?'^{২৫}

Rue Menilmontant-এর এক তালার দোকানদার তার দোকানের জানালায় মোনালিসার একটি কার্টুন ঝুলিয়েছিলো। কার্টুনের ওই মোনালিসার চোখ দুটি ঘুরছে আর মাথা অবিরাম ঝাঁকি খাচ্ছে, সেটার নিরাপত্তার জন্যে ছবিটার গলায় বিশাল এক তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। নিচে একটা লাইনও যুক্ত ছিলো। *Elle avait un p'tit Cadenas/Mais le lowvre n'en*

avait Pas (এটার গলায় তো তবু একটা ছোটো তালা আছে কিন্তু লুভরের তো তাও নেই)।^{২৬}

তারপর এলো ব্যঙ্গাত্মক পোস্টকার্ড। একটা কার্ডের ছবিতে দেখা যাচ্ছিলো লুভরের নিরাপত্তারক্ষী নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে আর চোর বগলদাবা ক'রে একটা ছবি নিয়ে পগারপার হচ্ছে। আরেক পোস্টকার্ডে দেখা গেলো দাঁত বের ক'রে *মোনালিসা* হাসছে, ক্যাপশনে লেখা 'চারশ' বছর পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম!' মিলান শহরে প্রকাশিত আরেকটি পোস্টকার্ডের ছবিতে দেখা গেলো *মোনালিসা* নাক চেপে ধ'রে দৌড়ে পালাচ্ছে।^{২৭}

Omnia Pathe হলের বিশাল পর্দায় ছবি চুরি যাওয়ার দুই সপ্তাহ পরে প্রজেক্টরের মাধ্যমে একটি ব্যঙ্গাত্মক ছবি প্রদর্শন করা হয়। কয়েক দিন আগে লুভরের ফাঁকা দেওয়াল দেখে এসে ১০ সেপ্টেম্বর প্রচারিত ওই চলচ্চিত্র দেখতে যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত লেখক ফ্রানৎজ কাফকা ও ম্যাক্সব্রডও উপস্থিত ছিলেন। *Nick winter et le vol de la joconde* নামের পাঁচ মিনিট ব্যাপী ওই স্বল্পদৈর্ঘ্য ব্যঙ্গ চলচ্চিত্র দেখে কাফকা ও ব্রড দু'জনেই মজা পেয়েছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় কাফকার লেখায় :

মূল ঘটনা ঘটেছিলো লুভরে। চলচ্চিত্রে চমৎকারভাবে গ্যালারির অন্য ছবি, ভাস্কর্য এবং *মোনালিসাকে* ঝুলিয়ে রাখার জন্য ব্যবহৃত তিনটি আংটা দেখানো হয়েছে। চিত্রনির্মাতারা এক মজার গোয়েন্দাকে দেখিয়েছে, একটা জুতোর বোতাম মূলসূত্র থেকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যায়। দেখা যায় চলচ্চিত্রের এক চরিত্র ক্রুমোলকে আটক করা হয় (ক্রুমোল ছিলো আসলে লুভরের পরিচালক হোমোলোবুয়ার একটি ছায়া চরিত্র)। তারপরই ক্লাইমেক্স : সবাই যখন দৌড়াদৌড়ি শুরু ক'রে দিলো চোর তখন ফিরে এলো, তার বগলের নিচে জোকোন্দে, সেটা জায়গা মতো রেখে ভেলাজকুয়েজের একটা ছবি নিয়ে পালিয়ে গেলো সে। জোকোন্দের নিচে চোর একটা নোট লিখে রাখলো : 'দুঃখিত, আমার চোখের সমস্যার জন্যে এটি ভুল ক'রে নিয়েছিলাম। আমি আসলে তার পাশের ছবিটা নিতে এসেছিলাম।'^{২৮}

মঞ্চের গানগুলোরও ব্যঙ্গাত্মক ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে এ ঘটনা নিয়ে

তামাশা করা হয়। পুরনো সুরে ছবি চুরি বিষয়ক নতুন কথা জুড়ে দিয়ে ক্যাবারের সংগীত শিল্পীরা গান গাওয়া শুরু করলো। এসব গানে মোনালিসাকে ‘ফান লাভিং গার্ল’ বা ‘আমোদপ্রিয় নারী’ হিসেবে বর্ণনা করা হলো। একটা গানে তো প্যারিসিয় স্ট্রাং ব্যবহার করে মোনালিসাকে চিত্রায়িত করা হলো। সাদামাটাভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় :

‘ও বন্ধু, আমাকে চুমু খাও, আমি অতো ঝুঁত ঝুঁতে
মেজাজের নই। ওই প্রাসাদে আমার এক ঘেঁয়ে লাগতো।
এক সন্ধ্যায় যখন গার্ড চিৎকার করে বললো, ‘বন্ধের সময়
হয়েছে’, আমি তখন বললাম, ‘আমাকে নিয়ে পালিয়ে
যাও।’^{২৯}

আরেকটি গান—*L’as-tuVue? la jaconade!!*-এ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করা হয় এভাবে ‘না, এটা চুরি হতে পারে না সোমবার ছাড়া সর্বদা আমরা মোনালিসাকে পাহারা দিয়ে রাখি।’ ১৯১৩ সালে *Petit Perisien* পত্রিকা থেকে নেয়া মোনালিসার একটি হাস্যোজ্জ্বল ছবি ‘*La joconade en balade*’ পত্রিকায় ছাপা হয়। ওই ছবির ক্যাপশনে লেখা হয় ‘লুভরে আমি একদা হাসতাম। এখন আমি মৌলা দালা শাসোয়া-তে ভালোই আছি।’^{৩০}

এর এক বছর পরে *Comoedia illustre* ম্যাগাজিনে ক্যারোলাইন ওতেরো এবং মের্সিওয়েসহ প্যারিসের নাম করা ১২টি থিয়েটার মঞ্চের ছবি ছাপা হয়। প্রত্যেকটি ছবি ছিলো পাতা জুড়ে এবং প্রত্যেকটি মঞ্চে হাস্যোজ্জ্বল মোনালিসার ছবি দাঁড়িয়েছিলো। ব্যানারে লেখা ছিলো, *Les Sourires qui nous restent* (‘হাসি এখনও আমার সাথে’)।^{৩১}

জনপ্রিয় সংবাদপত্র, গান, পোস্টকার্ড ইত্যাদি সব মাধ্যমে একটি ব্যাপারই প্রচার করা হলো যে, মোনালিসার বিখ্যাত হবার নেপথ্যের প্রধান বিষয়টি হলো তার রহস্যময় হাসি। এই হাসির ব্যাপারে তাদের প্রচারিত বিরামহীন প্রচারণার প্রভাব আজও স্পষ্ট হয়ে যায় নি।

অবশ্য সকল প্রতিক্রিয়াই কিন্তু নেহাত ঠাট্টা-তামাশা সর্বশ্ব ছিলো তা নয়। এর পেছনে কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিলো। সরকারের সমালোচনার ক্ষেত্রে বিরোধী দল এ ঘটনাকে একটি মোক্ষম ইস্যু হিসেবেও ব্যবহার করেছে। ২৩ আগস্ট চরম জাতীয়তাবাদী এবং অ্যান্টি সেমিটিক *Action française* দল

লুভরের পরিচালক হোমোল এবং তার সহকারি বেনদেতের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রকাশ করে, কারণ এদের একজন ছিলেন ইহুদিঘেষা এবং অন্যজন ছিলেন খোদ ইহুদি।^{৯২} ছবি চুরি যাওয়ার পরের দিনই বিরোধী দল হোমোলের পদত্যাগ দাবি করে এবং তাকে জাতীয় জাদুঘরে ইহুদি ক্ষমতায়ন সম্প্রসারণকারী পরিচালক হিসেবে আখ্যায়িত করে।^{৯৩} ঘটনার একদিন পরে ওই পত্রিকার সম্পাদক একটি নিবন্ধ লেখেন যার শিরোনাম ছিলো 'লুভরের ইহুদিবাদ।' নিবন্ধে তিনি অভিযোগ ক'রে বলেন, 'বিশ্বের সমস্ত চিত্রকর্ম ইহুদিদের হাতে যেনো বন্ধক অবস্থায় রয়েছে।' ঘটনার পরবর্তী চারদিন পর্যন্ত তার এ লেখা অব্যাহত থাকে। বিখ্যাত চিত্র সমালোচক লুই দিমিয়ে অভিযোগ করেন যে, ছবি চুরির ঘটনা তৃতীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকারের নিরাপত্তাজনিত দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ। লুভরের দরজা নিরাপত্তাহীনভাবে খুলে রাখার পর আপনি এর চেয়ে আর কী আশা করতে পারেন? সারাদেশের মতো লুভরেও ইহুদিদের দিন-রাত আনাগোনার পর আপনি আর কী আশা করতে পারেন?

এই প্রজাতান্ত্রিক সরকারের ইহুদিরা জাদুঘরটিকে বাজারে পরিণত ক'রে ছেড়েছে। জাদুঘরের পরিচালক হোমোল ইহুদিদের পকেটে চলে গেছেন। এ সরকার আমাদের গৌরবময় জাতীয় ঐতিহ্য ও প্রথম ফ্রাঁসোয়া থেকে এ পর্যন্ত আমাদের সকল রাষ্ট্র পরিচালকদের জন্য ক্ষতিকর।^{৯৪}

বিশ্বের অন্যান্য শিল্পাঙ্গনও উত্তেজিতভাবে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। কেউ কেউ ছবি ঐকেও প্রতিবাদ জানায়। যেমন গিওর্গি দানিয়েল দ্য মফ্রেই একটি পোর্ট্রেট আঁকলেন। পোর্ট্রেটটি ছিলো *Anna Filiabelli*-এর। ছবিতে শিল্পী *Anna Filiabelli*-এর মাথাটা ডানদিকে ঘুরিয়ে দেন। *Grand revue*-তে চিত্রসমালোচকেরা বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলেন, তিতিয়ান, রেমব্রান্ট এবং ভেলাজকুয়েজের মতো পুরনো মাস্টারপিসের সাথে কিভাবে মোনালিসা তুলনীয় হতে পারে? তারা বলেন, ক্ষতি কতোটুকুই বা হয়েছে? পর পর দুই সংখ্যায় ফ্রান্সের নামজাদা শিল্পীদের বক্তব্য ওই পত্রিকায় ছাপা হয়।^{৯৫} কারো কারো মন্তব্য ছিলো শোকপূর্ণ। অনেকে বললেন, 'এ যেনো প্রিয়বন্ধু হারানোর ব্যথা।' শিল্পী এমিল ব্রাঁশ বললেন, যদিও ছবিটা তার খুব পছন্দের নয় তবু তা চুরি যাওয়া শিল্পের জন্য মর্যাদাহানিকর। শার্ল লঁরে অবশ্য একে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চমকপ্রদ প্রতিকৃতি বলে আখ্যায়িত করলেন।

ফেলিক্স এদুয়ার্দ ভালোতোয়া এটিকে 'মাস্টারপিস' বলে অভিহিত করেন। অনেকেই গতানুগতিক মন্তব্যের মতো বললেন, 'এটি শ্বাশত নারীর প্রতিনিধিত্ব করেছে, এবং এর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান ও আবেগের অবিমিশ্র সমন্বয়। রেনে পোয়াঁ ঘোষণা করলেন, 'যে রহস্যময় হাসি আমাদের এক মোহময় জগতে নিয়ে যেতো তা হারানো বড় দুঃখজনক।' দিওজেনে সাইলার্ত তার সংগে যোগ করে বলেন, 'এটি কোনো জাতীয় ক্ষতি নয় বরং এটি বৈশ্বিক বিপর্যয়ের অংশ।' জ্যাক ফ্রেসা পাঠালেন একটি প্রার্থনাপত্র যাতে তিনি বললেন, 'আমাদের প্রত্যাশার ঋণাধারা, আমাদের জীবন ও শক্তির উৎস, ও জোকোন্দে! তাকে ফিরিয়ে আনা হোক—এক রাজত্বের ক্ষতিপূরণ ও মুক্তিপণ দিয়ে হলেও তাকে ফিরিয়ে আনা হোক।'

কিন্তু অন্য সমালোচকেরা এটিকে 'বিশাল ক্ষতি' বলতে নারাজ ছিলো। জর্জ দেসপানাত বললেন, ভাগ্যিস চোরটা দেয়ালের উল্টো পিঠের ছবিগুলো নেয় নি! (উল্টো পিঠে ছিলো দুটি চিত্রকলা—*Tintoretto* ও *Giorgione*.) : তাদের ভাষায় সেগুলোই ছিলো প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান ও সত্যিকার চিত্রকলা। এছাড়া অনেক সমালোচক রেমব্রান্টের *Bathsheba* এবং লিওনার্দোর *St. Anne with virgin and child*-এ ছবি দুটিকেই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছিলেন। সমালোচক মরিস শাবা বললেন, তিতিয়ান এবং ভেনাজকুয়েজের চিত্রকর্মের সঙ্গে মোনালিসার তুলনাই হতে পারে না। কিস ভ্যান ডগেন আরো নগ্ন ভাষায় মোনালিসার সমালোচনা করে বললেন, 'কয়েকটি ছোটোখাটো বিশেষত্ব ছাড়া আসলে এ ছবির তেমন কোনো বড় গুণ নেই। ছবির মডেলের চোখে ভুরু নেই আর কী জঘন্য হাস্যকর মুচ্কি হাসি—সম্ভবত তার (ওই মেয়েটির) দাঁতগুলো দেখতে জঘন্য ছিলো বলেই স্বতঃস্ফূর্ত হাসি হাসে নি।' সমালোচক ওথো ফ্রিশের সমালোচনা ছিলো আরো কঠোর :

এর চেয়ে পুসিন অথবা লোরেই'র চিত্রকর্ম আরো সুন্দর। টেকনিক্যাল দিক থেকে মোনালিসা সুন্দর কিন্তু একেবারেই শীতল। শিশুকালে বাবা-মা'র কাছে লিওনার্দোর বহুল প্রশংসা শুনে শুনে তাঁর সম্পর্কে আমাদের যে উচ্চ ধারণা জন্মেছিলো সেই কারণেই মোনালিসা এতো খ্যাতি লাভ করেছে...এর শোকবহুল হাসি আমাকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে...ওয়াস্তিউ, ভেনাজকুয়েজ অথবা রেমব্রান্টের মডেলদের হাসি মোনালিসার হাসির চেয়ে আরো চিত্তাকর্ষক।

অগুস্ত গোর্গের কাছে এ ছবি ফ্রান্স হাল্‌সের ছবিরও সমকক্ষ নয়। ফ্রান্সিস জুরদাইন, যিনি রেমব্রান্টের *Bathsheba*, ভার্মিয়ারের *Lacemaker* এবং ইংগ্রেস'র আঁকা *Madame Riviere* ছবির প্রশংসা করেছেন, সেই তিনিই এ ছবির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এ ছবির ধর্মীয় আবেদন কল্পনা করা অর্থহীন, উনিশ শতকের প্রথম দিককার চিত্র সমালোচকেরা লুভরের সর্বশ্রেষ্ঠ তৈলচিত্রগুলোর মধ্যে মোনালিসাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকর্ম বলে স্বীকৃতি দেন নি।

লুভর থেকে মোনালিসা চুরি হয়ে যাওয়ার কয়েক মাস পরেই সবাই ধারণা করতে শুরু করে যে, এ ছবি হয়তো আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না। ১৯১৩ সালে লুভরের সংগ্রহতালিকা থেকেও মোনালিসার নাম বাদ পড়ে। অবশ্য তখনও মোনালিসার পোস্টকার্ড সাইজের ছবি সমানে বিক্রি হচ্ছিলো। শুধু ওই ছবির ক্যাপশনে ছিলো একটি নতুন সংলাপ, *Stolen on 22 august 1911*। ১৯১২ সালে লুভরে মোনালিসার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক জমকালো অনুষ্ঠান করা হয়।

মোনালিসা'র ওপর মন্তব্য করাটা সেই সময়ে সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। লিওনার্দোর ভক্ত হিসেবে পরিচিত জোসেফিন পেলাদান মন্তব্য করেন, 'চিত্রকর্ম বাইবেল তুল্য'। 'হাজার বছরের মধ্যে,' তিনি লিখেছিলেন, 'লোকে জিজ্ঞেস করবে ১৯১১ সালের ব্যাপারে : জোকোন্দের কি করেছিলে তুমি?'^{১০০} পেলাদান নিজে প্রস্তাব করেন, লিওনার্দোর সেন্ট জন-এর উত্তরসূরী হলো মোনালিসা, 'একজন ভাই গ্র্যান্ড গ্যালারিতে তার অবস্থান হারিয়েছে, লোকজন তাকে অবহেলা করে'।^{১০১} তাঁর মতে এটা এখন, 'এই পৃথিবীর সেরা চিত্রকর্ম'।

১৯১৩ সালের মধ্যেই কাহিনীটি বেশির ভাগ লোকজন ভুলে গিয়েছিলো, বিশেষ করে ফ্রান্সের বাইরে। ২৯শে নভেম্বরে ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ-এ এই কাহিনীটি ব্যাপকভাবে কভারেজ দেয়া হয়। প্রায় দু'পাতায় সংবাদটি ছাপা হয়।^{১০২}

১৯১৩ সালের ২৯শে নভেম্বর ফ্লোরেন্সের এক এনটিক ডিলার আলফ্রেডো জেরি 'লিওনার্দো' স্বাক্ষরসংবলিত একটা চিঠি পায়। লেখক দাবি করে যে, ছবিটি ইতালিতে ফেরত দিতে হলে 'খরচ বাবদ' ৫০০,০০০ লিরা প্রদান করতে হবে। 'লিওনার্দো' এক ধরনের দেশপ্রেমের ইঙ্গিত দেয়; নিজের দেশের সম্পদ ভিনদেশ কর্তৃক চুরি হয়েছে, তাই সেটি পুনরায় নিজ দেশে আনাই সম্ভব।^{১০৩} ফাইন আর্টের ডিরেক্টর কোরাদো রিচি এবং উফিজির কিউরেটর গিওভান্নি পোগ্লির উৎসাহে জেরি জবাব দেয় যে, সে ছবিটা দেখতে চায়।

‘লিওনার্দো’ তথা ভিসেনজো পেরুজ্জিয়া প্যারিস ছেড়ে চলে যায় ট্রেনে ক’রে, সঙ্গে মোনালিসাকে একটা বাস্কেটে ক’রে নিয়ে নেয়। ডিসেম্বর ১২ তারিখে সে ফ্লোরেন্সে পৌঁছায় এবং হোটেল আলবার্গো ত্রিপোলি ইতালিয়া’তে গিয়ে ওঠে। জেরি আর পল্লি ছবিটা পরীক্ষা ক’রে দেখে তাতে লুভরের ইনভেনটরি নাম্বার দেয়া আছে। তারা পেরুজ্জিয়াকে এই ব’লে রাজি করাতে সক্ষম হন যে, উফিজিতে ছবিটা নিয়ে আরো বেশি পরীক্ষা করার দরকার রয়েছে। হোটেলের এক মহিলা কর্মচারী তাদেরকে কিছুক্ষণের জন্য থামান—তার ধারণা হয়েছিলো তারা হোটেলের কোনো ছবি সরিয়েছে। আলবার্গো ত্রিপোলি ইতালিয়া’র ছবিগুলো সত্যি বলতে কী লুভরের চেয়েও বেশি সুরক্ষিত ছিলো। উফিজিতে ছবিটা সত্যিকার ছবি হিসেবে প্রমাণিত হলো। সন্তুষ্ট হয়ে তারা পেরুজ্জিয়াকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, সে হোটেল গিয়ে পুরস্কারের জন্য অপেক্ষা করুক; এরপরই তারা পুলিশে খবর দেয়।

ছবিটা উদ্ধার করার পর কেউ কেউ সন্দেহ করতে শুরু করেছিলো যে, ইতালিয় কর্তৃপক্ষ ছবিটা ফ্রান্সে ফেরত দেবে না। ইতালি লিবিয়াকে অধিগ্রহণ করার পর ইতালিতে এক ধরনের জাতীয়তাবাদের জোয়ার বয়ে যেতে শুরু করেছিলো। গাব্রিয়েল দানুনজিও নিজে ছবিটা চুরি করতে না পেরে হতাশ হয়ে থাকবেন, কেননা তিনি পেরুজ্জিয়াকে প্রশংসা ক’রে *I Marzocco*-তে ২১শে ডিসেম্বর ১৯১৩ সালে একটা কবিতা লেখেন। পেরুজ্জিয়া তখন জেলে। কবি লেখেন :

তার গিওকোন্দা থেকে সে এখন বহু দূরে। সে সম্মান আর কৃতজ্ঞতা আশা করে; সে নেপোলিওনিয় চুরির প্রতিশোধ নিয়েছে। লিওনার্দোর গিওকোন্দাকে দু’বছর ধরে নিজের কজায় রেখেছে সে, ফরাসি পুলিশকে ধোকা দিয়েছে, তারপর, সীমানা পেরিয়ে তাকে পুনরায় ফ্লোরেন্সে নিয়ে এসেছে। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? সেই ফ্লোরেন্সে যেখানে তার জন্ম হয়েছিলো, প্রাজ্ঞা ভেচ্চিও’র কাছেই, গিওস্তো’র ক্যামপালিনের ঘণ্টার শব্দের কাছাকাছি...কেবলমাত্র একজন কবি, একজন মহান কবি, এ রকম স্বপ্ন দেখতে পারে।^{৪০}

ইতালিয় সরকার এসবে কর্ণপাত করে নি, তারা খুব দ্রুত ফরাসি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে এবং প্যারিসে মোনালিসাকে ফিরিয়ে দেবার

আগে ফ্লোরেন্স, রোম আর মিলানে প্রদর্শন করানোর ব্যাপারে তাদেরকে রাজি করাতে সক্ষম হয়।

উকিজিতে প্রদর্শনকালে বিখ্যাত মোনালিসা দেখতে প্রচণ্ড ভীড় হয়, কেউ কেউ গর্বে কেঁদে কেলে, কেননা ছবিটা তো তাদেরই।^{১১}

১৯১৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সশস্ত্র প্রহরাধীন অবস্থায় মোনালিসা ফ্লোরেন্সেই অবস্থান করে। পেরুজিয়াকে জেলে পাঠানো হলো। আদালতে দাঁড়িয়ে পেরুজিয়া বললেন, তখুমাত্র স্বদেশ প্রেমে উদ্ভূত হয়ে তিনি এই কাজ করেছেন। ইতালির এমন দুর্লভ সম্পদ একটি ভিন্ন দেশে গড়ে থাকবে তা তিনি কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারেন নি।

অবশেষে ১৯১৪ সালের ৪ জানুয়ারি সকাল ১০ টায় মোনালিসাকে প্যারিসের হাতে তুলে দেওয়া হলো। ১৯১৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বরের পর মোনালিসাকে প্যারিসে ফিরিয়ে দেয়া হয়। সে (কখনই 'এটা' বা 'ওটা' নয় বলে ইতালিয়রা তাকে সম্বোধন করে নি) রাশীর বেশে যাত্রা করে ট্রেনে ক'রে। প্রতিটি স্টপেজে তাকে জনগণ সংবর্ধনা দেয়। রোমে তাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল এক ডেপুটি, সিনেটর আর সরকারী কর্মকর্তাদের সুদীর্ঘ লাইন তার জন্যে অপেক্ষা করে, তাকে স্বচক্ষে দেখার জন্যে। একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইতালির পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফরাসি রাষ্ট্রদূতের কাছে তাকে হস্তান্তর করেন। সেই সময় লুভরের পরিচালক উপস্থিত ছিলেন, ছবিটা আসল কিনা তা পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্যে। *L'Illustration* উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে লেখে : 'অবশেষে সে আমার ফ্রান্সে ফিরে এলো'।^{১২}

ফ্রান্সে আসার পথে মোনালিসা মিলানে প্রদর্শিত হয় (২৯শে ডিসেম্বর) ৬০,০০০ দর্শকের উপস্থিতিতে।^{১৩} পারিসে লিভন-এ এক নজর দেখার জন্যে প্রচুর জনসমাগম হয়।^{১৪} প্যারিসে নিয়ে আসার পর আবার তাকে দেখার জন্যে ফরাসিদের ভীড় শুরু হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক কোলেত কুরো-আর্ড-এ একসঙ্গে মোনালিসাকে দেখার সুযোগ পান। তিনি তাঁর কলাম *লো হার্ডিওঁ-তে* সৌন্দর্য দেখার বিশদ বর্ণনা দেন। কোলেত লেখেন, তাকে দেখা খুব সহজ ছিলো না। বেশিরভাগ অতিথিই ছবি ডোলার যন্ত্রপাতি নিয়ে ছবিটি ধরে পড়েছিলো। সেখানে লোকজন নানারকম যন্ত্রব্য করে : 'তুমি কি জানে তার নিচের ঠোঁটটা বেশ পুরু?' 'হ্যা, কিন্তু দেখো : তার ডান হাতটা বাম হাতের তুলনায় কম সাজসজ্জা করা।' তারা তাকে আবিষ্কার করলো...তার ডান হাত ডালোবাসডে লাপলো আবার।^{১৫}

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ লুসি হাজেব্রিক তাঁর ১৯১৪ সালের লুভার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কথা শব্দ করেন। তিনি তখন তাঁর বাবা-মার সাথে নিবাসিত : 'লোকজনের জীভের কারণে আমি খুব বেশি সেক্ষেপে পারি নি। তবে আমি একটা গল্প পেয়েছিলাম। কেনে কোনো সুপারী মোকামে আমি। প্যারিসের সব অভিজাত রুমেরা মোকামে সেক্ষেপে জন্মে হয়েছিল সেখানে।'

হোমের কাছে পেরুজিয়া খুবই হতাশ হয়েই বসে যত্ন করা হয়।^১ জীবিত আত্মজাতিক-শিল্পকর্ম মোর হিসেবে সে গল্প উপস্থাপনে ঠাই পেয়ে নিবাসিত, তারপরও করতে হয়, সে একজন কুসিত স্বর্ষ। তার অন্তর্য করকাতও প্রকাশ হতে শুরু করলো। একবার সে এক পতিতার সর্বস্ব হিন্দাই করেছিলো, কিন্তু উচ্চতার যার পাঁচ ফিট তিন ইঞ্চি হওয়ার সে পতিতার সাথে কথোপকথনে হার যেনে যায়; থকা ঘরে সে এক সন্ধ্যা জেলে কটায়।

পেরুজিয়া যত্ন করা করে, করসিয়া তাকে ব্যাকরণে বসে তেঁকে। প্রথমে সে যত্নেপন্যর ফর্স এ্যাত তেঁকে লুসি করতে চেয়েছিলো, কারণ সে অনেকগুলো লুভার করসিয়া করসিয়া এই ছবিটা নিয়ে উচ্চসিত প্রকাশ করে। তারপর সে তাকে পেয়েছিলো বেশিরভাগ মোকামে হোমজিনসর ব্যাপারে আশী, তাই সে সেটাই লুসি করে। তাকে ছবিটা খুব ছোট্ট ছিলো, সমস্তই কোটের পকেটে লুকানো যেতো।^২ যত্নেপন্যর একটি সোনার সুবাস হারিয়েছিলো, কারণ তাঁর ছবিটা হোমজিনসর চেয়ে দশগুন বড়।

পেরুজিয়ার প্রতি আশ্রিত বেশ সুবিচারই করেছিলো। প্রসিকিউটর তার তিন বছরের জেল চাইলেও আশ্রিত তাকে সাফে কারো হাসের জেল দেয়। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে সে যাত্রা গেলে সেই সংবাদ বেশ বড় করে আসে সংবাদপত্রে : 'বে লোক হোমজিনস লুসি করেছিলো।'

উকিলের ডিরেক্টর পিত্তজি গোত্রি ১৯৬১ সালে যাত্রা যান। দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের সময় নার্সিসের কাছ থেকে ইতালির শিল্পকলাকে রক্ষার ব্যাপারে তাঁর অপরিসীম অবদানকে পান কাটিয়ে তাঁর মৃত্যুর পর সংবাদে ঠাই পায় হোমজিনসর উচ্চসিত হিসেবে।^৩ আলবার্তো গ্রিপোলি ইতালিয়া হোটেলটি এই ঘটনার পরপরই আর কখনো হয়ে যায়, হোটেল লা পিত্তজিয়া। হোটেলটি এখনও রয়েছে। বেশ ভালোই ব্যবসা করছে।

লুসি হওয়া তার উচ্চ হওয়ার মাতৃবানের দীর্ঘ সময়টাকে হোমজিনসর জাপক কতরোজ পেয়েছে। ছবিটা এক ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেলে, হয়ে উঠলো একজন সেলিব্রিটি। যত্ন নটিকে, ব্যাপারজিনে, কয়েকটা ইলাস্ট্রেশন, অন্যসব পত্রিকার মধ্যেই হোমজিনসকে নিয়ে প্রচলন প্রতিবেদন করে। তার

মঞ্চের ভাষা প্রয়োগ ক'রে লেখে : 'একটি উত্তেজনাকর ইতালিয় ভ্রমণের পর লা জোকোন্দে লুভরের জাতীয় নাট্যমঞ্চে অসাধারণভাবেই ফিরে আসলো'।^{৭০}

উদ্ধারের কিছুদিন পরেই গাসতৌয়া বার্গারোয়া তাঁর বিখ্যাত গান 'সু লে পঁতে দ্য প্যারিস' গানে নতুন লাইন যোগ করেন। সেটা হলো, 'লা জোকোন্দে এস্তে রভেনু' (জোকোন্দে, সে আবার ফিরে এসেছে')। গানের এ্যালবামের প্রচ্ছদে মোনালিসার ছবি ব্যবহার করা হয়েছিলো। একই গান ফ্রান্সোয়া ইজেনিকের 'এনকিন!! ক্য অ এস্তে!! এলি এস্তে রেত্রোভি লা জোকোন্দে' নামেও গাওয়া হয়েছিলো। গানটা চটুল আর হালকা চালে গাওয়া।^{৭১}

আর্ট মাস্টারপিস এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে সেটা ব্যবসা হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। এরকম ব্যঙ্গচিত্র বা মন্তব্য সংবলিত পোস্টকার্ডের ব্যবসা রমরমা হয়ে ওঠে। আজ এমন কোনো পোস্টকার্ডের দোকান পাওয়া যাবে না যেখানে মোনালিসা'র পোস্টকার্ড নেই।^{৭২}

বুদ্ধিজীবী কর্তৃক একসময় প্রবর্তিত হওয়া ব্যঙ্গ-কৌতুক যখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করলো তখন সেই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীই বেশি আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। অবশ্য মোনালিসাও সেই সঙ্গে ব্যাপক জনপ্রিয় আর পরিচিত হয়ে উঠলো। ক্যাবারে'তে যে মেয়ে নাচে, এবং যারা কখনই কোনো দিন কোনো আর্ট গ্যালারিতে যায় নি, তারাও মোনালিসাকে চিনে ফেললো। জেনে গেলো তার রহস্যময় হাসির কথা।

১৮৮৪ সালে *A Rebours* উপন্যাসে জোরিস কার্ল লুইজম্যান যে নন্দন তত্ত্বের কথা বলেছিলেন, সেটা হলো : 'সেরা সঙ্গীতটি অশ্লীল আর অসহ্য হয়ে উঠলো যখন জনগণ এটা গণহারে গাইতে লাগলো...'।^{৭৩}

ফ্রান্সের বাইরে ইংল্যান্ডে উদ্ধারের পরপর সাটারডে রিভিউ অব পলিটিক্স পত্রিকায় চুরির ঘটনাটি উল্লেখ না করেই সম্পাদকীয়তে মোনালিসা মিথ নিয়ে লেখা হয় :

...ছলনাময়ী হাসি ছাড়া লিওনার্দোর এই মাস্টারপিসটার ব্যাপারে এই দেশের গড়পরতা নাগরিকের কাছে এটা কোনো চমকপ্রদ জিনিসই না। জনগণ একটা গল্প চায় যাতে পুরনো এই ছবিটা তারা উপভোগ করতে পারে...লা গিওকোন্দার কোনো গল্প ছিলো না, যতোক্ষণ না রহস্যময় হাসির ফর্মুলাটি আবিষ্কৃত হয়েছিলো...^{৭৪}

‘আরেকটা মোনালিসা’র খিমের ব্যাপারে রবার্ট লংগি বিশেষ নজর দিলেন। তিনি মোনালিসা বিদ্বেষী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ‘তাঁর এই দ্বিতীয় লিসার জন্য প্রয়োজন ছিলো চুরি হওয়া এবং খুঁজে পাবার একটা ঘটনা, কিন্তু সেটা হয় নি। তাই কেউ সেটাতে আগ্রহ দেখায় নি। সেটা রেনোয়ার আঁকা ছিলো’ (৩৩ নম্বর ছবিটি দেখুন)।^{৫৬}

ওয়াল্টার প্যাটার অবশ্য রবার্ট লংগির মতো মোনা বিদ্বেষী ছিলেন না। ছবিটি চুরি হবার পরপর তিনি বলেছেন :

আম্বে ক’রে বললাম, ‘এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে!’ আর যখন খবরটা জেনে নিশ্চিত হয়ে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমি এরকমটি না ক’রে পারলাম না। এই মাস্টারপিসটার উধাও হওয়াতে আমার অনুশোচনাও হচ্ছে না, কোনো সুখানুভূতিও হচ্ছে না...সে একেবারে সবার কাঁধে ভূতের মতো চেপে বসলো, কিন্তু আমি তা থেকে মুক্ত থাকতে পেরে খুশি ছিলাম। কিন্তু সেই সময়ে আমি সেটা উচ্চ কণ্ঠে বলতে পারি নি। আমি কে যে শতাব্দীর সবচাইতে বড় শোরগোলের বিরুদ্ধে ফিস্‌ফিস্‌ ক’রে দুর্বল কণ্ঠে বলতে যাবো?^{৫৭}

ব্রেনসন প্রকারান্তরে এইসব অনুসরণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। ব্রেনসন এবার ঘোষণা দিতে পারলেন যে, তিনি হলেন তাদেরই একজন...যে স্বেচ্ছায় শৈল্পিক দাসত্ব বরণ করেছে।^{৫৮}

হেভিওয়েট সাহিত্যিকেরা জনপ্রিয় আইকনের প্রতি নিজের ঘৃণা জানাতে শুরু করলেন। টি.এস. এলিয়ট কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে গ্যাতে, কলোরিজ, শেক্সপিয়ার, প্যাটার এবং লিওনার্দোকে ভৎসনা করেছিলেন। ১৯২০ সালে তাঁর ‘হ্যামলেট এ্যান্ড হিজ প্রবলেম’ নামক রচনায় তিনি গ্যাতে এবং কলোরিজকে সমালোচনা করেন। তিনি শেষ করেন এই বলে যে, ‘হ্যামলেট হলো সাহিত্যের মোনালিসা’।^{৫৯}

এই দৃষ্টিভঙ্গীটি মাঝারি মানের সাহিত্যেও প্রতিফলিত হলো। সমারসেট মম’র ক্রিসমাস হলিডে’তে লেসলি এবং ভেনেশিয়া ম্যাসন লুভরে বেড়াতে যায় নিজেদের বাচ্চা-কাচ্চাদের নিয়ে। তারা সরাসরি মোনালিসা’র দিকেই যায়। মম ঘৃণার সাথেই মন্তব্য করেন : ‘তারা চার জন ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে যৌনকাতর তরুণীটির হাসির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালো’।^{৬০}

চুরির পরে মোনালিসা'র জনপ্রিয়তা কেবলমাত্র একক কোনো ঘটনার ওপর নির্ভর করে নি।^{১০} তখনও মোনালিসার চুরিটি প্রধানত ফরাসি গল্প ছিলো। মোনালিসা তখনও বিশ্বময় পরিচিত হয়ে ওঠে নি।

এভাবেই ১৯১৪ সালে প্যারিসের ব্যদেকার গাইডে ছবিটাকে 'বিশ্বের সবচাইতে সুপরিচিত নারী প্রতিকৃতি' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিলো—আর উদ্ধারের পর এটা আরো বেশি সুপরিচিত হয়ে উঠলো।^{১১} ১৯২৪ সালের সংস্করণের এই তথ্যটির সাথে চুরির ঘটনাটি উল্লেখ না করেই পুনঃমুদ্রণ করা হয় ১৯১১ সালের মন্তব্যটি।^{১২} ১৯২২ সালে লারুজি ইউনিভার্সাল তাদের জোকোন্দে অধ্যায়ে উল্লেখ করে রহস্যময় এবং বিব্রতকর হাসিটির কথা কিন্তু চুরির ঘটনাটি নয়।^{১৩}

চুরি হওয়াটা মার্কেটিংয়ের জন্যে কার্যকরী হতে পারে, তবে এটা সব সময় কাজ করে না। লুভর থেকে এখনও পেইন্টিং চুরি হয়, কিন্তু কতোজন লোক খবর রাখে যে, ১৯৯৮ সালে কোরোতের শেমিন দ্য সার্ভেস-এর চুরির ঘটনাটি? ১৯৭৭ সালে এক ফ্রান্স থেকেই নয় হাজার ছবি চুরি হয়েছিলো, অবশ্য সেগুলোর বেশির ভাগই তেমন বিখ্যাত ছিলো না, না ছিলো মূল্যবান।^{১৪}

১৯২০'র দশকে মোনালিসা কেবল তাদের কাছেই সুপরিচিত ছিলো না যারা ছবির খোঁজ খবর রাখে, বরং একদল নতুন লেখক ও বোদ্ধার কাছেও সেটা পরিচিত হয়ে ওঠে। তারা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলো যে, নিজেদের লেখায় ছবিটার কথা উল্লেখ করলে পাঠকের স্মৃতিকে উস্কে দেয়া যায়, লেখাটিও সমৃদ্ধ হয়। ইমানুয়েল বোর্শিয়ার কমেন্ট জই রেক্রভে না জোকোন্দে ('কিভাবে আমি জোকোন্দেকে খুঁজে পেলাম') হলো চুরির ঘটনার ওপর রচিত সবচাইতে বিখ্যাত উপন্যাস।^{১৫} এল রজার্স-মাইলস তাঁর লিওনার্দো দা ভিক্সি এত্ লো জোকোন্দে বইয়ের ফুটনোটে লেখেন যে, 'চুরির ঘটনার বারো বছর বাদে চোরের কথা আমরা খুব কমই মনে করতে পারি।'^{১৬}

তবে যাই হোক, বহু শতাব্দী ধরে আলোচিত মহান শিল্পের আজকের এই অবস্থানের নেপথ্যে এই চুরির ঘটনা ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিলো। কেউ সচেতনভাবে কেউ বা অসচেতনভাবে এমন কাজ করেছে যার পরিণতিতে মোনালিসা আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছে—যেমনটি ইতিহাসে সবসময়ই ঘটে থাকে।

অষ্টম অধ্যায়

চুরির ঘটনা কাজে লাগানো

শিল্প সমালোচনা ও বোদ্ধা শ্রেণী ক্রমশ মোনালিসার আলোচনা কিছুটা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাদের কাছে ব্যাপারটা একঘেঁয়ে লাগছিলো। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ তার কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিলো। লুভর থেকে চুরি হয়ে যাওয়ার পর অন্য দুর্লভ ছবির মতোই মোনালিসাকেও কড়া নিরাপত্তায় সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হলো। পর্যটনের বিজ্ঞাপন এবং টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে যেসব ছবি দেখানো হতো তাতে উনিশ শতকের কাজ ছিলো খুবই কম; পুরনো মাস্টারপিসগুলোই ঘুরে-ফিরে প্রচার মাধ্যমে আসতে লাগলো। তবে উনিশ শতকের শেষ দিকটা ছিলো অপেক্ষাকৃত কম রক্ষণশীল। এ শতকেই পুণরুত্থিত হলো ভার্মিয়ার, পিয়েরো দেল্লা ফ্রাসেস্কা, বত্তিচেল্লি, এল গ্রেকো প্রমুখ বরেণ্য শিল্পীরা।

অবশ্যই মোনালিসা ফ্যাশন বদলের বিষয় হয়ে ওঠেছে—ভবিষ্যতেও এটা বজায় থাকবে। শিল্পের জগতে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিন বা সবসময় শীর্ষে থাকাটা বেশ কঠিন। যদিও শীর্ষে থাকার চেয়ে অবস্থান টিকিয়ে রাখা এবং অস্তিত্ব বজায় রাখা সহজ।

স্বাভাবিক কারণেই মোনালিসা তৈলচিত্রটি চুরি হয়ে যাওয়ার পর সংবাদপত্র ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে যে আলোড়ন উঠেছিলো, শিল্পকর্মটি উদ্ধারের পর সেই আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ক্রমশ শান্ত হয়ে আসছিলো আর এক পর্যায়ে লিওনার্দোর অন্য দুটো শিল্পকর্ম *Lady with an Ermine* এবং *St. Anne with Virgin and Child*-এর চেয়েও এর আলোচনা ও প্রশংসা কমে আসছিলো। লিওনার্দোর ওই দুটো কাজও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না—শিল্প সমালোচনা ও ঐতিহাসিকেরা এ দুটো কাজকে মাস্টারপিস বলে

ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং দর্শনার্থীরা এ দুটো কাজের ভূয়সী প্রশংসাও ক'রে থাকেন। সিসিলিয়া গ্যালেরানি আর *St. Anne* দু'জনেই দেখতে ছিলো মোনালিসার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। কিন্তু তাদের সেই সৌন্দর্য মোনালিসার বিজ্ঞাপিত সৌন্দর্যের কাছে যেনো ম্লান হয়ে গিয়েছিলো।

প্রগতির পুরোধা সমালোচক ও জনপ্রিয় উপন্যাসগুলোর পরস্পর বিরোধী মন্তব্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধে মোনালিসার খ্যাতির আগুন তখনও নিভে যায় নি। প্রগতিবাদী সমালোচকদের উদ্দেশ্য ছিলো মোনালিসাকে উপহাস করা, আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ উপন্যাসগুলোর মূল লক্ষ্য ছিলো মোনালিসার গুণকীর্তন ক'রে বাজারে ওই উপন্যাসগুলোর কাটতি বাড়ানো। দু'পক্ষই ছিলো নিজেদের যুক্তির ক্ষেত্রে অনড় এবং আপোষহীন।

আত্মপ্রচরণার মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে মোনালিসাকে যারা ব্যবহার করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম দানুনজিও, যিনি লেখক হিসেবে ছিলেন একেবারেই অনামি এবং অপরিচয়ের অন্ধকারে আচ্ছাদিত, সেই তিনি ১৯২০ সালে উচ্চতম আধুনিক কবি-লেখকদের (যেমন জয়েস, এলিয়ট বা প্রস্তু) কাছাকাছি ভয়ানক গতিতে চলে এলেন স্রেফ মোনালিসাকে তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার ক'রে। দানুনজিওর কাব্য সংগ্রহের ১৬৪ পৃষ্ঠায় আমরা দেখেছি কিভাবে একটি কবিতার রচনাকাল পিছিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, যেদিন মোনালিসা চুরি হয়ে যায় ওইদিনই ওই কবিতাটি লেখা হয়েছিলো।

যুগোশ্লাভিয়ার কিয়াম বন্দর থেকে অপহৃত মোনাকে উদ্ধার ক'রে ইতালিতে ফিরিয়ে আনার অভিযানে দানুনজিও ছিলেন এবং সেকারণে তাঁর খ্যাতি আরো বেড়ে গিয়েছিলো। ১৯২৫ সালে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের নাম *Portrait de Loyse Baccar's*। ফ্রান্সের একটি স্বল্প প্রচারিত দৈনিকে সেটা ছাপা হয়। দানুনজিওর অনুবাদক ও তাঁর গুণগ্রাহী আন্দ্রে দোদে কিয়াম বন্দরে তাঁর সঙ্গে দেখা হবার কথা তাঁর স্মৃতিচারণমূলক লেখায় উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, দানুনজিও দোদেকে আশ্বস্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন মোনালিসার চোর পেরুজ্জিয়া সংঘর্ষ বাধার আগেই ছবিটি হস্তান্তর করেছিলো। দানুনজিও তাঁর প্রবন্ধের এক স্থানে লিখেছেন, তিনি যখন যুদ্ধের আগে ফ্রান্সে বসবাস করতেন তখন পেরুজ্জিয়া তাঁর কাছে চুরি হওয়া মোনালিসা নিয়ে এসেছিলো।^১ এর পর তিনি আরো একটি লেখায় এ গল্পের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি বলেছেন, 'নাদান চোর কমলে প্যাচানো অবস্থায় আমার কাছে মোনালিসা নিয়ে এসেছিলো।' তিনি আরো বলেন, 'ঐ অবস্থায় আমি মোনালিসা'র তুলতুলে হাত দেখে ঘৃণা করতে শুরু করলাম।'^২

দানুনজিও ফ্রান্স এবং ইতালির বিভিন্ন ম্যাগাজিন থেকে মোনালিসা সংক্রান্ত খবরের পেপার কাটিং সংগ্রহ করে জড়ো করতেন।^১ সেখান থেকেই হয়তো মোনালিসাকে নিয়ে তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের বাসনা জাগে।^২ ১৯২০ সালে ২০ পৃষ্ঠার ফ্রিন্টের একটি চিত্রনাট্য তৈরি করলেন তিনি। চিত্রনাট্যের শিরোনাম ছিলো *L'unomo che rubo la Gioconda*, যার অর্থ 'জিওকোন্দের হরণকারী'। আসলে এটি ছিলো তাঁর প্রবন্ধেরই একটি ফিকশনালইজড ডেভেলপমেন্ট বা ঔপন্যাসিক সংস্করণ।^৩

ওই চলচ্চিত্রের কাহিনী ছিলো অনেকটা এরকম : '১৯১১ সালে পিটার ভ্যান ব্রোমেন নামক একজন চিত্রশিল্পী মেটাফিজিক্স এবং আলকেমি, এ দুটি বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। অবশেষে তিনি অংকিত ছবিতে মানুষের আত্মা প্রতিস্থাপন করে সেই ছবিকে রক্তমাংসের মানুষে পরিণত করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। তিনি পরিকল্পনা করেন, মোনালিসার ছবিকে এই প্রক্রিয়ায় জীবন্ত করে তুলতে হবে। তার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে প্যারিসের ল্যুনেলি নামক এক যুবক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলো। ল্যুনেলি লুভারে কর্মরত ছিলো। ল্যুনেলি ওই শিল্পীর কথায় মোনালিসাকে চুরি করতে রাজি হয়। তার কাজ ছিলো লুভারে ডাকঘরের আচ্ছাদন তৈরি করা। কাহিনীর এক পর্যায়ে দেখা যায় ল্যুনেলি এবং চিত্রশিল্পী ব্রোমেন মোনালিসাকে চুরি করে বিখ্যাত কবি দানুনজিওর কাছে নিয়ে আসে (এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, এই ছবির মাধ্যমে দানুনজিওর আত্মপ্রচারণার কৌশল নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে)।

চিত্রশিল্পীর মূল উদ্দেশ্য ছিলো মোনালিসাকে জীবন্ত করার আগে তার রূপলাবণ্যে বিখ্যাত কবির 'দুর্লভ উপমা' মাখিয়ে তার চেহারায় জৌলুস আরো বাড়িয়ে দেয়া।

কিন্তু যখনই কবি দানুনজিও মোনালিসার সামনে দাঁড়িয়ে তার রূপমোহে ডুবে গেলেন তখনই দেখা গেলো তার সুন্দরী স্ত্রী সোনিয়া ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠলো। শিল্পী ব্রোমেন দানুনজিওকে গোপনে জানালেন মোনালিসাকে জীবন্ত করতে হলে একটি রক্তাক্ত সজীব কলিজা অর্থাৎ হৃদয়ের প্রয়োজন। আর ওই হৃদয়ে রয়েছে আত্মা যা মোনালিসাকে জীবন্ত হয়ে উঠতে সহায়তা করতে পারে। শিকার হিসেবে তারা ল্যুনেলিকেই বেছে নিলেন। কিন্তু ল্যুনেলি ততোকণে দানুনজিওর ঈর্ষাকাতর স্ত্রী সোনিয়ার সাথে গহীন জঙ্গলে প্রবলভাবে আশ্রয়লাভ করে। তাদের ওই অবস্থায় খুঁজে পেয়ে ক্রোধে অন্ধ হয়ে দানুনজিও এক মুহূর্তের মধ্যে ল্যুনেলিকে হত্যা করেন এবং এ সময় সোনিয়া দূরের

একটি দাবানলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেয়। রক্তাক্ত সেই কলিজা মোনালিসার উপর প্রতিস্থাপন করে তাকে জীবন্ত করে তোলা হলো। সদ্য স্ত্রী হারানো বিপত্নীক পুরুষ দানুনজিওর মনে মোনালিসাকে জীবন্ত দেখামাত্রই কামনার আগুন জ্বলে ওঠে। একই সঙ্গে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কাব্যিক পংক্তি, 'তুমি কখনই জানতে পারবে না কেন তুমি হাসো।' জীবন্ত মোনাকে তিনি অনুরোধ জানায় চুমু খাবার জন্য। বলে ওঠেন, 'আমার আর কিছুই নেই।' কিন্তু তার সব চেষ্টাই ভুল হয়ে যায়। যখনই আবেগ ও কামতাদ্ভিত কবি দানুনজিও মোনালিসাকে স্পর্শ করেন তখনই মোনালিসার হাসি অদৃশ্য হয়ে যায়, এক সময় পুরো শরীর। অবশেষে আবার ছবিতে পরিণত হয় মোনা। ভ্যান রোমেন মোনালিসাকে আবার শারীরিক আকৃতিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু কাজ হয় না। দানুনজিও হতবাক হয়ে পড়ে থাকে। এক রাতের মধ্যে তিনি সোনিয়া ও লিসা দু'জনকেই চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলে।

কাহিনীর শেষ দৃশ্যে দেখা যায় মোনালিসা আবার লুভরে ফিরে আসে। চারপাশে অসংখ্য উচ্ছ্বসিত জনতা। হর্ষোৎফুল্ল জনতার মধ্যে দানুনজিও তাঁর স্ত্রীর দেহভঙ্গ্য নিয়ে এসে হাস্যোজ্জ্বল মোনালিসার মুখে ছুড়ে মারেন এবং চিৎকার করে বলেন, 'তোমার জন্যে আমি তাকে পরিত্যাগ করেছি।' জনগণ তাঁকে গ্যালারির বাইরে ছুড়ে ফেলে দেয়। লুভর মিউজিয়াম আবার জনগণের হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু দানুনজিও তার চিত্রনাট্য শেষ করলেও তা চলচ্চিত্রায়ণ করা হয় নি। একই সঙ্গে মোনালিসার চুরি যাওয়ার এই ঘটনাকে পরবর্তীতে ব্যবহার করে রাতারাতি বিখ্যাত চিত্র নির্মাতাও তাঁর পক্ষে হয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। তিনি হয়তো পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছিলেন, ফিক্সন বা কল্পকাহিনীর পরিণতি বাস্তব জীবনে এনে শেষ করলে দর্শক তা গ্রহণ করবে না। জনএফ কেনেডি, মার্টিন লুথার কিংয়ের মতো বিশ্বনন্দিত নেতার গুণহত্যা অথবা বৃটিশ রানীমাতার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ছবি নির্মাণ আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

মোনালিসার অপহরণকারী ভিনসেনজো পেরুজ্জিয়া মোনালিসার হাসিতে অভিভূত হয় নি। হয়তো ছবি চুরির পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত মোনার রহস্যময় হাসির বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন পড়ার আগে তার হাসির ব্যাপারটি খেয়ালই করে নি। হয়তো পড়ার পরও সে ওই হাসির কোনো মূল্যবান দিক অথবা তাৎপর্যপূর্ণ মর্মার্থও খুঁজে পায় নি।

কিন্তু চোরটা সবার আগ্রহের বিষয় না হলেও চুরিটা ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

করেছিলো। সম্ভবত আর্ন্তজাতিক কোনো শিল্প-সামগ্রী চোরাকারবারির দল পেরুজিয়াকে ব্যবহার করেছিলো। হয়তো উদ্ধারকৃত মোনালিসা আসলটি ছিলো না। হতে পারে লুভরে রক্ষিত মোনালিসা একটি অনুলিপি মাত্র, অথবা একেবারেই ভুয়া। আর ভুয়া মোনালিসার গল্পটি খুবই চমকপ্রদ। জালিয়াতরা বিশেষজ্ঞদেরকেও বোকা বানিয়ে দিতে সক্ষম। আর কে না জানে চিত্রকলার ইতিহাস জাল আর নকলে পরিপূর্ণ। কিন্তু এসব ঘটনা থাকে যেসব চিত্রকর প্রচুর পরিমাণে ছবি এঁকে থাকেন তাঁদের বেলায়, যেমন ক্যামিল কোরোত্ত, যার মোট ছবির সংখ্যা কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই আট হাজার।^১ মোনালিসা আসল না নকল সেই গল্পটি তাই বেশ চমকপ্রদ আর প্রলুব্ধকর।

মোনালিসার চুরি যাওয়ার ঘটনা সে বিভ্রান্তিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ছবির ইতিহাসে রয়েছে অনেক কাঁক। অনেকেই সেই কাঁক পূরণ করার বাসনায় এর নিরীক্ষা হওয়া থেকে শুরু করে পুনরুদ্ধার হওয়া পর্যন্ত যে সময়টুকু তার গোপন ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন এবং রহস্যময়তার জাল ছেঁড়ার চেষ্টা করেছেন। অবশ্যই সত্য যে, রেনেসাঁ যুগের বেশির ভাগ শিল্পকলার ইতিহাসই অনিশ্চিত ভিড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মোনালিসা এখানে বিশেষ গবেষণার বিষয়। যখন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় নি তখন সেখানে মিথ্যা ইতিহাসও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

ফ্লোরেন্স থেকে উদ্ধার করা ছবি দেখে বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে স্বীকার করলেন, এটিই আসল ছবি। তারা তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে তুরি তুরি প্রমাণ হাজির করলেন। ছবি পাওয়া গেছে এটাই বড় কথা। এটা ভেবে সম্ভবত কেউ এ পর্যন্ত আঁকা মোনালিসার নকল কপিগুলোর একটিকেই দীর্ঘদিন ধরে আসল ছবি বলে দাবি জানিয়ে আসছিলো। ১৯১৫ সালে জন.আর.আয়ার দাবি করে বসলেন, লিওনার্দো মোনালিসার ছবি ২ কপি এঁকেছিলেন।^২ তার একটি লুভর মিউজিয়ামে আরেক কপি তিনি ফ্রান্সেকো ইল পিওকোন্দার কাছে হস্তান্তর করেছেন। তাঁর ভাষায়, এই দ্বিতীয় কপিটি এখন রয়েছে লন্ডনের পশ্চিমে অবস্থিত শহর আইজলওয়ার্থে তার সং ছেলে হগ ব্রাকারের কাছে।^৩ এর কয়েক বছর পরেই আইজলওয়ার্থের এই ছবি চলে যায় হেনরি এক পুলিৎজারের সংগ্রহশালায় এবং পুলিৎজার নিজ খরচায় একটি বুকলেট প্রকাশ করেন যার শিরোনাম ছিলো, *Where is MonaLisa?* (১৯৬৭)।^৪ সেখানে পুলিৎজার লিখেছেন 'এ ছিলো এক মহান ভালোবাসার গল্প, যা কখনও বদলার না...প্রথম এই মহিলাকে দেখার পর থেকে ২০ বছর ধরে আমি তাকে নিজের বাড়িতে এনে রাখার অভিলাষ মনে মনে পোষণ করে রেখেছি।'^৫

১৯৬২ সালে তিনি ওই 'আসল' ছবিটি কিনেছিলেন। নিজের বাড়িঘর ও সমস্ত ছবি বিক্রির টাকায় ওই ছবি কিনেছিলেন। তিনি খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করেছেন, জন আয়ার তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, ছবিটি প্রকৃতপক্ষেই লিওনার্দোর আঁকা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো মোনালিসাকে আসল প্রমাণিত করার আগেই ১৯৭৯ সালে পুলিশজার হঠাৎ করেই মারা যান।

অবশ্য পুলিশজারের মোনালিসা শেষ পর্যন্ত হালে পানি পায় নি। জর্জ পিয়েরকুঁয়া'র দু মোরোয়াঁ পোর লা জোকোন্দে (১৯৮৫) উপন্যাসে মেরিলিন নামের একজন একদল জালিয়াতকে রেনেসাঁ চিত্রকর্ম জাল করতে রাজি করাতে সক্ষম হয়। সে মন্তব্য করে যে, লুভরের মোনালিসার সাথে একটি আর্টবুকের অনুলিপি মোনালিসার মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে। সে এই ব্যাপারটি খেয়াল করেছে কারণ সে সব সময়ই তার প্রিয় চিত্রকর্মটির দিকে একাগ্রচিন্তে তাকিয়ে থাকতো, অন্যদের মতো কেবল তার বিখ্যাত হাসির দিকে নয়। পরে দেখা যায় যে, বইয়ের ছবিটা লিওনার্দোর আঁকা দ্বিতীয় মোনালিসা। উপন্যাসে এই তথ্যটিকে সত্য হিসেবে দাবি করা হয়েছে। এটা কোনো কাল্পনিক ব্যাপার নয়। অন্য আরেকটি মোনালিসা বৃটিশ আর্ট-ডিলার হেনরি পুলিশজারের কাছে রক্ষিত আছে।^{১১}

'আসল' মোনালিসার খোঁজ অবশ্য অনেক আগেই শুরু হয়েছিলো। ১৯৫৪ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সের অধিবাসী ও এন্টিক ডিলার রেমন্ড হেকিং দানুনজিওর গল্লের উপর ভিত্তি করে লুভরে সংরক্ষিত মোনালিসার নির্ভরযোগ্যতার উপর সন্দেহ পোষণ করেন। তিনি আসল ছবিটি তাঁর কাছে আছে বলে দাবি করেন এবং তাঁর নিজের শিল্প-বিশেষজ্ঞ এটাকে সমর্থনও করেন। এই জোকোন্দে দ্য নাইস ছবিটি এতো বেশি কভারেজ পায় যে, দশ বছর পরও সেটার উল্লেখ চলতে থাকে। পরবর্তীতে ছবিটি ফ্রেসার ক্রেমেণ্ড প্রদর্শন করেন।^{১২}

১৯৭২ সালের অক্টোবরে লর্ড ব্রাউনলো ঘোষণা দেন, গত দুই দশক ধরে পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে তাদের পরিবারে আসল মোনালিসা রয়েছে এবং বর্তমানে তা লিংকনশায়ারে তাঁর বাড়িতেই রয়েছে। কিছু জাদুঘর তাদের কাছে রক্ষিত মোনালিসাকে আরও উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো।

১৯৬১ সালে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মারবেই গাউকোভস্কি বলেন, হার্মিটেজে মোনালিসার যে ছবিটি রয়েছে সেটিই লিওনার্দোর আঁকা। লিওনার্দো এ ছবি অসমাপ্ত অবস্থায় মেলজিকে উপহার দেন। এবং পরে মেলজি ছবির কাজ সম্পন্ন করেন।^{১৩}

যুক্তরাষ্ট্রও দাবি করেছে তাদের কাছেই মোনালিসার মূল ছবিটি রয়েছে। ১৯৭৯ সালে বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনের একজন মার্কিন বন্ধু উইলিয়াম হেনরি ভার্নন জানান, তার কাছে ষোড়শ শতকে লিওনার্দোর আঁকা মোনালিসার মূল ছবিটা রয়েছে। ১৭৯৩ সালে রাণী মেরি আতোয়ার মৃত্যু দণ্ডদেশ কার্যকর করার কিছুদিন আগে তিনি রাণীর কাছ থেকে তা কিনে নেন।^{১৪} ভার্ননের কাছে রক্ষিত ওই ছবিটি মোনালিসার একটি নকল কপি হিসেবেই সর্বজন স্বীকৃত হয়, কিন্তু ১৯৬৪ সালের জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত লস এ্যাঞ্জেলেসের ওটিস ইন্সটিটিউটে ওই ছবি প্রদর্শিত হবার পর তা আসল ছবির মতো মনে হয় দর্শকদের কাছে। ১৯৯৫ সালের ১২ জানুয়ারি নিউইয়র্কে এ ছবি ৫ লাখ ৫২ হাজার ৫শ' ডলারে বিক্রি হয়ে যায়। অপরদিকে ১৯৯৪ সালে হিউন্টনের আরেকটি নকল ছবির দাম ওঠে মাত্র ১২শ' থেকে ১৮শ' ডলার।

মোনালিসা বিষয়ক এই সকল সত্য-মিথ্যা ও সব ধরনের ফালতু দাবির খবরও মিডিয়া আগ্রহসহকারে দীর্ঘ প্রতিবেদন আকারে ছেপেছে। ধীরে ধীরে সেইসব বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদনে অনেকের মনেই এখন সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে লুভরে রক্ষিত ছবিটি হয়তো আসল নয়, অথবা এ ছবি লিওনার্দোর আঁকা নয়। এ ছবি আসলে কবে আঁকা, কার আঁকা, তা একেবারেই অনিশ্চিত।

পুলিৎজারের দাবিটি ডেইলি এক্সপ্রেস এবং প্যারিস জুর প্রথম পাতায় বেশ ফলাও করে প্রচার পায় (১০ই জানুয়ারি ১৯৬৭) আর সেখান থেকে খবরটি সারা বিশ্বের সব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সবগুলো গল্পের ধরণই একই রকম ছিলো—বর্তমানের 'আসল' মোনালিসা হলো ভুয়া। এইসব প্রচারণার ফলে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই ভাবতে লাগলেন, এই ছবিটি ভুল ক্যানভাসে, ভুল পদ্ধতিতে এবং ভুল শতাব্দীতে আঁকা। তার চেয়েও বড় কথা সেটা লিওনার্দো কিংবা তাঁর দূরতম কোনো আত্মীয় কর্তৃকও আঁকা হয় নি। এ সংক্রান্ত ফাইলটি ক্রমশ মোটা হতে লাগলো। এখনও এটা অব্যাহত রয়েছে।

লুভর জাদুঘরের পক্ষ থেকে বার বার সংরক্ষিত মোনালিসার ছবির মৌলিকত্ব ও অরিজিনালিটির ব্যাপারে প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে অবশ্য পুরোপুরি সাফল্য মেলে নি। যখনই কোনো সংবাদপত্র নকল ছবি প্রসঙ্গে কোনো নিবন্ধ প্রকাশ করেছে তখনই ফটো সম্পাদক মোনালিসার একটি ছবি জুড়ে দিয়েছেন এবং নিচের ক্যাপশনে লিখেছেন, 'এটা কি নকল?'^{১৫}

জনসাধারণ এ জাতীয় প্রতিবেদন ও গল্পে বেশ আগ্রহ প্রকাশ করে। কেউ কেউ এসব হেঁয়ালিতে যোগ দিতেও ছাড়ে না। তারা লুভরে 'আসল' ও 'নকল' মোনালিসাকে নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে চিঠি লিখতে

থাকে। লুভর কর্তৃপক্ষও সৌজন্যবশত তাদের চিঠির জবাব দেয়। ফলে বিষয়টি তাদের কাছে আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সমসাময়িক ফিক্শন ও ননফিকশনে ছবি চুরির বিষয়টিকে এক দুঃসাহসী অভিযানের মতো বর্ণনা করা হয়। এমনকি ছোটোদের উপযোগী ডিকেটটিভ উপন্যাসগুলোতেও মোনালিসা অপহরণের ঘটনাকে ব্যবহার করা শুরু হয়। এই সব গল্পের কিছু কিছু একেবারেই গুরুত্বহীন, যেমন পিয়েরে ফর্তের 'লো দানিয়ে আরামু রোয়াঁ দ্য লা জোকোন্দে' (লা ইউরোপিন, ২৯শে মে ১৯৩৬), যেখানে স্যার ম্যাককল নামের এক স্কটিশ জমিদার মোনালিসার প্রেমে পড়ে এবং এক চোরকে ছবিটা চুরি করতে রাজি করায়।

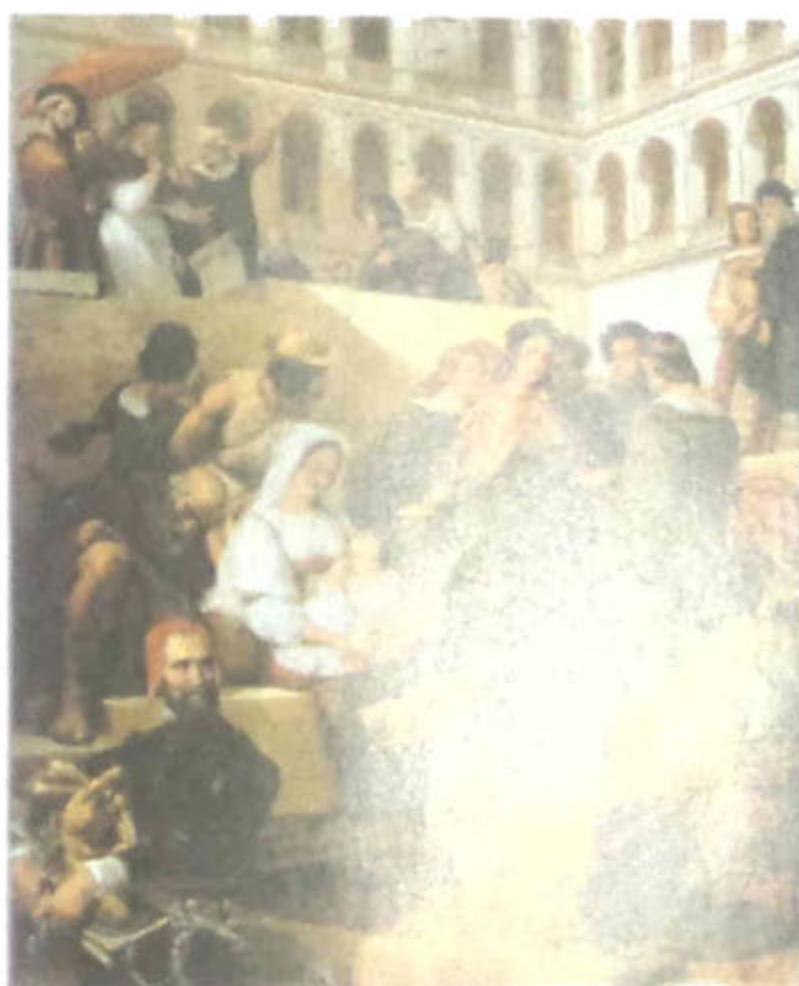
আরো মজার ব্যাপার হলো এই চুরির ঘটনায় নিজেকে জড়িয়ে অনেকেই রাতারাতি খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা শুরু করে। ১৯৩২ সালের ২৫ জুন *Saturday Evening Post* নামক পত্রিকায় মার্কুয়িস নামক এক শিল্পী সাংবাদিক কার্ল ডেকারের কাছে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, কিছু ধনী সংগ্রাহককে খুশি করার জন্যই তিনি মূলত মোনালিসাকে অপহরণ করেন। কিন্তু লুভর থেকে ছবি সরানোর পর ওইসব ধনী সংগ্রাহক যখন সে ছবিকে নকল ব'লে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন তখন তিনি তার প্রধান স্যাক্সাত ভিনসেনজো পেরুজ্জিয়াকে দিয়ে তা আবার লুভর মিউজিয়ামে ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি দাবি করেন, লুভর মিউজিয়ামে যে মোনালিসাকে ফেরত দেয়া হয় সেটি ছিলো নকল। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে লুভর কর্তৃপক্ষ সেটাকেই আসল ব'লে মেনে নিয়েছিলেন। মার্কুয়িসের সাক্ষাৎকার দেবার এক বছর পর ওই *Saturday Post* পত্রিকাতেই জ্যাক ডিন নামের আরেকজন নিজেকে মোনালিসার মূল অপহরণকারী হিসেবে দাবি করেন।^{১৬}

সাইমুর ভি. রেইটের লেখা *The day they stole the Mona Lisa* (১৯৮১ সালে প্রকাশিত) বইটি একটি আদর্শ কল্পভিত্তিক ননফিক্শন। ওই বইয়ে গল্পের মাধ্যমে মোনালিসার চুরির ঘটনাকে শৈল্পিক আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে।^{১৭} ওই বইয়ের প্রধান চরিত্র এদুয়ার্দো ভালফিয়েরোকে চুরির প্রধান নীলনকশাকার হিসেবে দেখানো হয়েছে। পেরুজ্জিয়াকে দেখানো হয়েছে তার সহকর্মী হিসেবে।

এদুয়ার্দো ভালফিয়েরো রবার্ট নোয়ার জনপ্রিয় উপন্যাস *The man who stole the Mona Lisa*-তে মূল চরিত্র হিসেবে ফিরে আসে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। ভালফিয়েরো তার মৃত্যুর পর স্ত্রীর অর্থনৈতিক



୨୦. ଡ୍ରୋ ଦୁ ସାଲୋନ୍ ଡାନ୍ସ ଆ ମିଉଜିକ୍ ଦୁ କୁବର, ଜୋହନ୍ କାର୍ଟିର ଏନ (୧୮୬୧), ଲୁଭ.



୨୧. ବାଫାୟେଲ ଆ ଜାଡିକାଲ, ହେନରୀ ଡେବିସ (୧୮୬୨), ଲୁଭ.



২৩। প্রজেক্ট অব দি নিউ গ্র্যাণ্ড গ্যালারি, হবার্ট রবার্ট (১৭৯৬, লুভর)



২৫. চাকরবল বিঃ ইক্টোটিউস টি লিওনার্দো, এন্ড্রিয়াভিং, পল শ্রদপার আলোই, অইনে পেইন্ট এন্ড একটি ছবি অবলম্বনে (১৮৬৫, বিবলিওথেক ন্যাশনেইল দ্য ফ্রান্স)



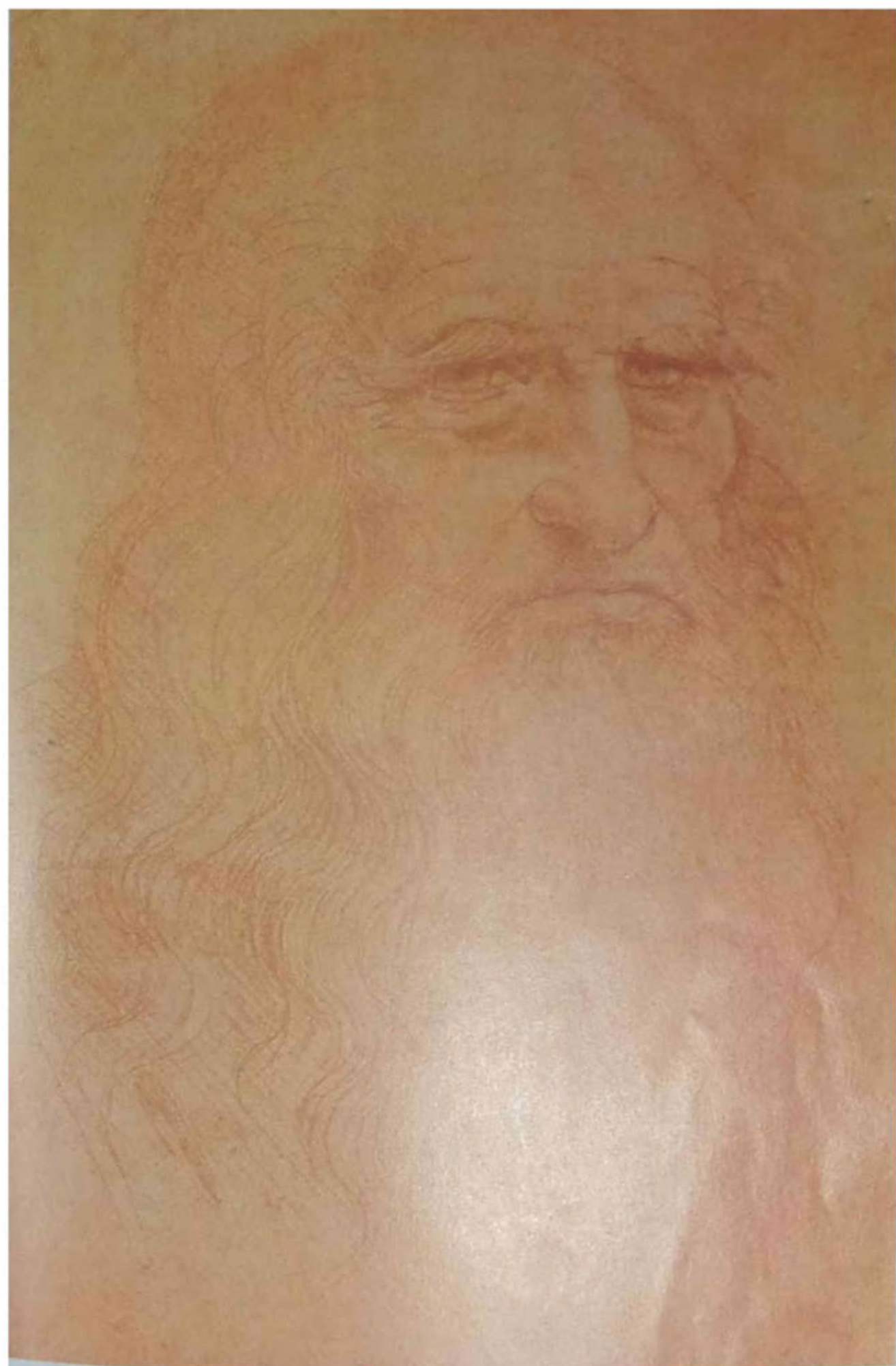
২৪. দা ডেথ অব লিওনার্দো ইন দি আর্মস অব কিং ফ্রান্সেসো, ডা-অগুস্ত ডামেনেক ইংয়েস (১৮১৮, মিউজি দু শেতিভ প্যারিস, প্যারিস)



২৫. চাকরবল বিঃ ইক্টোটিউস টি লিওনার্দো, এন্ড্রিয়াভিং, পল শ্রদপার আলোই, অইনে পেইন্ট এন্ড একটি ছবি অবলম্বনে (১৮৬৫, বিবলিওথেক ন্যাশনেইল দ্য ফ্রান্স)



২৬. লিওনার্দো চে রিভেরাই লা গিওকোন্দা, সিভার মাকারি (১৮৬৩, ইতিহাসে প্যার লো বেলে আর্টি, সিয়েনা)



২৭. আত্মপ্রতিকৃতি (১), লিওনার্দো (১৫১২-১৩, বিবলিওটেকা রিয়েল, ফ্লোরেন্স)



২৮. দা কাউন্টেস অব কাব্রিলিওন, (মিউজি দস্তারলিখেন, কোলমার) স্থিৰচিত্ৰ ২৯. নানা. এদুয়ার্দ মনে (১৮৭৭. কুস্টইল, হ্যামবুৰ্গ)



৩০.
মা জিউন
ফিলে এ
লয়েলেত,
হিপোলাইত
জাঁ ক্লান্দারিন
(১৮৫৮)



৩১.
ফ্রান্স
হাল্‌স,
দা বোহেমিয়েন
(১৬৩০. লুভ্ৰ)



৩২.
বোকা বানিয়াতা
(‘দা কিসড মাউথ’)
দাশ্বে গ্যাব্রিয়েল
রোসেত্তি (১৮৫৯,
মিউজিয়াম অব
ফাইন আৰ্টস,
বোষ্টন)



৩৩. নিতে উইথ প্যাসেসেল, ইল্ডা বেল
১৮৬৭. ফোৰ্ডহাং মিউজিয়াম, ব্ৰুসেল



৩৪. লা ভিয়েল দ্য চার্লিসেরে বোমিন, ইয়ান ভান অউক (১৪৬৫, লুভর)

৩৫. মোনালিসা উইথ এ লাইক, সাংলর (১৫৮৭, চিহ্নিত অর্ড নিউজিয়াম, কটগারন, নিউজার্সি)

৩৬. LHOOU বার্সেল দৃশ্য (১৫১১, ফিল্ডেলফিয়ার্ বিউজিয়াম অব আর্ট)



৩৭. কম্পোজিশন উইথ মোনালিসা, কার্নিহির মেলভিক (১৯১৪, স্টেট রাশিয়ান মিউজিয়াম, সেন্ট পিটার্সবার্গ)

৩৮. লা ভিয়েল দ্য চার্লিসেরে বোমিন, ইয়ান ভান অউক (১৪৬৫, লুভর)

৩৯.
১৯১১
সালের
২৩শে
আগস্ট-এর
এক্সেলসিওর
পত্রিকার প্রথম
পৃষ্ঠা, মোনালিসা
দুতর থেকে
হুঁড়ি হবার
পরের দিন



৪০.
ডোমেনিকা
দেল কেবিয়ে-
এর প্রথম পৃষ্ঠা
মোনালিসা
হুঁড়ির পরে



৪১. ইয়েভন পোল্লি'র পোস্টকার্ড।

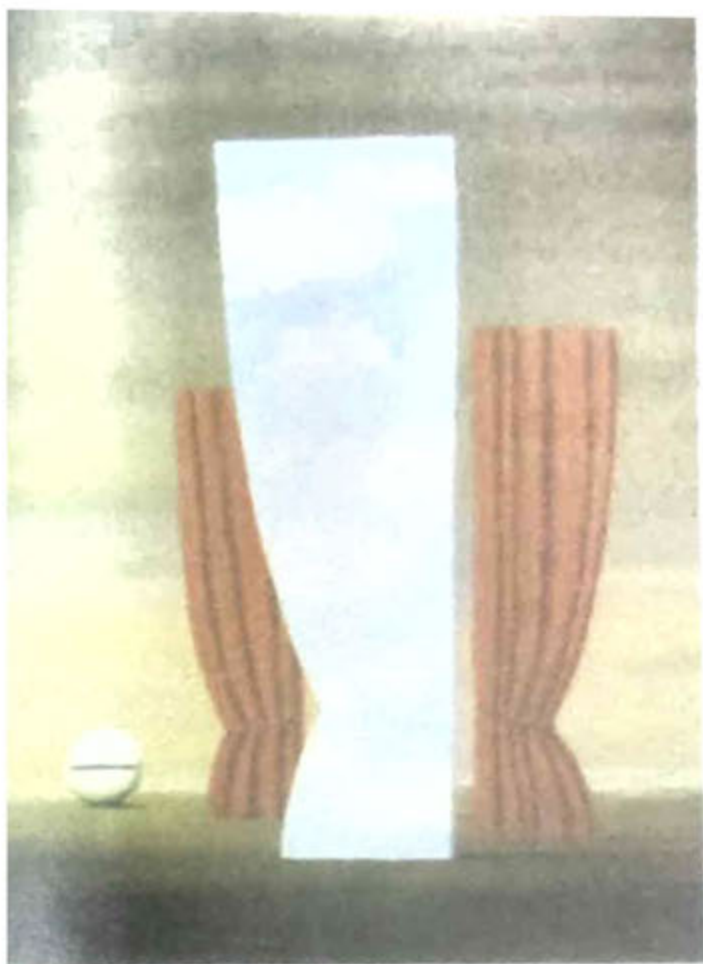


৪২. মোনালিসা টইঞ্চ দার্লিং মোটোচেস, ক্লিপিং হালসম্যান এর ফটো মন্তাজ (১৯৫৩)

৪৩.
কলম্বিয়ান
ফার্নান্দো
বোতেরো'র
মোনালিসা
(১৯৭৮)



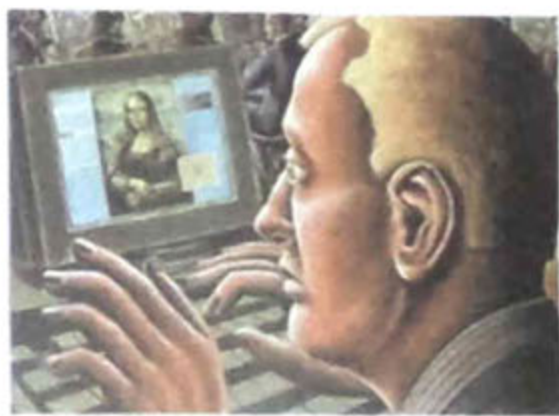
৪৪. খার্টি আর বেটোর দ্যান ওয়ান,
আন্ডি ওয়ারহল (১৯৬৩)



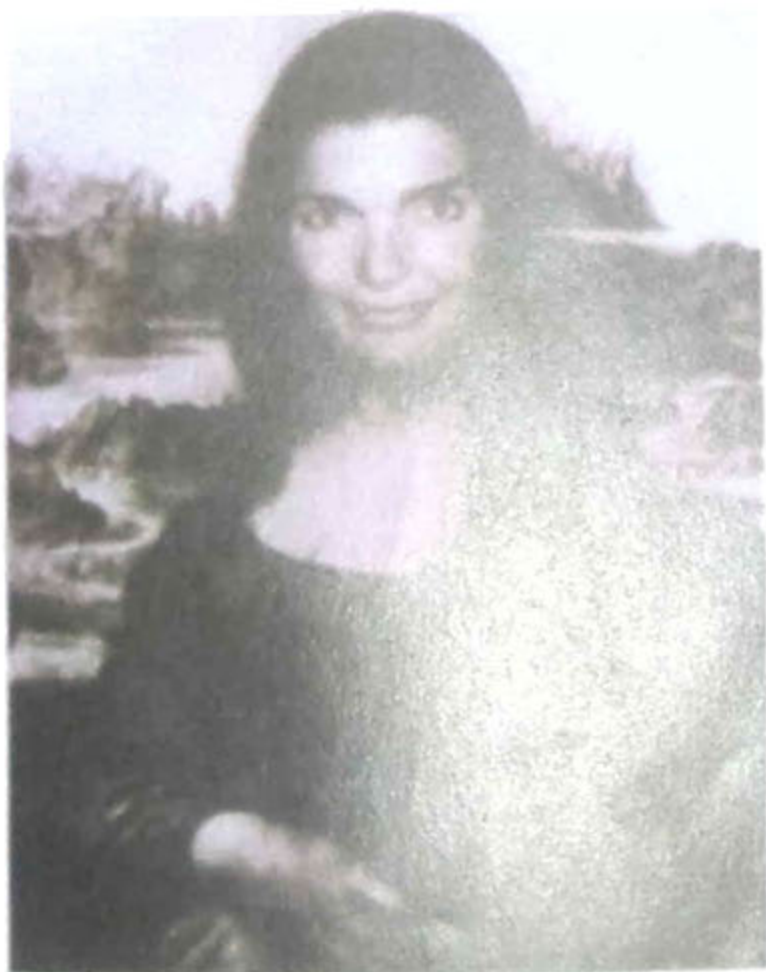
৪৫. লা জোকেসে, রেনে মাগরিসে (১৯৬০)



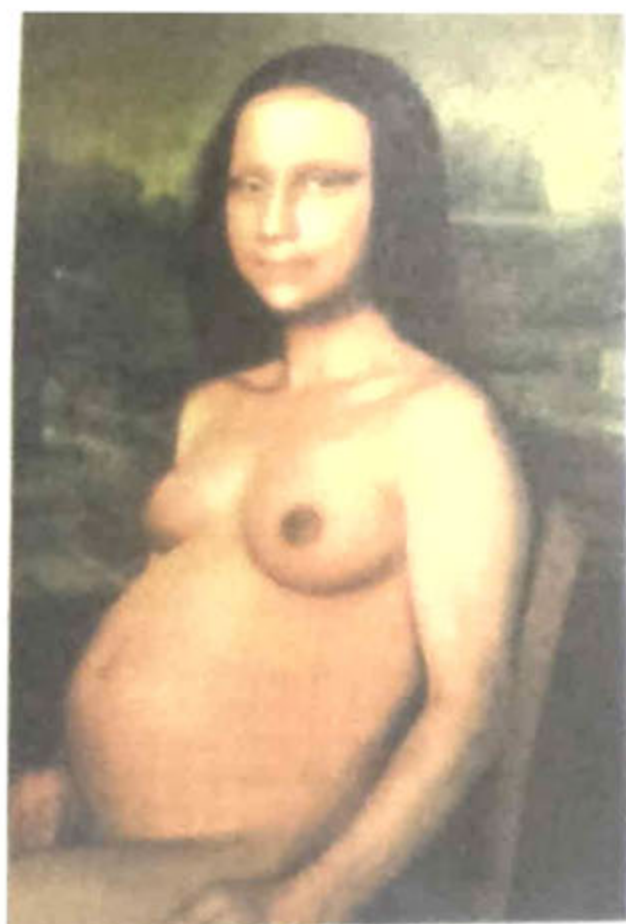
৪৬. মোনালিসার প্রথম বাণিজ্যিক ব্যবহার (১৯১৫)



৪৭. লিওনার্দো, পি. জে. ব্রুক: (কম্পিউটারের বিজ্ঞান)



৪৮. অ্যান্ড্রু লিন কনভি'র মোনালাইজড সংস্করণ (১৯৬৩)



৪৯. মোনালিসা ইন প্রেগনেন্সি, ইয়াসুয়াস মাদ্রুলা (১৯৯৮)



৫১. দো দা লা জোকেন্সে, জ্যাক পোইরে (১৯৯১, গ্যালারি আলই দোয়া, প্যারিস)

৫০.
পোস্টকার্ড,
বৃটিশ কার্টুনিষ্ট
সিও বেট
(১৯৯২)
কার্টুনটির শিরোনাম
ছিলো 'মোনা
আসলে হাসার
চেষ্টা করছে না, সে
অপেক্ষা করছে
লিওনার্দো তা'র
নিরব পাদেয়
আওয়াজ শুনা, এ
পেরেছেন কিনা'



নিরাপত্তার জন্য এবং স্ত্রী যেভাবে জীবনযাপন করতে চায় তার জন্যে প্রচুর টাকার সংস্থান করতেই মোনালিসা চুরি করে।^{১৮}

The man who stole the Mona Lisa নামে মার্টিন পেত্র আরেকটি উপন্যাস লেখেন ১৯৮৪ সালে, সেটা অবশ্য ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা ছিলো। প্রকাশক ওই উপন্যাসকে ইতিহাস ও কল্পকাহিনীর সংমিশ্রিত একটি ধুলার ব'লে অভিহিত করেছেন।^{১৯} এখানে কোটিপতি চিত্র সংগ্রাহক ও মোনালিসার চুরির প্রধান নির্দেশদাতা হিসেবে যাকে দেখানো হয়েছে তিনি জন পিরেপন্ট মর্গান ছাড়া আর কেউ নন। কাহিনীর এক জায়গায় দেখা যায়, মর্গান বিখ্যাত শিল্পকর্ম চোর অ্যাডাম ওয়ার্থকে (অ্যাডাম ওয়ার্থ এর আগে গেইনসবরোর *Duchess of Devonshire* ছবিটি চুরি করে বহুল আলোচিত ও কুখ্যাত হয়েছিলেন) বলেন, মোনালিসার যে বৈশিষ্ট্য তাকে মুগ্ধ করেছে তা তার হাসি নয়, তিনি মুগ্ধ হয়েছেন তার চোখ দেখে। তার কথায় : 'তুমি তাকে দেখতে পারো অসংখ্যবার, ফিরেও আসতে পারো, কিন্তু সেই দুটি প্রেমময় চোখ তোমাকে দিনের পর দিন তাড়িয়ে বেড়াবে।'^{২০} ওয়ার্থ নির্দেশ মতো পেরুজ্জিয়ার মতো আবার লুভরে ঢুকে মোনালিসাকে চুরি করে। উপন্যাসের ক্লাইমেক্স এখান থেকেই শুরু হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ মুহূর্তে ফ্রান্স সরকারকে মর্গান ব্রাকমেইল শুরু করে।

উলফ ম্যানকোভিচের ১৯৮৭ সালের হাস্যরসাত্মক *গিওকোন্দা* একটু ভিন্নধরণের। সেখানে যথারীতি ভদ্রলোক গোছের একজন চোর ছিলো যার নাম ড্যানিয়েল লেভি; লন্ডনের একজন আর্টডিলার; টেক্সাসের একজন আর্ট সংগ্রাহক এবং অন্য অনেকে। সেখানে এক আমেরিকান টুরিস্ট মন্তব্য করে, 'তার চোখের পাপড়ি ক্রান্ত,' আর নিজের সম্পর্কে বলে, 'আমার চোখের পাপড়িও বড্ড ক্রান্ত। চলো কফি খাওয়া যাক। এই জায়গাতে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।'^{২১} সেখানে প্যারিসের এক পুলিশ প্রধান ফ্রয়েডের কাছে চোরের ব্যক্তিস্ব সম্পর্কে জানতে ভিয়েনাতে যায় : '“হের প্রফেসর, আপনি কি মনে করেন বদমাশ লোকটি একজন ইহুদি বুদ্ধিজীবী হতে পারে?”’ ফ্রয়েড মন্তব্য করেন, '“আমার তাতে সন্দেহ আছে,”' এ কথা বলেই তিনি নিজের সিগারেটে কামড় দেন। ‘“মোনালিসা একেবারেই ঝুঁকিগ্রস্ত মাতা। ইহুদি মায়েরা একেবারেই আলাদা রকমের হয়।”’^{২২} চোর লোকটি মোনালিসাকে 'প্রাক রাফায়েল যুগের শেষ ব্যক্তি' হিসেবে খ্যাত এক দক্ষ জানিয়াতের কাছে নিয়ে যায়।^{২৩}

মোনালিসা ছবি চুরির ঘটনাটি ভাষা শিক্ষা কাজেও ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে প্রথম বর্ষের ইংরেজি শিক্ষার ক্লাসে পাঠ্যবই হিসেবে স্টিফেন ব্র্যাবেলেই'র লেখা *Marcel and the Mona Lisa* (১৯৯১)

বইটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।^{২৪} এ বইটি মূলত একটি, রূপকাশ্রয়ী ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস। মার্সেল হলো এক ফরাসি ইঁদুর এবং একজন গোয়েন্দাও। অপহৃত মোনালিসাকে চোর যে ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে ভেনিস বন্দরে নিয়ে আসে মার্সেল লাফ দিয়ে তার মধ্যে লুকিয়ে পড়ে এবং মোনালিসার রোল করা ক্যানভাসের মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করে (গল্পের প্রয়োজনে দেখানো হয় লিওনার্দো মোনালিসাকে আঁকতে ক্যানভাস ব্যবহার করেছিলেন)। উপন্যাসের কাহিনীতে দেখানো হয়েছে ভেনিস বন্দরে মোনাকে নিয়ে চোর উপস্থিত হলে মার্সেল ব্যাগের মধ্য থেকে মোনার ছবি উঁচু করে ধরে এবং পুলিশ তা দেখে ফেলে চোরকে গ্রেফতার করে।

ক্রিস গুনহলফ মোনালিসার অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ১৯৯৪ সালে লেখেন তাঁর কাব্যগ্রন্থ *Stealing the Mona Lisa*। সেখানে মোনালিসার ওপর কোনো কবিতা ছিলো না, চুরির কথা না হয় বাদই দেয়া গেলো। এ গ্রন্থের *The night I met marilyn* শীর্ষক কবিতায় মেরিলিন মনরোর সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তের বর্ণনা দিয়েছেন কবি : ‘আর সেদিনের রাতে যা ঘটেছিলো/ সেটা কখনই আমি ভুলবো না/ যেনো আমি মোনালিসাকে চুরি করেছিলাম।’ চমকপ্রদভাবে কবিতাটি শেষ হয় এই বলে যে, তাঁর শীঘ্রই প্রকাশিত হতে যাওয়া বইতে তিনি এ বিষয়ে সব কিছু উন্মোচন করবেন।^{২৫} এ বইটির প্রচ্ছদে জেসপার জন্সের *Racing thoughts* বইটির (এ বইটিতে মোনালিসা বাম দিকে ছিলো) প্রচ্ছদ ব্যবহার করা হয়।

র‍্যামসি মন্টগোমারির লেখা *The Mona Lisa is missing* (১৯৮৮) হচ্ছে এমন একটি কিশোর উপন্যাস যাতে মোনালিসা হারিয়ে যাবার পর কিভাবে কোথায় তাকে হস্তান্তর করা হয়, মোনালিসাকে কোথায় কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় সেই সব ঘটনা দেখানো হয়েছে। মোনার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে করতে ব্যাপক ভৌগোলিক বর্ণনা চলে আসে এ উপন্যাসে। বরিস বার্গম্যানের লেখা *Un Tatami pour Mona Lisa* একটি রহস্য উপন্যাস। নিউইয়র্কে ইহুদি অপরাধীদের তৎপরতা নিয়ে এর কাহিনী রচিত। এ বইয়ে কাহিনীতে দেখা যায় নোবুরো নামের এক জাপানি নাগরিক মোনালিসাকে চুরি করে নিউইয়র্ক চলে আসে এবং তার পিছু লাগে ইহুদি তদন্ত অফিসার র‍্যামন বারকোভিস্ক। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় চোর যে চিত্রকর্মটি চুরি করেছিলো সেটি জাল। লুভর মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ আসল ছবিটি লুকিয়ে রেখে নকল ছবি প্রদর্শন করছিলো। সেই ছবিই চুরি করে এনেছে। ‘তুমি কি করে ভাবতে পারলে যে, তারা আসল ছবিটা এভাবে প্রদর্শন করবে এতো পর্যটকের ভীড়ের মধ্যে...’^{২৬}

লরা শরেনির লেখা *La joconde assassine* উপন্যাসটি ১৯৯১ সালে লেখা হলেও তা প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। এ উপন্যাসের নায়ক ফ্রাসোয়া লা ফোর্মে একজন সাংবাদিক এবং নায়িকা সিস্টার ক্রেয়ার। সিস্টার ক্রেয়ারকে ছব্ব মোনালিসার মতো দেখায় এবং তার হাসিও মোনার মতোই।^{২৮} উপন্যাসে দেখা যায় মুসলিম উগ্রপন্থী একটি গ্রুপ মোনালিসাকে অপহরণ করে জিম্মি হিসেবে নিজেদের দখলে রাখে এবং ফ্রান্স সরকারকে হুমকি দিয়ে জানিয়ে দেয়, যদি সে দেশে আশ্রিত ধর্ম বিরোধী এক লেখককে তাদের হাতে তুলে দেয়া না হয় তাহলে মোনালিসাকে ধ্বংস করে ফেলা হবে। তাদের দাবির সত্যতার পক্ষে তারা মোনালিসার একটি ছবি তুলে পাঠায় যাতে দেখা যায় তার মাথায় চাদর দিয়ে ঘুমটা দেয়া আর পেছনে একটা মসজিদের ছবি।^{২৯} মিশেল নোয়ির *I olage* উপন্যাসে ('দ্য হোস্টেজ,' ১৯৯৮) প্রায় একই ধরনের কাহিনী টানা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে সন্তাসীরা *Winged victory* ও *Venus de Milo* ভাস্কর্যটি ধ্বংস করে ফেলেছে এবং মোনালিসার ছবি নষ্ট করে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। তারা কি সফল হবে?^{৩০}

১৯৭৯ সালে ফরাসি এক কমিক-স্ট্রীপে দেখানো হয় বৃটিশ মিউজিয়ামে মোনালিসাকে ধার দেবার সময় সেটা চুরি করা হয়।^{৩১} এরও আগে এরকম চুরি আমেরিকার *li'l Abner* কমিক-স্ট্রীপে দেখানো হয়।^{৩২} ১৯৬৫ সালে ইতালির পরিচালক মিশেল জেভিকো নির্মাণ করেন *On a volé la joconde* নামের একটি চলচ্চিত্র। ওই ছবিতে জর্জ চাকিরিস নামের একজন ভদ্রগোছের চোরের একটি চরিত্র রয়েছে যে মোনালিসার চিত্রকর্ম চুরি করার পরিকল্পনা করে। সেই পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করেই পুরো ছবির কাহিনী নির্মিত হয়েছে।

খুব বেশি তথ্য সমৃদ্ধ হলে শিশুরা কমই আগ্রহ দেখায়, তাদের উত্তেজনা দমে যায়। সিরিল ভারলেইর ১৯৭৬ সালের *মোনালিসা*র চুরি বইটি ছিলো সাত থেকে এগারো বছরের শিশুদের জন্য। এতে দেখানো হয় লিওনার্দো কিভাবে মোনালিসাকে আঁকেছেন। সেখানে লিওনার্দোর অনেক গল্পও রয়েছে : প্রথম ফ্রাসোয়ার কোলে মৃত্যুবরণ করা থেকে শুরু করে মোনালিসার রহস্যময় হাসি পর্যন্ত—‘তিন শত বছর ধরে মানুষ মোনালিসার দিকে তাকিয়ে থেকে তার রহস্যময় হাসির কারণ জানতে না পেরে বিমূঢ় হয়েছে’—চুরির ঘটনার আগে এটা বলা হয়েছে। বইটিতে আরো বলা হয়েছে যে, পেরুজিয়া দেশপ্রেম থেকে ছবিটি চুরি করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো।^{৩৩}

বব শ'র 'দ্য গিওকোন্দা ক্যাপার'(১৯৮৮) উপন্যাসে একাধিক মোনালিসার কথা বলা হয়েছিলো।^{৩৪} এই উপন্যাসের নায়ক হলো ফিল ডেক্সটার, সে এক জন 'প্রাইভেট-সাই' (যে গোয়েন্দা সাইকিক শক্তি ব্যবহার করে)। অসাধারণ সুন্দরী ক্যারোল ক্যালভিন তাকে মোনালিসা খুঁজে পেতে সাহায্য করে। সে তার বাবার পুরনো জিনিসপত্রের মধ্যে এমন একটি মোনালিসাকে খুঁজে পায় যেটা দেখতে ঠিক লুভরের মোনালিসার মতো। ডেক্সটার সাইকিক ক্ষমতা ব'লে জেনে যায়, ছবিটা লিওনার্দোর আঁকা। সেই সাথে আরো কিছু তথ্যও জেনে যায় সে : মোনালিসার হাত দুটো ভাঁজ ক'রে কোলের ওপর রাখা নয়, দুটো হাতই আসলে আলাদা ক'রে রাখা। ঘটনাচক্রে তারা দু'জন মিলানের কাছে একটা গুহা আবিষ্কার ক'রে ফেলে যেখানে অনেকগুলো মোনালিসা রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকটি ছবিই একটার থেকে আরেকটা আলাদা ছবিগুলো বৃত্তাকারে রাখা আছে আর তার মাঝখানে রয়েছে একটা চাকা। মোনালিসাগুলো চাকাটার দিকে মুখ ক'রে রাখা। চাকার মাঝখানে একটা সেন্সিভল, তাতে দুটো ফুটো রয়েছে। সব দেখে তারা বুঝতে পারে জিনিয়াস লিওনার্দো এই বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। তবে সেই চলচ্চিত্র রেনেসাঁ যুগের তৈলচিত্রের উপর নির্ভরশীল ছিলো। লুভরে রাখা মোনালিসা হলো পৃথিবীর প্রথম চলচ্চিত্রের প্রথম একটি ফ্রেম মাত্র। সেই ছবিটার শুরু হয় মোনালিসার একটি স্তন উন্মোচনের মধ্য দিয়ে আর ছবিটি শেষ হয় মোনালিসার সেই বিখ্যাত ভঙ্গীটি দিয়ে—ঠোটে রহস্যময় হাসি। শত শত বছর ধরে লেখকদেরকে যে রহস্যটি তাড়িয়ে বেড়িয়েছে সেটা এভাবে প্রকাশিত হয় : লিসা আসলে রেনেসাঁ যুগের নগ্ন নৃত্য করছিলো।^{৩৫}

তথাকথিত আভাগার্দ অবচেতনভাবে একই পথে গিয়েছিলো। যখন কার্টুনিস্টরা 'সত্যিকার' শিল্পী হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করতে পারতেন না, তখন তাঁরা উচ্চমানের শিল্পকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতেন। অবশ্য সেগুলোকে ধ্বংস করার কোনো অভিপ্রায় তাঁদের ছিলো না—আভাগার্দ'দের (দাদাইস্ট, ফিউচারিস্ট আর পরাবাস্তববাদীরা) বিশাল একটা লক্ষ্য ছিলো। তারা ভান করতো, তারা উচ্চমানের সংস্কৃতির বিষয়-বস্তু নিয়ে মজা করছে, বাস্তবে তারা অনেক বেশি সিরিয়াস ছিলো। তাদের এক নম্বর শত্রু ছিলো অতীতের শ্রদ্ধাপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিষয়-বস্তুসমূহ। মারিনেন্তি'র দ্য ফিউচারিস্ট মেনিফেস্টো (১৯৯০)-তে ঘোষণা দেয়া হয় যে, উইন্সড ভিক্টোরি থেকে সামোথারাস বেশি সুন্দর : 'আমরা যদি অসম্ভবের দরজাটা ভাঙতে চাই, তবে কেন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবো?...আমরা যুদ্ধকে মহিমান্বিত করতে চাই—সামরিকবাদকেও, সেই

সাথে দেশপ্রেম আর নারী-বিরোধী ভূমিকাকেও।' মেনিফেস্টোর আর্টিকেল দশ-এ ঘোষণা করা হয়েছে : 'আমরা জাদুঘর, লাইব্রেরি এবং সবধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করতে চাই আর লড়াই করতে চাই নীতিবাদ এবং নারীবাদের বিরুদ্ধে...' ^{১৬} জাদুঘর হলো এককভাবে সবচাইতে বেশি ক্ষতিকর : সেগুলো গোরস্থান ছাড়া আর কিছুই না, বছরে মাত্র একবারই সেখানে যাওয়া উচিত : 'বছরে একবার আমরা গিওকোন্দার কাছে ফুল নিয়ে যেতে পারি, আমি আপনাদেরকে সেটা করতে আনুমতি দিলাম...'

মারিনেন্তির লক্ষ্য ছিলো বুর্জোয়া নিয়ম-কানুনকে চ্যালেঞ্জ জানানো—ফরাসিরা যাকে বলে এপাতে লো বুর্জোয়া, মোটাদাগে অনুবাদ ক'রে করা হয়েছিলো 'বুর্জোয়াদের ত্যাগ করো' ব'লে। এতে কাজ হয়েছিলো। ফিউচারিজম হয়ে উঠলো 'রাতারাতি সফল এবং আন্তর্জাতিক একটি কেলেকারী'। ^{১৭} কতিপয় প্রতিষ্ঠিত সমালোচক মেনে নিয়েছিলেন যে, এই নিন্দার ব্যাপারটা, ফ্লোভের ঘটনাটা প্রত্যাশিতই ছিলো। ^{১৮} মারিনেন্তি শেষ বয়সে মুসোলিনির ইতালির রয়াল একাডেমিতে সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এর ফলে তাঁর কর্মজীবন বলতে গেলে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

দাদাইজম আর পরাবাস্তববাদীর মতো ফিউচারিজমও উচ্চমার্গের সংস্কৃতিকে পরিহাস আর অশ্রদ্ধা করার প্রচলন করে। মারিনেন্তির বন্ধু এবং সহকর্মী আরদেঙ্গা সোফিচ্চি ১৯১৫ সালে 'গিওকোন্দা' নামক একটি পোস্টার দেখে (৪৬ নম্বর ছবিটি দেখুন) ডায়রিতে লেখেন : 'আমি নীল প্রেক্ষাপটে সাদা সাদা অক্ষরে একটি দেয়াল লিখন দেখেছি : গিওকোন্দা : মোনালিসার ত্রিয়মাণ চেহারা। অবশেষে! ইতালিতে আমরা ভালো চিত্রকর্ম সমালোচনা করতে শুরু করতে পারলাম।' ^{১৯}

আভাংগার্ড রাজনীতির দুটো ধরার দিক থেকেই লোকজনকে টানতে সক্ষম হয়েছিলো। মারিনেন্তি হয়ে ওঠেন ফ্যাসিবাদের প্রথম দিককার সমর্থক; বাকিরা কমিউনিস্ট এবং নৈরাশ্যবাদী হয়ে ওঠে। তারা সবাই প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্যারোডির ব্যবহার করেছে। ^{২০} দাদাইস্টরা কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত আইকনকে বেছে নিয়েছিলো, '...মোনালিসা, রেমব্রান্টের একটি চিত্রকর্ম, ভেনাস দ্য মিলো ইত্যাদি...এসব ছবিকে তারা মানুষকে হিসেবে তাদের আকার, মুখায়ব বিকৃতি সাধন ক'রে এদের সামাজিক এবং নান্দনিক প্রভাবকে খর্ব করতে চেয়েছিলো।' ^{২১}

আইকোনোক্লাস্টিক আচরণের জন্য চাই নির্দিষ্ট সংজ্ঞা। যে আইকনকে ধ্বংস করতে হবে সেটাকে হতে হবে ব্যাপকভাবে শ্রদ্ধেয় এবং প্রশংসিত।

সৌন্দর্য এবং এর মূল্যবোধকে ব্যঙ্গ করাটা হয়ে ওঠে এদের কাজ যা অতীতের ফিউমিস্তেদের পদাংক অনুসরণ করে করা হয়েছিলো।^{৪২}

সংগীত, কবিতা ও শিল্পের অন্যান্য শাখা-প্রশাখায় মোনালিসা উপমা হিসেবে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া চিত্রকর্মেও মোনালিসাকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯১৪ সালে ব্রাসেলসের এক চিত্র প্রদর্শনীতে বিবি কোল নামের একজন অখ্যাত শিল্পী মোনালিসাকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেন। ওই শিল্পী মোনার মুখে একটা সিগারেট এবং তার দু'হাতে ফলমূল ধরিয়ে দেন। ছবির শিরোনামও ছিলো হাস্যকর, *Jo feconde* ; এর পর অন্য শিল্পীরাও এ জাতীয় রসিকতায় অংশগ্রহণ করেন।^{৪৩} ১৯১৫ সালে জাঁ মেতজিসার *Contrasts* শিরোনামে প্রাস্টিকে মোনালিসার একটি ভাস্কর্য তৈরি করেন। ১৯১৩ সালে ফরাসি পত্রিকা *Almanach Vermot* প্রকাশ করে কিউবিস্ট ধারার একটি মোনালিসা। কাসিমির মেলভিখের কম্পোজিশন *উইথ মোনালিসা* (১৯১৪, ৩৭নম্বর ছবিটি দেখুন) আরেকটি উল্লেখযোগ্য কোলাজ।^{৪৪}

১৯১৯ সালে দুশাম মোনাকে আরো বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেন। তাঁর আঁকা মোনালিসার মুখ দেখতে অনেকটা ইঁদুরের মুখের মতো এবং মুখে ছাগলের মতো দাড়িও ছিলো (৩৬ নং ছবি দেখুন)। তিনি মনে করেন কোনো চিত্রকর্মকে তার নিজস্ব কনটেক্সট বা প্রেক্ষাপট আনুযায়ীই সংজ্ঞায়িত হতে হবে। এরকম একটি ধারণা তিনি প্রতিষ্ঠিতও করেছিলেন।^{৪৫}

মোনালিসার মুখে একটি গোঁফ এঁটে দিয়ে দুশাম উস্কানি দিতে চেয়েছিলেন।^{৪৬} যদিও দুশামের এই কর্মকাণ্ড খুবই মজার এবং আমোদপূর্ণ ছিলো কিন্তু সেই সময়ে এটা বেশ আতংকেরও সৃষ্টি করেছিলো, বিশেষ করে দুশাম যেহেতু *L.H.O.O.Q* ব'লে সেটাকে অপবিত্র করেছিলেন। এই অক্ষরগুলো যদি ফরাসিতে উচ্চারণ করা হয় তবে যা দাঁড়ায় তা হলো, *এলে এ শদ অ্য ক্যাল* ('তার পাছা গরম')। আর যদি সেটা *H* অক্ষরটা বাদ দিয়ে ইংরেজিতে পড়া হয় তবে *Look* উচ্চারিত হয়।

আজকাল আর গলিত পচা জীবজন্তু মানুষকে আতংকিত করে না; যারা শব্দ পেতে চায় তারা গ্যালারি আর শিল্পীদের কাছে যায়। কিন্তু দুশামের সময় এ রকম উত্তেজক কথাবার্তা প্রচলিত নিয়মকানুনকে অবজ্ঞা করতো। ত্রিশ বছর পরও *L.H.O.O.Q* এখনও উদ্ভিগ্নতার সৃষ্টি করে, নিদেনপক্ষে কিছু কিছু জায়গায়। টিএইচ রবসন গিবিনের মোনালিসার গোঁফ নামে একটি বই প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। এতে এই ব'লে বিতর্ক করা হয় যে, পরাবাস্তববাদীরা 'পুরো

বিশ্বজগতকে পশ্চিমা যুক্তির দ্বারা ধ্বংস করার প্রস্তাবনা করেছে, যাতে এমন দাবি করা হয় যে, পশ্চিমা যুক্তিতে বাস্তবতাকে যেভাবে বোঝানো হয় আসলে বাস্তবতা সেরকম কিছু নয়।' মোনালিসাকে 'গোঁফ দিয়ে' হেয় করার মধ্য দিয়ে পরাবাস্তববাদীরা আশা করে যে, 'বুর্জোয়ারা বুঝতে শুরু করবে বাস্তবতা আর হেলুসিনেশনের মধ্যে পার্থক্য কী।'^{৪৭}

ওই ছবি উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে দুশাম সমালোচনার ঝড়ের সম্মুখীন হন। এই সমালোচনাই পরবর্তীতে তাঁকে বিখ্যাত করে তোলে। দুশাম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, শিল্পকে বহু রৈখিক মাত্রা দিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করার অধিকার শিল্পীর রয়েছে। তার ওই ছবি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লুই বুনুয়েল বলেছেন, সুররিয়ালিজমের অবস্থান বুর্জোয়াদের ভাবনা-চিন্তার অবস্থান থেকে বহু দূরে। দুশামের ছবি দেখে মনে হয় বুর্জোয়ারাই বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

মোটাদাগের আরোপিত গোঁফটা আসলে স্কুলের বাচ্চা ছেলেদের দুষ্টমির মতো ছিলো। গতীয়ের যখন মোনালিসা'র সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'কোনো ডাচেসের সামনে যেমন স্কুলের ছেলেরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়ায় তেমনি তার সামনে দাঁড়িয়েও আমাদের একই অবস্থা হয়,' তখন তিনি আসলে একটি আইকন নির্মাণ করেছিলেন। আর দুশাম যখন স্কুলবালকের মতো আচরণ করলেন তখন তিনি সেই মূল্যবোধকেই প্রশ্নবিদ্ধ করলেন। তাঁর বন্ধু চিত্রশিল্পী ফ্রান্সিস পিকাবিয়া দাদাইস্ট ম্যাগাজিন 391-এ ১৯২০ সালে *L.H.O.O.Q* প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। পিকাবিয়া নিউইয়র্কে দুশামের কাছে একটি পোস্টকার্ড পাঠান যাতে মোনালিসা'র মুখে গোঁফ এঁকে দেয়া ছিলো আর ছবির নিচে ক্যাপশনে লেখা ছিলো, 'মার্সেল দুশাম কর্তৃক আঁকা একটি দাদা পেইন্টিং...', তবে তিনি দাঁড়ি আঁকতে ভুলে গিয়েছিলেন। মোনালিসাকে পুরুষ বানিয়ে তিনি ফ্রয়েডকে অনুসরণ করে লিওনার্দোর সমকামীতাকে সামনে তুলে আনেন।^{৪৮} এর পর দাঁড়িসমেত মোনালিসা আঁকেন তিনি, তাতে করে সত্যিকার অর্থে মোনাকে লিওনার্দো বানানো হয়।^{৪৯}

দুশামের আইডিয়াটা ছিলো সহজ-সরল আর কার্যকরী। *L.H.O.O.Q* এখনও মোনালিসার ব্যঙ্গ হিসেবে সবচাইতে বেশি পরিচিত। এটা দুশামের উল্লেখযোগ্য কাজ না হলেও এটাই তাঁকে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছিলো। ১৯২০'র দশকে যেসব জীবিত শিল্পী নিউইয়র্কে ছিলেন তাদের মধ্যে দুশাম ছিলেন সবচাইতে বেশি খ্যাতিমান। তিনি হয়ে উঠলেন মোনালিসার মুখে 'গোঁফ এঁটে দেয়ার লোক'। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হলো

এতে ক'রে জোকোন্দে আরো বেশি বিখ্যাত হয়ে উঠলো। যেমনটি কেনেথ ক্লার্ক বলেছেন, 'হেলেন ফোরমেন্টের নাকের নিচে গোঁফ এঁটে দিলে কেউই আপত্তি জানাবে না।'^{৫০} মোনালিসা এভাবে রহস্যময় আর প্রহেলিকাময় নারী চরিত্র থেকে পুরো পশ্চিমা চিত্রজগতের প্রতিনিধিত্বশীল বিষয় হয়ে উঠলো। ১৯৮৫ সালে ফরাসি প্রেসিডেন্ট মিতেরঁর জীড়াবিষয়ক উপদেষ্টা তাঁর এক বইয়ের নাম দেন লা জোকোন্দে এত্ প্রাতিনি। প্রখ্যাত ফরাসি ফুটবলার মিশেল প্রাতিনি *Corpus Sanum*, মানে সুস্থতার প্রতীক হয়ে উঠলেন; মোনালিসা হলো পুরুষের আরোগ্য, সুস্থ মানসিকতা।^{৫১}

মোনালিসা এমন একটি পেইন্টিং হয়ে উঠেছে যে, এমনকি গণমুখ লোকেরাও তাকে চেনে। লিওনার্দো কি স্বর্গে বসে তৃপ্তির হাসি হাসছেন? মাইকেলএ্যাঞ্জেলো, রাফায়েল, তিজিয়ান কি এখন ঈর্ষার আগুনে পুড়ছেন?

১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত এক চিত্র প্রদর্শনীতে দুশামের আঁকা নতুন মোনালিসার ছবি প্রদর্শিত হয়। আগের তুলনায় এ ছবি ছিলো যথেষ্ট মার্জিত। পরবর্তীতে তার এই ছবি তাসের পেছনের প্রচ্ছদ হিসেবে একটি কার্ড কোম্পানি ব্যবহার করা শুরু করে। দুশাম লিওনার্দোর মোনালিসাকে গোঁফ ছাড়াও এঁকেছিলেন, সেটার নাম দিয়েছিলেন '*L.H.O.O.Q rasee*' (মানে শেভ করা *L.H.O.O.Q*)। এ রকম একটি পোস্টকার্ড নিউইয়র্কের মডার্ন আর্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত করা আছে; এ রকম আরেকটি কার্ড ১৯৯৬ সালে নিলামে তুললে সেটা সর্বোচ্চ দাম হাঁকা হয় ১২০০০ ডলার।

১৯৬৩ সালে দুশামের এই ছবির সমালোচনা ক'রে সালভাদোর দালি ছবিটিকে *Ultra intellectual aggression* বলে অভিহিত করেন এবং মোনার মুখে দাড়ি সংযুক্তির ব্যাপারেও দালি ঘোর আপত্তি করেন। তিনি অভিযোগ ক'রে লিখেছিলেন, এটি শাস্ত্রত নারী মূর্তির বিরুদ্ধাচারণ যা নারী জাতির জন্যে অপমানজনকও।^{৫২} কিন্তু সম্ভবত সালভাদোর দালি তখন ভুলে গিয়েছিলেন যে, ১৯৫৩ সালে তিনি ফিলিপ হাল্‌সম্যানকে বলেছিলেন, 'তোমাক দেখতে মোনালিসার মতো মনে হয়।' হাল্‌সম্যান একটি ফটো মন্তাজে মোনালিসার নাকের নিচে সালভাদোর দালির বিখ্যাত গোঁফসহকারে এঁকে দেখিয়েছিলেন। প্রথমে দালি আপত্তি জানান। কিন্তু হাল্‌সম্যান জোর দিয়ে বলেছিলেন : 'এটা তোমারই গোঁফ, তোমার চোখ এবং তোমার নিজেরই হাত যা দিয়ে তুমি টাকা গোনো।' এরপর দালি সেটা গ্রহণ করেন (৪২ নং ছবিটি দেখুন)।

দুশাম ১৯২৫ সালে প্রকাশিত সাহিত্যে সর্বপ্রথম সমকামীতার প্রবর্তক আন্দ্রে জিদের *Les Faux Monnayeurs* উপন্যাসের আইডিয়া দিয়েছিলেন।^{৫৩}

জাদুঘরগুলো আঁভাগার্দ'দের প্রধান টার্গেট হয়ে উঠেছিলো। দুশাম তাঁর মৃত্যুর কিছু দিন আগে ১৯৬৮ সালে বলেছিলেন : 'আমি যখন কোনো জাদুঘরে যাই তখন কোনো পেইন্টিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে অবাক কৌতুহলে বিম্বিত হই না...আমি খুব কমই জাদুঘরে যাই। বিগত বিশ বছর ধরে আমি লুভরে যাই না। এটা আমাকে আর আগ্রহী করে না। যারা মনে করে কিছু ছবি লুভরে থাকা উচিত আর বাকিগুলোর থাকা উচিত নয় তাদের সাথে অবশ্য আমি তর্ক করতে পারি।'^{৭৪}

আধুনিক চিত্রকলা নিয়ে যে বাড়াবাড়ি রকমের মাতামাতি তাতে দুশাম বিরক্ত আর বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বছরে তিনি এসবে পুরোপুরি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেই সময়টাতে তিনি দাবা খেলাতেই বেশি মগ্ন ছিলেন। তিনি একজন জিনিয়াস হিসেবেই পরিগণিত হয়েছিলেন। যে লোকটি বিংশ শতাব্দীর চিত্রকলা বদলে দিয়েছিলেন তাঁর চিত্রকর্ম জাদুঘরে প্রদর্শিত হলে তিনি নাক সিটকাতেন। লিওনার্দোকে ধ্বংস করা তো দূরের কথা, তিনি বরং তাঁর মতোই একজন হয়ে উঠেছিলেন।

ফার্নান্দো লেগার লা জোকোন্দে অঁ ক্রেফ (১৯৩০ সালে, ৩৮ নম্বর ছবি দেখুন) নামে একটি ছবি আঁকেন। তিনি স্বীকার করেন, মোনালিসা কেবল উচ্চতম সংস্কৃতির একটি আইকনই নয় বরং সেটা এখন গৃহস্থালী নামও হয়ে উঠেছে। একগোছা চাবির মতোই সেটা পরিচিত একটি বস্তু। তিনি নিজে একগোছা চাবির পাশে মোনালিসাকে আঁকেন, যা একেবারেই বিপরীতধর্মী বস্তু :

আমি বাইরে গিয়ে দোকানের জানালা দিয়ে কী দেখলাম?
জোকোন্দের একটি পোস্টকার্ড! সঙ্গে সঙ্গেই সেটা আমি
বুঝতে পারলাম। এটাই আমার দরকার। চাবি ছাড়া আর
কী জিনিস তার সাথে বেমানান হতে পারে...জোকোন্দে,
আমার কাছে অন্য অনেক কিছুর মতোই একটি বস্তু।'^{৭৫}

লেগার বিশ্বাস করতেন মোনালিসাকে একটা বস্তুতে নামিয়ে এনে তিনি আসলে 'জনপ্রিয়তার বেড়াজাল' থেকে তাকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছেন যাতে ক'রে দর্শক স্বাধীনভাবে এবং মুক্ত হয়ে সেটা দেখতে পারে, নিজেদেরকে শিক্ষিত করতে পারে এবং আধুনিক চিত্রকলাকে উপভোগ করতে সক্ষম হয়।'^{৭৬}

দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সহমর্মী হবার পর লেগার ১৯৪৫ সালে পার্টিতে যোগদান করেন। এর পর থেকে তিনি বেশ সচেতন হয়ে উঠলেন যে, 'জনগণ' নামক ধারণাটির ব্যাপারে খুব বেশি রোমান্টিক হয়ে আছেন। ১৯৫০ সালে তিনি অভিযোগ করেন, জাদুঘরগুলো খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায় : 'দেহিতে বন্ধ করা প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু সবাই একটা ছবিকে দেখতেই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে : জোকোন্দে, সে হলো চলচ্চিত্র 'তারকা'দের মতো।' ^{৫৭}

লেগার তাঁর শিল্পী জীবন শুরু করেছিলেন রেনেসাঁ যুগকে অবজ্ঞা করার মধ্য দিয়ে। এটার অপ্রায়োগিক দিক আর বাস্তবকে পুনর্নির্মাণ করার ব্যাপারটি তাঁর কাছে মনে হয়েছিলো শিল্পের জন্য ক্ষতিকর, আর এটা মধ্যযুগের মহান শিল্পকলাকেও ধ্বংস করেছে। ^{৫৮} ১৯৫২ সালে—তাঁর মৃত্যুর তিন বছর আগে—তিনি তাঁর লড়াইটা পরিত্যাগ করেন। তিনি অবশেষে দৃশ্য আঁকতে রাজি হন এবং লিওনার্দো দা ভিঞ্চির পাঁচশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এমবোয়ে'তে অনুষ্ঠিত ব্যালে নাচের জন্য পোশাক ডিজাইন করে দেন।

মোনালিসা'র বিশ্বব্যাপী বাজারের জন্য আভাঁগার্দে'দের অবদান বিবেচনার দাবি রাখে। বিজ্ঞাপন শিল্পে যখন এসব কৌশল প্রয়োগ করা হলো তখনই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো সম্ভব হলো। যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক শিল্পকলার কদর দিন দিন বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে। দুশামের পাশাপাশি মোনালিসাও ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করে। ছবিটি হয়ে ওঠে সমগ্র ইতালিয় রেনেসাঁর প্রতিনিধিত্বকারী একটি ছবি, সেই সঙ্গে অবশ্যই প্রথাগত শিল্পকলারও প্রতিনিধি। লিসা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা রাখলো। বিশ্বায়ন কেবল আসি আসি করছে তখন।

১৯২৮ সালে তুর্কি কবি নাজিম হিকমত মস্কো থেকে স্বদেশে ফেরার পথে আটক হন। কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী হোপার জেলে তাকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। কারাজীবনে নাজিম লেখেন তার বিখ্যাত কবিতা *Joconde ile si-Ja-au* (গিওকোন্দা এবং সি ইয়া ওউ)। কবিতাটিতে গীতিময় ছন্দের মধ্যে একটি কাহিনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সি ইয়া ওউ এক চিনা যুবক যে মোনালিসার প্রেমে পড়ে যায়। কবিতাটির প্রথম চরণেই বলা হয়েছে, 'কোনো জাদুঘরে যাওয়া খুবই চমৎকার একটি ব্যাপার/ আর জাদুঘরের বস্তু হওয়া কতোই না নিদারুণ।' কবিতায় দেখা যায় লুভর মিউজিয়ামে থাকতে থাকতে মোনা গৃহকাতর হয়ে পড়ে। মোনা মুক্তি চায়। তার কানে বাজে সি ইয়া ওউ নামের সেই তরুণ যুবকের উদ্দাহ আহবান :

যারা তাদের ট্যাংক দিয়ে আমাদের শস্যক্ষেত্র মাড়িয়ে
দিয়েছে,
যারা এসেছে আমাদের শহরে নরকের সম্রাটের মতো
ধেয়ে,
তারা কি তোমার সৃষ্ট জীবের মধ্যে পড়ে?

মোনা লিওনার্দোকে অভিশাপ দিতে থাকে এজন্য যে, কেন তাকে সে
একটি স্থির হাসির মধ্যে বন্দি ক'রে রেখেছে। মোনা লুভর থেকে এক সময়
পালিয়ে সি ইয়া ওউ'র সঙ্গে দেখা করার জন্য চিনে চলে আসে। চিনে এসে
সে দেখতে পায় কুওমিংটান বাহিনী চিনের কমিউনিস্টদের ওপর গণহত্যা
চালিয়েছে এবং সারি সারি মৃতদেহের মধ্যে তার প্রেমিক সি ইয়া ওউ'র লাশ
পড়ে আছে।

• সাংহাইতে সেই মৃত্যুর দিনে
ফ্লোরেন্টাইন গিওকোন্দা তার হাসিটি হরিয়েছিলো যা ছিলো
ফ্লোরেন্সের চেয়েও বেশি বিখ্যাত।

এ কবিতায় মোনালিসাকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে একটি
সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। মোনা সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়াদের
বিরোধীতা ক'রে গেরিলা যোদ্ধায় পরিণত হয়। এক পর্যায়ে সে ধরা পড়ে যায়।
ফ্রান্সের আদালতে তার বিচার হয়। একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মোনার পক্ষ হয়ে
আদালতে লড়তে আসেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এ দণ্ড
অপমানজনক বিবেচনা ক'রে মোনার সাথীরা তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে এবং
সে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু মৃত্যুর আগে তার মুখে থাকে সেই বিখ্যাত হাসিটি।^{১১}
এভাবেই কবিতাটির সমাপ্তি টানা হয়েছে। নাজিম হিকমত ছিলেন তুরস্কের
অন্যতম প্রধান কবি। ১৯২৪ সালে লেনিনের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে তিনি গার্ড অব
অনার দলে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ২২ বছর তিনি জেলে
ছিলেন। কবিতা লেখার আগে তিনি মোনাকে চাক্ষুষও করেন নি। ১৯৫৮ সালে
প্যারিসে প্রথমবারের মতো সফর ক'রে তিনি মোনালিসাকে দেখেন। ১৯৬৩
সালে মস্কোতে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রখ্যাত চায়নিজ লেখক বা-জিন ১৯৩৭ সালে তাঁর 'মোনালিসা' নামক
ছোটো গল্পের গ্রন্থে মোনালিসাকে দেশপ্রেমি হিসেবে দেখিয়েছেন। সাংহাইর
এক রেষ্টোরায়ে এক ফরাসি মহিলা তার বাচ্চা ছেলের সাথে খেতে যায়। তার

চেহারা 'লুব্ধ' লিওনার্দোর মোনালিসার মতো...তার চোটেও হাসি, তারপরও তাতে রয়েছে একাকীভূত। জাপানিরা তার বৈমানিক স্বামীর প্লেনটা গুলি করে ভূপাতিত করেছে। এখন মোনালিসা তীব্রভাবে অনুভব করেছে : 'আমি চাইবো আমার স্বামীর রক্তের বিনিময়ে যেনো তার দেশের জনগণের সুখ সমৃদ্ধ বয়ে আনে, সমস্ত চিনা নাগরিক ক্রোধে ফুঁসছে, সময় এসেছে রক্তের ঋণ শোধ করার।'^{৯০}

১৯১৪ সালে ম্যাক্স ফন শিলিং মোনালিসা অপেরা কম্পোজ করেন যা ১৯১৫ সালে বার্লিনে প্রথম মঞ্চস্থ করা হয়। তাতে দেখানো হয় লিসা গেরার্দিনি—একজন ক্লাসিক *femme fatale*—তার এক প্রেমিক আছে, গিওভান্নি। গোপন অভিসারের সময় তার স্বামী অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়লে গিওভান্নি লুকিয়ে পড়ে। ঘটনাচক্রে গিওভান্নির মৃত্যু হলে লিসা তার স্বামীকে হত্যা করে।^{৯১}

'মোনালিসা' নামটি প্রায়শই দর্শককে প্রলুব্ধ করতে ব্যবহার করা হয়েছে। রেমন্ড সুপ্রেভের একক অভিনয়ের নাটক *Autour de la joconde* ১৯৩৩ সালের ৫ই অক্টোবর প্যারিসে মঞ্চস্থ হয়। এটার বিষয়-বস্তু এক বুর্জোয়া দম্পতির, যারা বাক-বিতণ্ডায় মেতে আছে। দর্শকরা যখন গুনতে পায় স্ত্রী চরিত্রটি মনে করে মোনালিসা এঁকেছেন রেমব্রান্ট আর মিলো বানিয়েছেন ভেনাস ভাস্কর্যটি, তখন হাসিতে ফেঁটে পড়ে সবাই।^{৯২}

অলডাস হাক্সলির 'দ্য গিওকোন্দা স্মাইল' (১৯২০)-এ গিওকোন্দা হলো মিস জ্যানেট স্পেন্স, 'ছত্রিশ বছর বয়স্ক এক কুমারী' যে অলস হেনরি হাটলের প্রতি বিমুগ্ধ। হেনরি তার হাসিকে 'গিওকোন্দার হাসি' হিসেবে উল্লেখ করে। জ্যানেট এই প্রশংসাটা খুব গুরুত্ব সহকারে নেয় এবং 'লিওনার্দোর স্ট্যান্ডার্ড-এ জীবনযাপন করতে থাকে। জ্যানেট হেনরির অসুস্থ স্ত্রীকে আর্সেনিক প্রয়োগ করে হত্যা করে এই আশায় যে, হেনরি তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলেও জ্যানেটের আশা দূরশায় পরিণত হয়। হেনরি আসলে আগে থেকেই সুন্দরী আর তরুণী আরেকজনের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলো। স্ত্রী মারা গেলে সে তাকেই বিয়ে করে। জ্যানেটের কথা তার মনেও থাকে না। পুরুষের হৃদয় কতোটা নির্মম সেটা বোঝার পর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে সে হেনরিকে তার স্ত্রী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তদন্ত হলে দেখা যায় তার স্ত্রীর শরীরে আর্সেনিক রয়েছে। তাই তাকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এবার জ্যানেট আবার হাসতে পারলো—গিওকোন্দার মতোই। এটা হাক্সলির সেরা কাজ নয়, কিন্তু এটাকে মঞ্চায়ন করা হয় (১৯৫০ সালে, নিউইয়র্কে প্রথম বারের মতো), আর ১৯৬৬ সালে এটা জার্মানীতে চলচ্চিত্রায়িত করা হয়।^{৯৩}

কিন্তু জর্জ স্পিজমুলারের 'লে আমুর দ্য ফ্রাসোয়া'র ভাণ্ডে তেমন দর্শক প্রিয়তা জোটে নি।^{৬৪}

স্পিজমুলার তাঁর গল্পে রাজা ফ্রাসোয়া আর মোনালিসা'র মধ্যে কাল্পনিক যৌন সংস্রবের বর্ণনা দিয়েছেন। উপন্যাসে তাঁর প্রেমিকার মৃত্যু হয় রাজা ফ্রাসোয়ার কোলে। তখন তার ঠোঁটে দেখা যায় 'ঐশ্বরিক আর স্বর্গীয় এক হাসির'।^{৬৫} ফ্রাসোয়া বিষন্ন হলেও ভেঙে পড়েন না : ইতালিতে তিনি পোপের সাথে দেখা করেন, যিনি তাঁকে রহস্যময় এক নারীর ছবি দেখান। পোপ তাঁকে বলেন, এটা হলো প্রখ্যাত গিওকোন্দা (পুরো বইতে ভুল বানানে গিওচোন্দা লেখা হয়েছে), লিওনার্দোর আঁকা। যে কিনা লিওনার্দোর রক্ষিতাও বটে। ফ্রাসো এসে সে রাজার সাথে মিলিত হয় তার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে। ফ্রাসোয়া এই 'চমকপ্রদ চোখ আর মিষ্টি হাসি'র নারীর সাথে দেখা করতে উদগ্রীব ছিলেন।^{৬৬} লিসা খুব সহজেই আকর্ষণীয় রাজার প্রেমে পড়ে যায়। লিসার স্বামী বুঝতে পারে তার স্ত্রীর ছবির দিকে যে-ই তাকায় সে-ই প্রেমে পড়ে যায়। সে ছবিটা ধ্বংস করতে চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জুল মিশেলে লিখেছিলেন, 'এই ছবিটা আমাকে আকর্ষণ করে, বিদ্রোহ করে।' ^{৬৭} ওর্তেগা গ্যাসেট ১৯৩০'র দিকে মন্তব্য করেন যে, জোকেন্দে হলো নারীর চূড়ান্ত অবস্থায় প্রতীক, সে হলো মা, কন্যা, স্ত্রী, বোন। সে হলো ডন হুয়ানের নারী-সংস্করণ।^{৬৮}

এটা এখন সর্বজনবিদিত যে, মোনালিসা কেবল সাধারণ কোনো মাস্টারপিস নয়। এর অবস্থান এখন বহুমাত্রিক, শিল্পসাহিত্যের একটি অনন্য উপাদান। এটা সমস্ত পশ্চাত্য শিল্পকলার প্রতিনিধিত্ব করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে লুভরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্মের সঙ্গে মোনালিসাকেও অন্যত্র সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমের একটি কক্ষে রাখা হয়েছিলো। সেই খবরের শিরোনাম করেছিলো এক পত্রিকা : 'মোনালিসার জন্য সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে'।^{৬৯}

তারপরও মোনালিসার জন্য সেরা জিনিসটা (হয়তো বাজে জিনিসটাও) এখনও আসে নি। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির দিকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে। লোকজন অর্থশালী এবং শিক্ষিত হয়ে ওঠে। বেশ ভালোরকম জ্ঞাত হবার এবং ভ্রমণেরও সুযোগ ঘটে তাদের। ওয়াল্টার প্যাটার যখন লেখেন, মোনালিসা হলো 'আধুনিক আইডিয়ার প্রতীক,' তখন তিনি অবশ্য আধুনিক সমাজের সব কিছুকেই উল্লেখ করেন নি—ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ভ্রমণ, বিজ্ঞাপন, জনপ্রিয় সংস্কৃতি—তাঁর 'লেডি অব দি বুকস'কে বিশ্বের যে কোনো নারীর চেয়ে বেশি বিখ্যাত করতে অবদান রেখেছে।

নবম অধ্যায়

পপ সংস্কৃতিতে লিসা

লিসার প্রতি কেন্দ্রীভূত আক্রমণ ছিলো অন্য অনেক শিল্পী ও চিত্রবিশারদদের মনযোগ আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অন্যতম কারণ।^১ ঠিক একই কারণে তার প্রতি অনেকেরই ধ্বংসোন্মাদনা বেড়ে যায়।

১৯৫৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর বলিভিয়ার অধিবাসী হুগো উনজাগা ভিলেগাস নামক চল্লিশ বছর বয়সী এক লোক মোনালিসার উপর পাথর ছুড়ে মারে যাতে মোনা'র কনুইয়ের কাছে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পরের দিনই *Anglian daily times* থেকে শুরু করে বারমুদার *Royal Gazette* এবং পোল্যান্ডের *Zycie warszaway* দৈনিকগুলোসহ সারা বিশ্বের দৈনিকগুলোতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে। লুডেরের ডকুমেন্টেশন সেন্টারে এই খবরের ৩ বাস্তব পেপার কাটিং সংরক্ষিত রয়েছে।^২ ১৯৫৭ সালের ১৪ জানুয়ারি ডাওয়ারিউ নামের একজন মনোবিজ্ঞানি একটি সাইকিয়াট্রিক রিপোর্টের মাধ্যমে ঘোষণা দেন যে, ভিলেগাস নামের ওই লোকটি ছিলো উন্মাদ ও পাগল শ্রেণীর। মোনালিসাকে আঘাত করার আগে সে অদ্ভুত কিছু আওয়াজ শুনেছে বলে ডাক্তার দাবি করেন। তার মতে ভিলেগাস আসলে আর্জেন্টিনার একনায়ক হুয়ান পেরোনকে খুন করতে চেয়েছিলো। লুডের পরিদর্শনের সময় তার মাথায় খুন চেপে যাওয়ায় সে ক্রোধে অন্ধ হয়ে মোনাকে আঘাত করে বসে। যদিও বিষয়টি ছিলো একটি খবরসর্বস্ব ব্যাপার। কিন্তু পত্রিকাগুলো এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরো বহু বিষয় নিয়ে খবর ছাপিয়ে রীতিমতো হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলো।

যদিও ঘটনাটার সংবাদমূল্য ছিলো তারপরও সেটা এক বা দু'প্যারাগ্রাফের বেশি ঠাই পায় নেই।

১৯৬৩ সালে সালভাদার দালি এ বিষয়টির একটি ফ্রেয়েডিয় ব্যাখ্যা দাঁড় করান। তিনি লিখেছেন, কল্পনা করুন ওই বলিভিয় লোকটি লুভর পরিদর্শনে এসেছে। মিউজিয়ামে ঢুকে নগ্ন চিত্রকলা ও ভাস্কর্য দেখে মিউজিয়ামটিকে তার মনে হলো মূর্তিমান বেশ্যালয়। সে দেখলো মিউজিয়ামের দেয়ালে তার মায়ের একটি নগ্ন পোর্ট্রেট টাঙানো। তার মনে হলো তার মা এখানে কেন? তাহলে সেও নিশ্চয়ই একজন বেশ্যা। তার মনে হলো সে (তার মা) তার দিকে তাকিয়ে দ্ব্যর্থক হাসি হাসছে। এ সময় তার দুটি করণীয় কাজ থাকবে। প্রথমত, সে দৌড়ে গিয়ে ছবিটি খুলে নিয়ে পালিয়ে যাবে এবং এমন জায়গায় তা লুকিয়ে রাখবে যা আর কেউ কোনোদিন দেখতে না পায়। দ্বিতীয়ত, সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওই ছবির উপর হামলা চালাবে।^৭ এখানে দালি একটি পয়েন্ট উল্লেখ করে বলেছিলেন, ঠিক একই ঘটনা অবশ্য রাফায়েলের আঁকা বালিন্দসারে কাস্তিগলিওনের ক্ষেত্রে ঘটার সম্ভাবনা কম। (এ ছবিটাও নগ্ন তবে মডেল হলেন একজন পুরুষ এবং তাকে দেখতে কারো না কারো পিতার মতো মনে হয়)। সাধারণত দেখা যায় যারা নগ্ন ছবির উপর হামলা চালায় তারা সব সময়ই নারীমূর্তির উপরেই আক্রমণ করে।

মোনালিসা চুরি যাওয়ার পর তাকে নিয়ে যে আলোচনার ঝড় উঠেছিলো এবং ক্রমে সে আলোচনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো উনজাগা ভিলেগাসের ছোড়া পাখর সেই আলোচনাকে আবার জাগিয়ে তুললো। মোনা'র চুরি যাবার ঘটনা এবং গতিয়ের, প্যাটার ও সালভাদার দালির ফ্রেয়েডিয় ব্যাখ্যার পর আবার সেই রহস্যময় প্রশ্ন পুনরুজ্জীবিত হয়, কেন তার হাসি রহস্যময়, বিভ্রান্তিকর ও হেঁয়ালিপূর্ণ? আসলে এ ছবির মডেল কে ছিলো? লুভরে সংরক্ষিত মোনালিসার ছবি আসলেই কি নির্ভরযোগ্য এবং আসল?

উপরোক্ত ব্যক্তিদের মন্তব্যের সঙ্গে বিরোধীতাপূর্ণ বক্তব্য দানের জন্য বিশেষজ্ঞের অভাব হলো না। মোনালিসা বিষয়ক গল্প প্রকাশ করা সংবাদপত্রের জন্য ছিলো খুব সহজ বিষয়। পাঠক এ নামটির সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত ছিলো। যারা মোনালিসার নাম শোনে নি তাদের সংবাদপত্রগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ছবির মধ্যে এটি অন্যতম এবং বিশ্বখ্যাত এক শিল্পী এর স্রষ্টা। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হলো এবং সে ছবির মডেল কে ছিলো তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মোটেও মাথা ব্যথা ছিলো না। মোনালিসাকে নিয়ে যখনই কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তখনই তা সাংস্কৃতিক অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। বাজারে মোনা'র বিক্রিও বেড়ে গেছে সেই সাথে।^৮

মার্সেল দুশামের আঁকা ইদুরমুখো মোনালিসা প্রকাশিত হবার পরিপ্রেক্ষিতে যে আলোচনা সমালোচনার ঝড় উঠেছিলো এবং তার প্রেক্ষিতে উনজাগা ভিলেগাসের পাথর নিক্ষেপ মোনার বিক্রিবাট্টা আরো বাড়িয়ে দিলো। বিংশ শতকে এসে লিওনার্দোর ছবির সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে প্রচারিত হবার পর লিওনার্দো আরো বেশি খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। এমন কি লিওনার্দো কী আবিষ্কার করেছেন অথবা কী আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলেন তা না জানলেও সাধারণ মানুষ তাকে এক মহান বিজ্ঞানী-চিত্রকর হিসেবে দেখতে শুরু করে। ১৯১৯ সালে তার চারশততম মৃত্যুবার্ষিকী নিরব ও শব্দহীনভাবে পালিত হলেও ১৯৫২ সালে তার পাঁচশততম জন্মবার্ষিকী পালিত হয় বিশ্বের প্রায় সর্বত্র। তখন থেকেই লিওনার্দো তাঁর চির প্রতিদ্বন্দ্বী রাফায়েল ও মাইকেলএ্যাঞ্জেলোকে ছাড়িয়ে উঠে আসেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তার সহস্র প্রমাণ আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ '৯৮-এর স্ক্রিন সেভারে লিওনার্দোর ছবি ছিলো, রাফায়েল কিংবা মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর ছবি ছিলো না। ১৯৮৪ সালে কেভিন ইস্টম্যান এবং পিটার ল্যায়ারডিনের (দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রকলার ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ছিলেন) টিনেজ মিউট্যান্ট নিন্জা টার্টলস দলের প্রধান হিসেবে অনিবার্যভাবেই লিওনার্দোর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।^৭

মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর বিখ্যাত ডেভিডের মূর্তির সমান জনপ্রিয় কোনো ভাস্কর্য নির্মাণে রাফায়েল ব্যর্থ হয়েছেন। বিপুল সাড়া জাগানো কোনো সাহিত্য রাফায়েলের চিত্রকলার উপর রচিত হয় নি যেভাবে ১৯৬১ সালে মাইকেলএ্যাঞ্জেলোকে *The agony and the ecstasy* লিখেছেন আরভিং স্টোন। পরবর্তীতে এ বইটি (১৯৬৩ সালে) একটি সফল চলচ্চিত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

উনিশ শতকে লিওনার্দোর খ্যাতির পীঠে চ'ড়ে মোনা সারা বিশ্ব ভ্রমণ ক'রে এসেছে। আর বিংশ শতকের বিজ্ঞানী যুগে এসে মোনার খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৪ সালে *Anything goes* নামের এক জনপ্রিয় সংগীত শো'তে বিখ্যাত গীতিকার কোল পোর্টার মোনাকে নিয়ে একটি গান লেখেন। গানটির শিরোনাম ছিলো 'You are the top' এবং ওই গানটি জনপ্রিয় গানগুলোর যে চার্ট তাতে 'শীর্ষে অবস্থান' করে। গানটির প্রথম চরণ এরকম :

তুমি হলে পিসা'র টাওয়ার
তুমি নীল নদী
তুমি হলে মোনালিসার
ঠোঁটের কোণের হাসি।

বিখ্যাত শিল্পী ইলা ফিটাজেরাল্ড প্রথমে এ গানটি গেয়েছিলেন, পরবর্তীতে ফ্যাটস ওয়ালার, ডানিওয়ার উইক, বারবারা স্ট্রেইস্যান্ড, এমন আরো বহু শিল্পী ওই গানটিতে কণ্ঠ দেন। গানটির মূল আইডিয়া হলো 'মোনালিসা সবার শীর্ষে'। এমন কি দেখা গেলো দাবা খেলার ক্ষেত্রেও মোনা শীর্ষে। গ্র্যান্ড মাস্টার এডওয়ার্ড গাফেল্ড তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় বিজয়কে 'Gioconda Game' বলে অভিহিত করেছেন।^৬

এই 'You're the Top' এই গানটির জনপ্রিয়তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো লে লিভিনস্টোন এবং রে ইভান্সের 'Mona Lisa' গানটি। ১৯৫০ সালে বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'ক্যাপ্টেন কেরি ইউএসএ'তে গানটি টাইটেল সং হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শিল্পী ছিলেন ন্যাট কিং কোল। গানটির জন্যই ছবিটি একাডেমি পুরস্কার লাভ করে। একটা পুরনো ছবি নিয়ে গাওয়া এ গান ফুপ করতে পারে ভেবে ন্যাটের স্ত্রী এ গান গাইতে তাঁকে বারণ করেছিলেন, কারণ তাঁর মতে 'পুরনো এই ছবিটা নিয়ে কোনো গান বিকোবে না।' ন্যাট সে আপত্তি শোনে নি, ওই গানটি প্রচারিত হওয়ার পর এক ধাক্কায় তাঁর সমস্ত আর্থিক সমস্যা মিটে যায়। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে এ গানটি যুক্তরাষ্ট্রের টপ চার্টের শীর্ষে চলে আসে এবং ওই বছরের সর্বোচ্চ বিক্রিত এ্যালবামের রেকর্ড ভেঙে দেয়। ন্যাট কোলের চাইতে অনেক কম পরিচিত অন্য আরো ৫ জন অখ্যাত শিল্পীও পরবর্তীতে এই গানটি গেয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং বিশ্ববিখ্যাত ৩০০ শিল্পীর তালিকায় চলে আসে। তারা হলো ডন চেরি (৫৩ নং), চার্লিস স্পিভ্যাক (১৯৮ নং), হ্যারি জেমস (১৯৪ নং)।^৭ এছাড়া আরো যারা গানটি গেয়েছেন তাদের মধ্যে প্যাট বুন, বিং ক্রসবি, মার্লিন ডিয়েট্রিচ, এলভিস প্রিসলি, পল অ্যাক্কা, কনওয়ে টুইটি, ডনি ওসমন্ড, টম জোন্স, জুলিও ইগলেসিয়াস অন্যতম। এ গানের জ্যাজ ভার্সনে গেয়েছেন সনি রোলিন্স এবং জাপানি শিল্পী মাসাবুমি কিবুচি। ১৯৫০ সালে ফরাসিতেও গানটি গীত হয়।^৮ ১৯৬৫ সালে ন্যাট কিং কোলের অকাল মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রেডিও স্টেশনে বারবার বাজানো হয় :

মোনালিসা, মোনালিসা, পুরুষেরা তোমায়
দিয়েছে নাম।

তুমি হলে আত্মা, অনেকটা রহস্যময় হাসির সেই
তরুণীর মতো।

তুমি খুব একা, এটাই কি একমাত্র কারণ যার জন্যে
 তারা তোমাকে দুঃখে থাকে?
 এজন্যেই কি মোনালিসা তোমার হাসিতে এতোটা
 দৃঢ়তা রয়েছে?
 তুমি কি তোমার প্রেমিককে প্রলুব্ধ করতে হাসো,
 মোনালিসা?
 নাকি নিজের ভগ্ন হৃদয় লুকোবার জন্যে
 এমনটি করো?
 তোমার দরজার কাছে অনেক স্বপ্ন এসে আছড়ে
 পড়ে।
 তারা সেখানে পড়ে থাকে, মরে থাকে।
 তুমি কি রক্তমাংসের, তুমি কি সত্যিকারের
 মোনালিসা?
 নাকি কেবলই হিমশীতল চমৎকার একটি শিল্পকর্ম?

প্রায় শতাধিক বছর আগে থিওফাইল গতিয়ের তাঁর মোনালিসা নামক কবিতাটি রচনা করেছিলেন। সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সেই কবিতাটি পরবর্তীতে বিখ্যাত একটি গানের লিরিকে পরিণত হয়। শুধুমাত্র ১৯৫০ সালেই এ গানের এ্যালবামের ১০ লাখ কপি বিক্রি হয়। কোটি কোটি মানুষ এ গানের কথায় বিমুগ্ধ হয়ে যায়। বিখ্যাত এক মার্কিন নিখো শিল্পী প্রভাবশালী একটি মিউজিক কোম্পানি থেকে গানটি প্রকাশ করে এবং আগের চেয়ে মোনালিসাকে আরো বহুগুণে জনপ্রিয় করে তোলে। গতিয়ের যদি স্বচক্ষে তাঁর লিখিত গানের এমন জনপ্রিয়তা দেখে যেতে পারতেন! গতিয়ের এবং ন্যাট কিং কোল দু'জনেই মোনালিসার রূপে মুগ্ধ হয়ে আধুনিক অনুষ্ণের আশ্রয় নিয়ে তাকে আরো রহস্যময়ী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

১৯৮৬ সালে নেইল জর্ডানের বিখ্যাত চলচ্চিত্র মোনালিসায় এ গানটি সংযুক্ত করা হয়। ওই ছবি অবশ্য লিওনার্দোর মোনালিসাকে কেন্দ্র করে নির্মিত নয়, এমনকি ওই ছবিতে পরোক্ষভাবেও লিওনার্দোর মোনালিসার উল্লেখ করা হয় নি। এ ছবিতে বব হপকিন্স এক ধনী বেশ্যার দেহরক্ষী হিসেবে অভিনয় করেছেন। ওই ছবির একটি দৃশ্যে দেখা যায় বব হপকিন্স (ছবিতে হপকিন্সের নাম জর্জ) গাড়ি চালানোর সময় ন্যাট কিং কোলের গাওয়া মোনালিসা গানটি শুনতে শুনতে যাচ্ছেন।^{১০}

লিভিংস্টোন এবং ইভানের গানটিই মোনালিসা থিম ব্যবহার করা গানের মধ্যে সবচাইতে বেশি বিখ্যাত। আপনি যদি ফ্লোরেন্সের হোটেল মোনালিসা'য় ফোন করেন তাহলে প্রথমে আপনাকে হোল্ড করতে বলা হবে এবং তখন যে রেকর্ডকৃত গানটি আপনাকে শোনানো হবে সেটি ন্যাট কিং কোলের 'মোনালিসা, মোনালিসা' গানটি। জার্মান শিল্পী উইলি ফোর্স্ট গেয়েছেন *wauem lachst du, Mona Lisa?* যার অর্থ, 'মোনালিসা হাসছে কেন?' এই গানটি পরবর্তীতে জার্মান ছবি *Der Ruub der MonaLisa* (মোনার অপহরণ) তে ব্যবহার করা হয়। ১৯৭৫ সালে আলেকজান্দ্রিয়া বংশোদ্ভূত গৃক সংগীত শিল্পী দেমিস রুসোস এ গানটি অনুকরণে গেয়েছেন *Schon wie Mona Lisa*. ইতালির শিল্পী উমবের্তো তোজ্জি ১৯৭৭ সালে গেয়েছেন, যার অর্থ :

শূন্য লুতরে শুধু তুমি আর আমি।
তখনই ঘণ্টা বাজলে আমাকে ওরা নিয়ে গেলো।
লিসা, তুমি একটা পাগলামী।

১৯৫৭ সালে অঁরি গ্রুয়েল এবং সুইয়ো নির্মিত ফ্রান্সের একটি টেলিভিশন ডকুমেন্টারির টাইটেল সং হিসেবে শ্যাতু বারবারার *La Jocondo* গানটি ব্যবহার করা হয়। গানের কথাগুলো ছিলো :

আমি হলাম জোকোন্দে। আমার হাসি আসে পরপারে
থেকে। বার্নিশ ক্ষয়ে যাবার আগপর্যন্ত সেটা অক্ষয় থাকবে
পৃথিবীর অন্তিম সময় অবধি।
বোমার ওপরে ব'সেও আমি হাসবো।

বিশ্ববিখ্যাত গায়ক বব ডিলানেরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে মোনালিসা (১৯৬৬ সালে) :

জাদুঘরের ভেতর বিচার বিশ্লেষণ চলে হাজার কণ্ঠের
প্রতিধ্বনিতে। নিঃসন্দেহে কিছুক্ষণ পরে ভালোই লাগবে
এটাই হলো মুক্তি কিন্তু মোনালিসা'র রয়েছে আনন্দের এক

আদিগন্ত পথ

তুমি যেতে যেতে বলতে পারো, সে হাসছে।”

না আমরা ভুলতে পারি ১৯৭২ সালে প্রকাশিত এলটন জনের গাওয়া
'Mona Lisa and Mad Hatters' গানটি :

মোনালিসা আর ম্যাড হ্যাটার্স,
ব্যাংকার আর উকিলের ছেলেরা,
ঘাড় ঘুরিয়ে রাতকে বলে শুভ সকাল,
যতোক্ষণ না তারা আকাশকে দেখে।
কিন্তু তারা পারে না, আর এজন্যেই
তারা জানে না এখন দিন নাকি রাত।

ঠিক একইভাবে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত তাঁর *Ice on fire* অ্যালবামের
wrap her up গানটিতেও মোনালিসা সমান গুরুত্ব নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে :

অনেক মেয়ে আছে, অবৈধ এক্সরা
মোনালিসাদের সাথে বেশ ভালোই সংযোগ রয়েছে
তাদের
হতে পারে তারা নষ্টা, ইংলিশ গোলাপ
অভিজাত বংশের নাক উঁচুওয়ালা।

১৯৮৮ সালে এলটন জন 'Mona Lisa and Mad Hatters-2'
নামের আরেকটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন, সেখানে তিনি গান, 'স্পেনিশ
হার্লেম এখনও আমাকে টানে... হ্যা, মোনালিসা বুড়িয়ে যাচ্ছে'।

3D Mona Lisa নামে রবার্ট চার্লসের গানটি ফ্রান্স হাল্‌সের *The
laughing cavalier* শিরোনাম ব্যবহার করে করা হয়। গানটি এরকম :

তোমার ক্যানভাস বিবর্ন হয়ে যাচ্ছে,
তোমার চোখ হারিয়েছে ঔজ্জ্বল্যতা।
তোমার ফ্রেমে উই পৌঁকা বাসা বেঁধেছে,

তবুও তোমার হাসি সময়কে রেখেছে আঁটকে ।
 দেখো, দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে,
 ঘড়িতে নটা বাজে এখন...
 ওহ, মাদাম, তোমার তুলির কাজটি আমার বেশ
 পছন্দ,
 এর কাছে যাওয়াটা আনন্দেরই ।
 তুমি কি এই প্রশংসাটি গ্রহণ করবে মৃদু হেসে?

ক্রমাগতভাবেই নামটি পেইন্টিংটার কোনো উল্লেখ না করেই ব্যবহার করা হচ্ছিলো, কেবলমাত্র উল্লেখিত হচ্ছিলো হাসির কথাটা । আমরা লিসা গেরার্দিনি আর লিওনার্দোর ছবিটা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলাম, নামটি তার মূল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বকীয় সত্তা হিসেবে আবির্ভূত হয় ।

১৯৮৮ সালে শ্রিকরিক (রিক ওয়াল্টার্স) একটি র‍্যাপ গান করেন :

এরকমই এক দিনে ছিলো না করার কিছু,
 শহরের উপকণ্ঠে, সঙ্গে আমার এক বন্ধু ।
 এক দোকানে ঢুকে কিনে নিলাম পিৎসা,
 ধাক্কা লাগলো এক মেয়ের সঙ্গে
 নাম তার মোনালিসা ।

এভাবে লিসা শুধুমাত্র রঙ তুলিতে আঁকা এক ছবি নয় যেনো জীবন্ত মানবীতে পরিণত হয়েছে । ১৯৯৭ সালে সোয়ান ক্রোভিন নামের বৃটিশ পপ গায়ক প্রকাশ করেন তার 'ইউ এন্ড দ্য মোনালিসা' এ্যালবামটি । ১৯৮৩ সালে ইউরোভিশন সংগীত প্রতিযোগীতায় *Mona Lisa has her smile and you too hide a secret* গানটি গেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন সুইডিশ কণ্ঠশিল্পী ক্যারোলা ।

১৯৯৩ সালে লন্ডনে *Leonardo the Musical: A Portrait of love* প্রথম প্রকাশিত হয় । ২০০০ সালে প্যারিসে *Christeian Schittenhhelm*-এর রচনা, নির্দেশনা ও পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় *Da Vinci* নামের আরেকটি মিউজিক্যাল শো । ওই অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনী পোস্টারে শুধুমাত্র মোনালিসার হাতের ছবি প্রদর্শন করা হয় ।

১৯৯০'র দিকে 'মোনালিসা' হয়ে উঠলো অন্য একটি নাম । এভাবেই

১৯৯২ সালে জ্যাক হিগেলিন নামের এক ফরাসি রক গায়ক, ফ্রান্সের বাইরে যার খ্যাতি খুব একটা ছিলো না, ‘মোনালিসা ক্লাব্বন’ নামের একটি গান গায় : ‘আমি মোনালিসা ক্লাব্বন নামের এক মেয়েকে চিনি। সে ভূত আর কুমীর বেষ্টিত এক দ্বীপে থাকে, আবলুস কাঠের মতোই কৃষ্ণবর্ণের সে আর বাজায় ট্রমবোন।’ একই রকম প্রখ্যাত রক গিটারিস্ট কার্লোস সানটানার টপচাটে থাকা গান ‘স্মুথ’ (২০০০) গানে যে মোনালিসা’র কথা বলা হয়েছে তার সাথে লুভরের মোনালিসা’র কোনো সম্পর্ক নেই : ‘কিন্তু তুমি রও নির্বিকার/ আমার সুন্দর পুতুল, আমার স্পেনিশ হার্লেম/মোনালিসা/তুমিই আমার মুক্তি।’

পপ মিউজিক থেকে এখনও মোনালিসার উপস্থিতি হারিয়ে যায় নি। ২০০০ সালে মোফাটস্ ব্যান্ডের সদস্যরা একটি পপ গান পরিবেশন করে। গানের শুরুটা এমন : ‘সকালে উঠে দেখি মোনালিসা আমার পাশে, এই প্রহেলিকাময় হাসির পেছনের গল্পটি কি?’ গানটির মিউজিক ভিডিওতে দেখা যায় গানটির মূল গায়ক হ্যানসন বহু দূর থেকে দৌড়ে এসে মোনালিসা-আ-আ-আ...ব’লে চিৎকার করতে করতে লুভর মিউজিয়ামে ঢুকে পড়ছে।

সাহিত্যে মোনালিসার রহস্যময় হাসি বিভ্রান্তিকর ও প্রহেলিকাপূর্ণ কারো হাসির সঙ্গে উপমা হিসেবে তুলনা করা হয়। যেমন ১৯৩২ সালে প্রকাশিত ডি.এইচ লরেন্সের ছোটো গল্প *The lovely lady*-তে ৭২ বছর বয়স্কা এক সমকামীসুলভ মানসিকতার মহিলাকে দেখানো হয়েছে যার হাসিকে মোনালিসার হাসির মতো রহস্যময় এবং বিভ্রান্তিপূর্ণ ব’লে আখ্যায়িত করা হয়েছে।^{১২}

১৯৪৬ সালে প্রকাশিত স্টেলা গিবন্সের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস *West wood*-এ দৃশ্যত মোনালিসাকে মর্যাদাহানিকরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ উপন্যাসের নায়িকা মার্গারেট একজন স্কুল শিক্ষিকা। একদিন মার্গারেট তার বান্ধবী হিলডাকে তার শোবার ঘর দেখাতে নিয়ে আসে। মার্গারেটের ঘরে মোনালিসার ছবি টানানো দেখে হিলডা বিরক্তি নিয়ে বলে, ‘আমি বুঝতে পারি না রোজ ঘুম থেকে উঠে ওই গাল ফোলা মেয়েটির ছবি দেখে সারাদিন কাটাও কিভাবে? আমার ওকে দেখলে দিনটাই মাটি হয়ে যায়।’ মার্গারেট অবশ্য আত্মপক্ষ সমর্থন ক’রে বলে, ‘কেন, এটা তো সুন্দর!’^{১৩}

লরেন্স ডারেল ১৯৫৭ সালে *Justine* নামক গ্রন্থে বলেছেন, মোনালিসার হাসি একেকজনের উপর একেক ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি করে। ওই বইয়ে তিনি দেখিয়েছে স্কেবি নামক এক বৃদ্ধ তার মাথার কাছে মোনালিসার একটি

ছবি টানিয়ে রাখে। তার কাছে মোনালিসার হাসিকে তার মায়ের হাসির মতো মনে হয়। কিন্তু বইয়ের বর্ণনাকারীর কাছে মোনার হাসি দেখে মনে হয় যেনো সে এইমাত্র তার স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করে ত্রুড় হাসি হাসলো।^{১৪}

হাসিটি হয়ে উঠলো অভ্যন্তরীণ কিছু। যেনো গোপনে, লুকিয়ে হাসা হচ্ছে। ম্যারি ম্যাকার্থির বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য গ্রুপ' (১৯৬৩)-এ এক সমকামী নারী যে কিনা মোনালিসার মতো স্মিত হাসি হাসে।^{১৫}

এদিকে দার্শনিক জঁ পল সার্ত্রে মোনালিসাকে তাঁর নানীর পাঠমণ্ডল সময়ের প্রশান্ত অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সার্ত্রের ভাষায় :

সে জানালার পাশে বসতো তার উইঙ্গ চেয়ারে, চশমাটা
খুলে আনন্দ আর ক্লান্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো আনত চোখে
সূক্ষ্ম একটি হাসি ঠোঁটে মেখে। সেই থেকে আমি
মোনালিসার ঠোঁটের হাসিটি আবিষ্কার করেছি।^{১৬}

অতি সাম্প্রতিক কালের আগে প্রথাগত জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাসের ঝোঁক ছিলো মোনালিসা থিমকে রেনেসাঁ যুগের ঐতিহাসিক পেইন্টিংয়ের প্রেক্ষাপটে অথবা তার রহস্যময় হাসিকে পুঁজি করা। মোনালিসাকে অতি সাধারণ প্রেমকাহিনীর পুট হিসেবে ব্যবহার করা হয় ১৯৩৫ সালে লেখা সার্জ রাফোলোভিচের *লা জোকোন্দে* উপন্যাসে। এই রোমান্টিক উপন্যাসে মোনালিসা ফ্রান্সেসকো ইল গিওকোন্দাকে বিয়ে করার পর ফ্লোরেন্সের সবচাইতে আকর্ষণীয় নারী হয়ে ওঠে। সে পুরুষদের সীমাহীনভাবে প্রলুব্ধ করে। তার স্বামী নিশ্চিতভাবেই বিরক্তিকর।^{১৭} এক অনুষ্ঠানে সে লিওনার্দোকে দেখার পর তার স্বামীকে রাজি করাতে সক্ষম হয় তার একটি ছবি যেনো লিওনার্দো এঁকে দেন, যাতে করে সে তাকে নিয়মিত দেখতে পারে। লিওনার্দোও তাকে ভালোবেসে ফেলে, কিন্তু তারা কখনও এক বিছানায় ঘুমায় নি। উপন্যাসের লেখক বেশ সচেতন ছিলেন যে, লিসার ছবি বেশ সুপরিচিত, এবং সে মোটেও ধ্রুপদী সুন্দরী নয়। তাই উপন্যাসের বর্ণনাতেও সেটা বলা হয়, তবে এও বলা হয় যে, সে রহস্যময় এবং মনোহরনী। আমরা দেখেছি ঠিক একই রকম থিম কিভাবে অতীতেও ব্যবহার করা হয়েছে। একটি ছবির চরিত্র কী করে প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠেছে সেটা মোনালিসার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। লিওনার্দো যদিও শত শত বছর ধরে মানুষের মনে বেঁচে রয়েছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন মরণশীল বিজ্ঞানী ও শিল্পের স্রষ্টা যার আত্মা

সৃষ্টির ক্ষমতা ছিলো না। তিনি জীবন্ত মানুষ থেকে পটে আঁকা এক চিত্র সৃষ্টি করেছেন মাত্র। তিনি প্রকৃতিকে নকল করেছেন। তাঁর সৃষ্ট আবিষ্কার প্রাণহীন শিল্প মাত্র। লিসা (অবশ্যই কল্পনার লিসা) ঠিক তাঁর উন্টো কাজটাই করেছে। লিওনার্দো লিসাকে বস্তুতে রূপান্তরিত করেছেন আর লিসা লিওনার্দোকে, এমনকি নিজেকেও প্রাণবন্ত মানুষে পরিণত করেছে।

বিংশ শতকের মধ্যভাগে এসে আমরা দেখেছি সমসাময়িক শিল্পী, কার্টুনিস্ট, অন্যান্যরকমভাবে মোনালিসার বিকৃত ছবি এঁকেছেন এবং তাঁরা যেনো লিওনার্দোর উপর তাদের গায়ের ঝাল ঝাড়তেই ওই সব বিকৃত কার্টুন মার্কা ছবিগুলোর জন্ম দিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপর গল্প-উপন্যাসের শিরোনামে 'মোনালিসা' অথবা 'গিকোন্ডা' নামটি ঢুকিয়ে দেবার প্রবণতা বেড়ে যায়। গাই ফ্য'র *লো সুরি দ্য লা জোকোন্ডে* (১৯৬১)-তে নাথসিদের কাছ থেকে সোনার মজুদ লুকিয়ে রাখার গল্প বিধৃত হয়েছে। মার্সেইর আন্ডারওয়ার্ল্ডও এখানে নাথসিদের সহযোগী। এই শিরোনামটি লেখক বৈধতা দিয়েছেন উপন্যাসের এক মূল নারী চরিত্র সৃষ্টি করে, যে রহস্যময় আর ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসে।^{১৮}

এ পর্যন্ত যতোগুলো অপরাধ বিষয়ক উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে সান আতোয়া'র *Passez-Moi la joconde* (১৯৫৪ সালে প্রকাশিত) অন্যতম। ১৯৮৮ সালে এ বইটির প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ কপি বিক্রি হয়। এ উপন্যাসের কেবল শেষ দৃশ্যে লেখক মোনালিসার প্রসঙ্গ টেনেছেন। এ বইয়ের কাহিনীতে দেখা যায় সান অ্যাথোনি (লেখক উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রও বটে) যখন জানতে পারে, সমস্ত সন্তাসবাদীর মূলে রয়েছে এক মহিলা অপরাধী। তখন ওই মহিলাকে আটক করতে চেষ্টা করে কিন্তু রেনেসাঁ হিরোইনদের মতো ওই নারী চরিত্রটি তার হাতের আঙটিতে মাখানো বিষ চুষে আত্মহত্যা করে। তখন স্যান বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, 'পাপের বই তার খুব বেশি পড়া হয়ে গেছে, জোকোন্ডে!'^{১৯}

১৯৮৪ সালে প্রকাশিত ড্যানিয়েল গভিয়ারের *Gioconda* উপন্যাসের নায়িকা একজন আমেরিকান তরুণী। কাহিনীতে দেখা যায় ওই আমেরিকান তরুণী স্বীয় পরিচয় উদ্ঘাটনের জন্য মেক্সিকোয় পাড়ি জমায়। হাতে থাকে তাঁর দাদীর মৃত্যুশয্যায় তাকে দেওয়া মোনালিসার একটি পেপার কাটিং।^{২০}

যুদ্ধের মাঝখানেও এই নামটিকে বাণিজ্যিক ফায়দা লোটার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আলবেয়ার বইশি'র *লা জোকোন্ডে অ এঁশিয়ে* (১৯২৯)-তে মোনালিসা নামটি উপন্যাসের নামে ব্যবহার করার গ্রহণযোগ্যতা দেখিয়েছেন

এভাবে : এক সাইকিক নিথ্রো জ্যাজ শিল্পী এক ক্যাবারের নতর্কীকে বলে, কেউ একজন মোনালিসাকে চুরি করার কথা ভাবছে। ঘটনাচক্রে দেখা যায় এটা আসলে জীবিত এক নারী সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেই নারীটি হলো এক ইতালিয় যুবতী, আর অবশ্যম্ভাবীকেই যার ডাক নাম 'জোকোন্দে'।^{২১}

বিশেষ বিশেষ শিশুসাহিত্যের বইয়েও মোনালিসার উল্লেখ পাওয়া যায়। মোনার এই আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তাকে শিশু সাহিত্যিকেরাও কাজে লাগিয়েছেন। যদিও শিশুদের কাছে মোনালিসার আবেদন বড়দের তুলনায় অনেক কম কিন্তু বাচ্চাদের অভিভাবকেরাই যে বাচ্চাদের বইয়ের মূল ক্রেতা; মোনালিসার এই জনপ্রিয়তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় যেহেতু ওই অভিভাবকেরাও আক্রান্ত সেহেতু ওই বইগুলোও বেস্টসেলার তালিকার উঠে এসেছে। জোসালিন জাচাউচের লেখা কিশোর উপন্যাস *Il Escapade de Mona Lasa* (১৯৯৪ সালে প্রকাশিত) বইটিতে মোনালিসার ছবি ক্যানভাস থেকে উধাও করে দেয়ার মতো জাদু প্রদর্শনী কাহিনীর মূল গল্প। ওই বইয়ের গল্পে দেখা যায় মোনালিসা একেকবার তার পেছনের পাহাড়ের একে জায়গায় আত্মগোপন করছে এবং এক সময় সে সত্যি সত্যি ক্যানভাস থেকে মূর্তিমান মোনালিসা হয়ে উঠে আসে।^{২২}

১৯৯৭ সালে প্রকাশিত ক্যাথারিন তেরনোর '*Le secret de la joconde*' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ৯ বছরের একটি মেয়ে যে ছবি আঁকতে ভালোবাসে। মেয়েটির নাম আমানদিন ভুপে। একদিন রাতে আমানদিন চুপি চুপি লুভর মিউজিয়ামে চলে যায় মোনালিসার জনপ্রিয়তার গোপন রহস্য জানার জন্য। সেখানে গিয়ে সে দেখে মোনার চোখ বন্ধ মুখ খোলা এবং মোনা নাক ডাকছে। আমানদিন তাকে জাগিয়ে তোলে, দু'জনে মেতে ওঠে খোশগল্পে। এ উপন্যাসের মূল কাহিনী শুরু হয় মোনালিসাকে অপহরণের কাহিনী দিয়ে এবং শেষ হয় আমানদিন কর্তৃক তা উদ্ধার করার মধ্য দিয়ে। ওই ছবির কাহিনীতে দেখা যায় মোনা আমানদিনকে তার রূপের গোপন রহস্যের কথা বলে দেয়। মোনা বলে, লিওনার্দো এমন এক রাসায়নিক পাউডার আবিষ্কার করেছিলেন যে, তা রংয়ের সাথে মিশিয়ে ছবি আঁকলে ছবি আক্ষরিকভাবেই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মোনা তার পেছনের ভূ-দৃশ্যটি মোটেও পছন্দ করে নি, সে অন্য মেয়েদেরকে ঈর্ষা করে। লিওনার্দো বুঝতে পারলেন একজন শিল্পীর জীবন খুবই করুণ হয়, তাই তিনি আর কখনও ছবি আঁকেন নি।^{২৩}

The Mona Lisa Mistry নামে প্যাট হাচিসের একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। এই কাহিনীতে একদল স্কুলের ছেলেমেয়ে আইফেল টাওয়ার এবং মোনালিসা দেখতে গিয়ে ছবিটা চুরি হতে দেখে ফেলে। বাচ্চারাই গোয়েন্দাগিরি করে চোরকে পাকড়াও করে।^{২৪}

ঠিক এমনই একটি কাহিনী ১৯৯৮ সালে লিখিত জেমস মাইহি'র উপন্যাস *katie and the Mona Lisa* উপন্যাসে দেখা যায় শিশু চরিত্র কেটি'কে তার দাদি লুভর মিউজিয়ামে নিয়ে যায়। লুভরে গিয়ে সে মোনালিসার সামনে দাঁড়াতেই মোনা তার কাছে আসার জন্যে আহ্বান জানায়। অতিন্দ্রীয় এক প্রক্রিয়ায় কেটি মোনালিসার ব্যাকগ্রাউন্ডের পাহাড়ে হারিয়ে যায়। একইভাবে সে মিউজিয়ামের প্রায় সবগুলো সুন্দর ছবিগুলোর মানবমূর্তির সঙ্গে কল্পনায় ভ্রমণ ক'রে আসে। মোনালিসা তাকে 'বাম্বাবিনা' ব'লে ডাকে। কাহিনীর শেষ প্রান্তে এসে তার দাদি তাকে জিজ্ঞেস করে নৈশভোজে সে কি খেতে চায়, জবাবে কেটি উত্তর দেয়, 'পাস্তা এবং আইসক্রিম,' বলেই কেটি মোনালিসার মতো এক রহস্যময় হাসি হেসে ফেলে।^{২৬}

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর উপন্যাসগুলো কখনই সেকেলে হয় না। এরকমই একটি হলো অতিসাম্প্রতিককালের কোনিগবার্গের দ্য সেকেন্ড মিসেস গিওকোন্দা (১৯৭৫) উপন্যাসটি। এখানে প্রধান চরিত্র হলো লিওনার্দোর সহকারী সালাই। উপন্যাসে একটা সংলাপ আছে এরকম, 'এ্যাই লিওনার্দো।' উপন্যাসের কাহিনীর বেশিরভাগই আবর্তিত হয়েছে লোদোভিকো ইল মোরো'র প্রান্তরে, যেখানে লিওনার্দো ডিউকের স্ত্রীর ছবিটা এঁকেছিলেন। শেষের দিকে উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয় ফ্লোরেন্সে। এক সাহসী সওদাগর লিওনার্দোর বাড়িতে এসে সালাইকে বলে সে কি মনে করে লিওনার্দো তার দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি ছবি এঁকে দেবেন কিনা। সালাই তাকে ফিরিয়ে দিলে সে লিসার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে 'এই মহিলার দৃষ্টিতে শিকার করার মতো কিছু একটা ব্যাপার রয়েছে, যা কেবলমাত্র লিওনার্দোই ছবিতে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন।'^{২৭} তাদের মতে বাকিটা ইতিহাস।

১৯৭৬ সালে *The Private life of Mona Lisa* নামের একটি উপন্যাস লেখেন পিয়েরে লা মিউখ। পিয়েরে নিজেকে টলস্টয়ের সঙ্গে তুলনা করতেন। ওই উপন্যাসের প্রটগ ছিলো বাস্তবতাবিবর্জিত। এর কাহিনীতে দেখা যায় জিউলিয়ানো দে মেদিচি নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে মোনালিসার প্রণয় হয় কিন্তু পরবর্তীতে তার বিয়ে হয় মধ্যবয়স্ক ফ্রান্সেস্কো ইল গিওকোন্দো নামক এক লোকের সঙ্গে। প্রেমে ব্যর্থ জিউলিয়ানো প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তার প্রেমিকা লিসার একটি ছবি এঁকে দেবার অনুরোধ জানায়। কিন্তু লিওনার্দো তার আঁকা শেষ করার আগেই জিউলিয়ানো মারা যান। অগত্যা লিওনার্দো ফ্রান্স সফরের সময় এ ছবি নিজের সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই উপন্যাসের কাহিনী মোনালিসার ইতিহাসে বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করেছে।^{২৮}

কমিক-স্ট্রিপে মোনালিসাকে মোটেও বাদ দেয়া হয় নি। *Lil Abner*-এ তার উপস্থিতি ছিলো উল্লেখ করার মতো আর *Mand rake the Magisian* এও এটা ব্যবহৃত হয়েছে। এরকম জিনিস বিশেষ ক'রে ফ্রান্সে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো। ১৯৬৯ সালে BD (*bande-dessinee*, কমিক স্ট্রিপের ফরাসি প্রতিশব্দ)-তে এলেক্সিস এবং ফ্রেডের টাইম ইজ মানি নামক গল্পে এক ক্ষ্যাপাটে বৈজ্ঞানিক টাইম মেশিন আবিষ্কার ক'রে রেনেসাঁ যুগে গিয়ে দেখতে পায় এক নির্মম সত্য। লিওনার্দো মোটেই কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি নন—লিওনার্দো আসলে গড়পরতার এক লোক যে কিনা মোনালিসাকে কখনও আঁকার কথা ভাবেন নি, তার বদলে তিনি মোটা এক মহিলার ছবি আঁকতে চাইছেন যে হাসতেই জানে না। আর ছবি আঁকতে গিয়ে দেখা গেলো তিনি মোটেও আঁকতে পারছেন না।^{১৯}

প্রেমের উপন্যাসের ক্ষেত্রে মোনালিসা হাজার বার ব্যবহৃত হয়েছে। রোমান্টিক ফিকশনের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো *Harbquin books*, এটি কানাডার *Conglomerate* কোম্পানির অঙ্গ প্রতিষ্ঠান যেটি ব্রিটিশ প্রকাশনাগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করতো। ১৯৯৮ সালে ওই প্রতিষ্ঠান ২৪টি ভাষার মোট ১৬ কোটি বই বিক্রি করে।^{২০} তার মধ্যে একটি বিশাল অংকের বই ছিলো মোনালিসা'কে নিয়ে লেখা প্রেমের উপন্যাস। ওই প্রকাশনা মোনাকে নিয়ে একটি সিরিজ প্রকাশ করেছিলো যার নাম *Collection Turquoise*; এর কাহিনীতে দেখা যায় নায়িকা মাতৃহীনা, যুবতী ও সম্ভবত কুমারী। তার দরিদ্র বাবা লুভর মিউজিয়ামে কাজ করে এবং মেয়েকে অস্বাভাবিকভাবে ভালোবাসে। ভদ্রলোক আদর ক'রে তার মেয়ের নাম রেখেছেন মোনালিসা। এই মেয়েটি মনে মনে যাকে কামনা করে সেই লোকটাকে দেখানো হয়েছে যৌনতাড়িত ও নেতিবাচক চরিত্রে। কিন্তু মোনার প্রত্যাশিত যুবকটি তার এক প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়ের প্রেমে পড়ে যায়। মোনা আশ্রয় চেষ্টা করে যাতে তার মানুষটি অন্যের হয়ে না যায়। কিন্তু মোনা ব্যর্থ হয়। ঘটনাক্রমে সে লুভরে বেড়াতে আসা আরেক সুদর্শন প্রকৌশলী যুবকের প্রেমে পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেও দেখা যায় অন্য নারীর প্রতি আসক্ত। এ উপন্যাসে লেখক লিওনার্দো, লুভর এবং অন্যান্য বহু চিত্রকর্মের উপর বিশদ পরিচিতিমূলক তথ্য দিয়েছেন।^{২১}

রোমান্টিক গল্প-উপন্যাস থেকে শুরু ক'রে উত্তর-আধুনিক সাইবার পাংক সাই-ফাই এবং উইলিয়াম গিবসনের কাল্ট *Sprawl novel* মোনালিসা ওভারড্রাইভ (১৯৮৮) পর্যন্ত মোনালিসার উল্লেখ পাওয়া যায়।^{২২} মোনালিসা হলো ক্রিভল্যান্ডের এক পতিতা, যাকে পপস্টার এঞ্জেলো মিচেলের আদলে পুণ

নির্মাণ করা হয় বায়ো-টেকনোলজির সাহায্যে। তার মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপিত করা হয় বায়ো-চিপের সাহায্যে। এঞ্জেলাকে বর্ণনা করা হয়েছে 'পৃথিবীর সবচাইতে বিখ্যাত মুখ' হিসেবে। সার্জারির পর মোনালিসা 'আয়নায় নিজের মুখ দেখে সেই বিখ্যাত হাসিটি হাসার চেষ্টা করে।'^{৩০}

জর্জিনা হার্ডির এইমেজ-ভু লা জোকোন্দে? এবং গিবসনের মোনালিসা ওভারড্রাইভ-এ মোনালিসা থিমকে অংশত ব্যবহার করা হলেও সেগুলো আসলে পুরোপুরি ভিন্ন বিষয়-বস্তুর ছিলো। যদিও পাঠক ঠিকই সচেতন ছিলো যে, মোনালিসা কে এবং কি। এইমেজ ভু লা জোকোন্দে? একটি সহজ-সরল উপন্যাস। কিন্তু গিবসনের উপন্যাসটি সেদিক থেকে বুদ্ধিদীপ্ত এবং কৌতুহলী পুট সমৃদ্ধ, যদিও এটা অনুধাবন করাটা অসম্ভব অথবা কঠিন (আমার কাছে অবশ্য অসম্ভবই মনে হয়েছে), তাসত্ত্বেও এটার রয়েছে ডিস্টার্বিং ইমেজ। পতিতা মোনালিসা তার মুখটা বদলে ফেলে নিজেকে বিখ্যাতজনের মতো দেখাবে বলে, যদিও সে জানে এতে করে তার জীবনটা ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে : একটি শক্তিশালী সংগঠন চায় এঞ্জি মিচেলকে হত্যা করতে। সেলিব্রিটি হওয়াটা বিপজ্জনক। মোনালিসা ওভারড্রাইভ এভাবে সরাসরি লিওনার্দোর মোনালিসা'র ইস্যু সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করে, তার সৃষ্টিকর্তা এবং মডেলকে গ্রাহ্য না করেই। লুভরে আমরা যে মোনালিসাকে দেখি সেটা আর লিওনার্দোর রইলো না, আর সেটা কখনও লিসা গেরার্দিনিও ছিলো না।

দশম অধ্যায়

লিসা'র বিশ্বযাত্রা

রাজা প্রথম ফ্রান্সোয়া ১৫১৬ সালে যখন লিওনার্দোকে ফ্রান্সে আসার আমন্ত্রণ জানান তখন শিল্পী ও রাজনীতির সম্পর্কের মধ্যে তিনি নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে শিল্পীরা লক্ষণীয় স্বাধীনতা অর্জন করে, তবে রাষ্ট্র পুরো নিয়ন্ত্রণ কখনই ছেড়ে দেয় নি। কি করা যাবে আর কি করা উচিত সবই সেন্সরশিপের মাধ্যমে পরিচালনা করতো রাষ্ট্র। অর্থ আর পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে কিছু শিল্পীকে রাষ্ট্র উৎসাহ জোগাতো।

ফরাসি রাষ্ট্র অবশ্যই সংস্কৃতিকে একটা রাজনৈতিক যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করতো। যাহোক, বিংশ শতকের অধিকাংশ সময় প্রজাতন্ত্র হিসেবে ফ্রান্সের ক্যারিশমাটিক চরিত্রের অভাব ছিলো। এ সময় কোনো প্রথম ফ্রান্সোয়া, চতুর্দশ লুই বা নেপোলিয়ন ছিলেন না। তারপর এলেন যুদ্ধকালীন নায়ক শার্ল দ্য গল, যিনি ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে যদিও রাজনীতি আগেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিলো, সেখানে শিল্প এবং শিল্পীদের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছিলো কম। তারপর এলেন জন এফ কেনেডি (১৯৬০ সালে নির্বাচিত)। 'ক্যামিও' নামে নিজের 'সভা'কে আলাদা মর্যাদা দিতে তিনি প্রচুর সংখ্যক বুদ্ধিজীবী পরিবেষ্টিত থাকতেন। আধুনিক যুগে এসব বাস্তবতার চেয়েও বেশি।

দ্য গলের শাসনামলে ১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে ফ্রান্সে সৃষ্টি হয় নতুন এক শিল্প। ততোদিনে আলজেরিয়ার যুদ্ধ শেষ হয়েছে, জার্মানির সঙ্গে একটা শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, আর ক্রমশই অখণ্ড ইউরোপের একটা কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে ফ্রান্স। ফরাসি আণবিক বোমা স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির পক্ষে একটা প্রতীকি ডুমুর-পাতা হয়ে উঠেছে সেই সময়।

দ্য গলের মতো কেনেডিও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নতুন ধারার আহ্বান জানিয়েছেন; কিন্তু দু'দেশের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য বিবাদ থেকেই গিয়েছিলো। মুক্তবিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে আমেরিকানদের প্রয়োজন ছিলো নির্ভরযোগ্য মিত্র। তাতে বিপত্তি ছিলো ফ্রান্স। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক এগিয়ে যায় জটিল এক পথে। অনেক বিষয়েই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার মতভেদ ছিলো (ন্যাটো, পরমাণু নীতি, কিউবা)। আবার অনেক বিষয়ে ছিলো শুভেচ্ছার ইঙ্গিত। ১৯৬০ সালে মোনালিসাকে ওয়াশিংটন পাঠানো তারই একটি নির্দেশন। বড় কোনো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এতে যুক্তরাষ্ট্র-ফ্রান্স সম্পর্কের তেমন কিছু লাভ হয় নি, তবে মোনালিসার পরিচিতি আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের সর্বাধিক বিখ্যাত শিল্পকর্ম হিসেবে অন্য সব ছবিকে ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে যায় সেটা।

এ পদক্ষেপের স্থপতি ছিলেন আন্দ্রে মার্লরো। যিনি ছিলেন দ্য গলের সংস্কৃতি মন্ত্রী।^১ ফরাসি ভোটারদের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিলেন দ্য গল। তবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নয়। মার্লরোর অধীনে একটা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় গঠন ছিলো তাদের সমর্থন আদায়ের একটা চেষ্টা। মার্লরো নিজে ছিলেন তাদেরই একজন—পুরস্কারপ্রাপ্ত ঔপন্যাসিক, শিল্প-সমালোচক এবং একজন সাবেক প্রতিরোধ যোদ্ধা। প্রশাসক হিসেবে তিনি ছিলেন অকার্যকর; অন্যদিকে শোম্যান হিসেবে তাঁর সমকক্ষ ছিলো না কেউ।

১৯৬১ সালে প্যারিস সফর করেন জন এবং জ্যাকুলিন কেনেডি। মার্লরোর অনেক বই পড়েছিলেন তাঁরা। তাদেরকে তিনি লুভর দেখাতে নিয়ে যান। একঘেঁয়ে বিরক্তিকর কোনো মন্ত্রী ছিলেন না তিনি, বরং একজন খাঁটি বুদ্ধিজীবী, যার সমস্ত বিষয়েই ছিলো নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন, বিশেষ করে শিল্পের ক্ষেত্রে।

১৯৬২ সালে মার্লরো আমেরিকা সফরে যান। এক সংবাদ সম্মেলনে এক জন সাংবাদিক জানতে চান, যুক্তরাষ্ট্রে মোনালিসা প্রদর্শনীর কোনো সুযোগ আছে কিনা। মার্লরোর উত্তর ছিলো উৎসাহব্যঞ্জক। বিষয়টা তাঁর ভাবনায় ঢেউ তোলে। তিনি হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মোনালিসাকে আমেরিকায় নিয়ে এসেছিলেন।^২

লুভর থেকে অবশ্যই প্রতিবাদ করা হয়েছিলো। কেননা এ কাজে ঝুঁকি ছিলো বিশাল। পঁচশ বছরে পুরনো কাঠের খণ্ডটা তাপমাত্রার সামান্যতম তারতম্যেও ফেঁটে যেতে পারতো। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত হন। আমেরিকান শিল্পী জর্জিয়া ওকিফ নিজেও ছিলেন ওই দলের একজন, যদিও তিনি স্বীকার করেছিলেন, এই প্রদর্শনীর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পক্ষেত্রে অনেক লাভ হবে।^৩

কিন্তু রাজনীতি চলে এসেছিলো সবকিছুর আগে, সাধারণত যেমনটা হয়। মোনালিসার সফরের প্রস্তুতি নিতে লাগলো কয়েক মাস, ফলে সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে লেখালেখি জোয়ার বইলো আবার। মোনালিসার সব পরিচিত ঘটনা আবারো ছাপা হতে লাগলো; চুরি হয়ে যাওয়া, পাথর নিক্ষেপ, ভাসারি, ফ্রয়েড, দুশাম, কপি, রেপ্লিকা, দাবি ও পাল্টা দাবি।^৪ বিমানে ক'রে মোনালিসাকে পাঠানোর কোনো প্রশ্নই ছিলো না, অন্তত সেই ১৯৬৩ সালে। 'তাকে' ভ্রমণ করতে হয়েছিলো জাহাজে, রাণীর মতো। মোটর সাইকেল শোভাযাত্রা ক'রে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাভেরে'তে, সেখানে তাকে 'স্বাগত' জানান সমুদ্রগামী জাহাজ এসএস ফ্রান্স-এর ক্যাপ্টেন। জাহাজ কোম্পানি এ ঘটনাকে তৎক্ষণাৎ তাদের বিজ্ঞাপনী প্রচারণায় কাজে লাগিয়েছিলো। এরপর তাকে রাখা হয় বিশেষভাবে আয়োজিত একটা প্রথমশ্রেণীর কম্পার্টমেন্টে, একটা ওয়াটারপ্রুফ বাক্সের ভেতর, যাতে জাহাজডুবি ঘটলেও সেটা ভেসে থাকতে পারে।^৫ অন্য কথায়, যাত্রী ও ক্রুদের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। তার জন্য দুনিয়ায় তো নাবিকের অভাব ছিলো না, কারণ মোনালিসা যে একটাই।

১৯৬২ সালের ১৪ ডিসেম্বর ইউরোপের বাইরে প্রথম সফরে মোনালিসাকে জাহাজে তোলা হলো। নিউ ইয়র্কে পৌঁছানোর পর তাকে প্রথমে বিশেষ স্প্রিংযুক্ত একটা অ্যাথুলেসে ওঠানো হয়, তার প্রহরায় নিযুক্ত হয় সশস্ত্র গোয়েন্দা এজেন্টরা। তারপর তাকে লিংকন ও বান্টিমোর হার্বার টানেল দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় সব যানবাহন চলাচল বন্ধ ক'রে রাস্তা ফাঁকা ক'রে দেয়া হয়েছিলো। এভাবে তাকে পৌঁছানো হয় ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল গ্যালারিতে।^৬

১৯৬৩ সালের ৮ জানুয়ারি *Le tout Washington*-এর উপস্থিতিতে সেখানে জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা পার্টির আয়োজন করা হয়। আলোকচিত্রিরা মোনালিসার রহস্যময় হাসির অনুকরণে মিসেস কেনেডির হাসিমাখা মুখের ছবি তোলে। দ্য গল ফ্রান্সেই ছিলেন—সেখানে জায়গা ছিলো মাত্র একজন তারকারই। ফরাসি দূতাবাসে একটা বিশেষ ডিনারেরও আয়োজন করা হয়, তাতে উপস্থিত থাকেন প্রেসিডেন্ট কেনেডি। এটা ছিলো শুভেচ্ছার মনোভাব প্রকাশের একটি প্রতীকী উদ্যোগ। বিদেশী দূতাবাসের পার্টিতে উপস্থিত হওয়াটা আমেরিকান প্রেসিডেন্টের জন্য প্রথামাফিক কোনো বিষয় নয়। মেনুতে ছিলো *Poires Mona Lisa*, পার্টির জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত এক ধরনের দই। ১৯১৯ সালে মার্সেল দুশাম মোনালিসার সঙ্গে গোঁফ যুক্ত করেন

তাই রেনেসাঁ যুগের একটা মাস্টার পিসের নামে একটা খাবারের নামকরণ করা কারো কাছেই বিদ্‌ঘুটে মনে হয় নি।

১০ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ন্যাশনাল গ্যালারিতে ছবিটা সর্বসাধারণের জন্য প্রদর্শন করা হয়। এরপর সেটা দেখানো হয় নিউ ইয়র্ক মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামে, সেখানে ওটা রাখা হয় ৪ মার্চ পর্যন্ত। *Paris-Match* (১৯ জানুয়ারি ১৯৬০) পত্রিকাটি লেখে, এক দিনে ছবিটার দর্শক সংখ্যা হয় ১১, ২৫০ জন। জনপ্রতি গড়ে বারো সেকেন্ড ক'রে সময় পায় তারা ছবিটা দেখার জন্যে। ১৭ ফেব্রুয়ারি লন্ডনের অবজার্ভার পত্রিকা জানায়, পূর্ববর্তী সপ্তাহে ২৫০০০ মানুষ মোনালিসা দেখেছে, *paris-Match* পত্রিকার হিসাবের চেয়েও যা অনেক বেশি, প্রতি দর্শনার্থী গড়ে তিরিশ সেকেন্ড ক'রে ছবিটা দেখার সুযোগ পায়—লিওনার্দোর এটি আঁকতে অবশ্য চার বছর লেগেছিলো।^৯ এ নিয়ে পত্রিকাগুলোর নানারকম হিসেব চালাতে থাকে। এর মধ্যে একটা ঘটনা মার্লরোর মনোযোগ আকর্ষণ করে। এক তরুণকে প্রবেশ পথে আঁটকে দেয়া হয় গোপনে তার কুকুরটিকেও প্রদর্শনীতে ঢোকানোর চেষ্টা করায়। ওই তরুণ অশ্রুপূর্ণ চোখে জানায়, ‘আমি চেয়েছিলাম ফক্সি হবে দুনিয়ার একমাত্র কুকুর যে মোনালিসাকে দেখেছে।’^{১০} অন্যদিকে নর্থ ক্যারোলিনা থেকে ছত্রিশজন শিল্পপ্রেমিক একটি বিমান ভাড়া ক'রে বিমানটির ফিউজলেজে মোনালিসার একটা প্রতিকল্প নিয়ে ওয়াশিংটন টুরে আসে শিল্পকর্মটা দেখতে।^{১১}

মোনালিসার আমেরিকাবাসের শেষ নাগাদ ১৬ লাখেরও বেশি দর্শনার্থী তাকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলো। হাজার হাজার মানুষ এক নজর ছবিটা দেখার জন্য ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। বিস্ময়ভর্য প্রতি আধুনিক যুগের আকুলতা এতেই মূর্ত হয়ে উঠেছিলো। কেননা, এর ঠিক এক বছর পর ১৯৬৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে মোনালিসার ষোলো শতকে করা একটা বিশ্বস্ত কপি (ভার্ননের কপি করা মোনালিসা) প্রদর্শন করা হয় লস অ্যাঞ্জেলেসের ওটিস ইস্টিটিউটে। সেখানে দর্শক সংখ্যা হয়েছিলো হাতে গোনা কয়েকশ, অথচ ক্যালিফোর্নিয়ার আবহাওয়া ছিলো চমৎকার।^{১২} পর্যটনের প্রধান ধারণাই হলো বিস্ময়ভর্য, আর আসল বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেই পারে।^{১৩} মেরি ম্যাকার্থি ১৯৭৪ সালে যেমনটা লিখেছেন : ‘আজকাল আসলটাই সবাই চায়। প্রতিটি শহর, প্রতিটি কলেজ তাদের জাদুঘরের জন্য আসলটাই চায়।’^{১৪} কপির প্রতি এই হীনতর মনোভাব আধুনিক তবে সাম্প্রতিক নয় : ১৮৭০ থেকে ১৮৭৩ সাল

পর্যন্ত *Ecole des Beaux-Arts*-এর পরিচালক কার্ল ব্লা শিল্পের ইতিহাসকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে সম্পূর্ণতা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন *Museum of Copies*, কিন্তু বেশি দিন চলে নি সেটা, মাত্র কয়েক মাস খোলা ছিলো, তার পরবর্তী পরিচালক এসে তা পুরোপুরিই বন্ধ করে দেন।

যাহোক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে। ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে ফরাসিরা মোনালিসার ষোলো শতকের একটা প্রতিকল্প পাঠায় বুলগেরিয়ায়। ‘মানব ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যপূর্ণ উন্নতি’ বিষয়ক লিওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে প্রতিকল্পটা সেখানে পাঠানো হয়। সেটা দেখার জন্য এমন আত্মহের সৃষ্টি হয় যে দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো। এমন কি এক বর্বর সেটার উপর হামলাও করেছিলো।^{১০}

যাহোক, যুক্তরাষ্ট্র সফর ছিলো মোনালিসার ‘জাতীয়করণে’ চূড়ান্ত উপাদান। এক ইতালিয় রমণীর একটি ইতালিয় প্রতিকৃতি ফ্রান্সের শৈল্পিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধি হিসেবে আমেরিকায় পাঠানোটাকে কেউ কেউ বিদ্‌ঘুষ্টে মনে করেছিলো। তাছাড়া একক কোনো ফরাসি শিল্পকর্ম ছিলো না যা অনুরূপ প্রভাব ফেলতে পারতো—ফরাসিদের দেখানোর মতো একটা জিনিসই ছিলো—আইফেল টাওয়ার, কিন্তু জাহাজে করে জিনিসটা আটলান্টিকের ওপারে নিয়ে যাওয়ার কথা সম্ভবত কেউ জল্পনা করে নি। ফ্রান্স নিশ্চয় সাধারণভাবে এই হিসেব করেছিলো, বিশ্বজনীন মূল্যবোধের বিশ্বজনীন বাহক হিসেবে সে তার গন্তব্য পূরণ করছে। আমেরিকানরা এ ধারণা সহজেই বুঝতে পেরেছিলো এবং তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণও করেছিলো। ফরাসিদের মতো তারাও বুঝতে পেরেছিলো, প্রদর্শনীটির অবশ্যই রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক লক্ষ্য ছিলো, কিন্তু এটা ছবিটাকে জনগণের মোনালিসায় রূপান্তরিত হতেও অবদান রাখে। এটা পছন্দ করতে এবং বুঝতে বুদ্ধিজীবী হবার আর দরকার পড়ে না, অথবা কোনো যোগ্যতারও প্রয়োজন পড়ে না। এটা হয়ে উঠলো নায়াগ্রা জলপ্রপাত, আইফেল টাওয়ার, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, চিনের মহাপ্রাচীর অথবা পিরামিডের মতো : এক মহাবিশ্ব।

এরপর দেশের বাইরে শিল্পকর্ম পাঠানো একটা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হলো। ১৯৬৪ সালে মার্লরো আরো একটি ‘ফরাসি’ ঐতিহ্যের অংশ পাঠালেন জাপানে, সেটা এক অজানা গৃক ডাক্তারের তৈরি করা একটি গৃক দেবীর মূর্তি—ভেনাস দ্য মিলো। ভাস্কর্যটা ফিরে এসেছিলো সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায়।

এক দশক পর ১৯৭৪ সালে দ্য গলের উত্তরসূরি জর্জ পম্পিদু মোনালিসাকে জাপানে পাঠাতে রাজি হন। সে বছর ১৭ এপ্রিল থেকে ১১ জুন

পর্যন্ত টোকিও ন্যাশনাল মিউজিয়ামে প্রতিকৃতিটা প্রদর্শিত হয়। ফেরত আসার পথে মস্কোতে থেমে সেখানেও এর প্রদর্শনী করা হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মোনালিসা ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তখন।^{১৪} মাত্র দু'বছর আগে গলপস্থী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (এবং অ্যামবোয়ার মেয়র) মিশেল দেব্রে ইউরোপিয় ইকোনমিক কমিউনিটিতে বৃটেনের অন্তর্ভুক্তি উপলক্ষ্যে মোনালিসাকে লন্ডনে পাঠাতে তাঁর আপত্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বেকায়দাজনকভাবে বলেছিলেন, বিদেশে ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করতে কেউ একটা ইতালিয় শিল্পকর্ম পাঠাতে পারে না।^{১৫}

এই বিতর্কের ফলে টোকিওতে প্রদর্শনী পর্যন্ত মোনালিসা খবরের কাগজে আলোচনার বিষয় হয়ে থাকে। এবার সে গিয়েছিলো বিমানে। ফরাসিরা জানালো, জাপানিরা ঠিক আমেরিকানদের মতোই আচরণ করেছিলো। জাপানিরা, খুব কম লোকই অস্বীকার করবে যে, তারা এক প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, কিন্তু পশ্চিমে খুব কম লোকই সে ব্যাপারে জ্ঞাত আছে, তারা কেবল তলোয়াড়, সামুরাই এবং কাঁচামাছ সম্পর্কেই জানে। তাসস্বেও এটা মেনে নেয়া হয় যে, তারা 'পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে—ধনী হয়ে উঠেছে আর কি। দক্ষ হয়ে উঠেছে গাড়ি এবং স্কুদে রেডিও বানাতে। মোনালিসা ড্রমণের জন্য তারা এর চেয়ে আর কী বেশি দিতে পারে।

ইউরোপে তখনও জাপানি পর্যটকের উপস্থিতি ছিলো ব্যাপক। এই ধারণাটি সর্বজনবিদিত একটি ভুল ধারণা যা আজো টিকে আছে। বাস্তবে, এমনকি ১৯৯৯ সালেও মাত্র ৫ শতাংশ দর্শনার্থী জাপানি ছিলো, যা কানাডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ানদের সমসংখ্যক। অথচ এই দু'দেশের জনসংখ্যার সম্মিলিত সংখ্যার চেয়েও জাপানের জনসংখ্যা বেশি। সবচাইতে বেশি দর্শনার্থী হয় আমেরিকা থেকে, ২০ শতাংশের মতো। তারপর ইতালিয়, বৃটিশ এবং জার্মানের অবস্থান (এরা প্রত্যেকে আনুমানিক ৬ শতাংশের মতো)।^{১৬}

আমেরিকানরাই প্রথম কৌতুক তৈরি করেছিলো মোনালিসাকে কেন্দ্র করে : নিউ ইয়র্কার পত্রিকায় বিখ্যাত এক কার্টুনে দেখা যায় মধ্যবয়সী এক আমেরিকান দম্পতি তাড়াহুড়া করে লুভরে প্রবেশ করছে আর প্রহরীকে জিজ্ঞেস করছে, 'মোনালিসা কোন্ দিকে? আমরা ডাবল পার্ক করেছি।' আর্ট বুচওয়ার্ড বর্ণনা করেছেন তিনি কিভাবে ২০ বছর আগের রেকর্ড ভেঙে ড্রমণ করেছেন—ভেনাস, উইংস ভিক্টোরি এবং মোনালিসা ('সবাই জানে বাকিগুলো সব ফালতু') পাঁচ মিনিট নব্বই সেকেন্ডে এক এক করে 'নিখুঁত পর্যটক' অবস্থাতে।^{১৭}

জাপানিরা ইউরোপিয়ানদের মতো এবং তাদের আগে আমেরিকানদের মতো মোনালিসা সম্পর্কে আগ্রহী ছিলো। সংবাদ মাধ্যম যথারীতি পাঠকদের কাছে প্রদর্শনীর খুঁটিনাটি তুলে ধরতে থাকে। *Japan Times* পত্রিকা ১৯৭৪ সালের ২৮ এপ্রিল জানায়, প্রথম সপ্তাহে দৈনিক গড়ে দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিলো ১৮,৮৮১।^{১৯} পত্রিকায় দাবি করা হয়, কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক দর্শকের জন্য বরাদ্দ করে দশ সেকেন্ড। যদি টোকিও মিউজিয়াম প্রতিদিন দশ ঘণ্টা করে খোলা থাকতো আর প্রথম সপ্তাহের দর্শক সংখ্যা হয় একটা মাপকাঠি। তাহলে প্রত্যেক দর্শনার্থী প্রতিকৃতিটার সামনে দাঁড়ানোর জন্য সময় পেতো ১.৯ সেকেন্ড। এটা মনে হতে পারে খুব বেশি তাড়াহড়োর, কিন্তু দেখার জন্য এটা যথেষ্টই।^{২০}

গতি বাড়ানোর জন্য জাপানি জাদুঘর কর্তৃপক্ষ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রদর্শনী দেখতে আসার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলো। কেননা হুইলচেয়ার, ক্রাচ, ওয়াকিংস্টিক দর্শনার্থীদের সুদীর্ঘ মিছিলের গতি শ্রুত করে দিতে পারতো। এ নিয়ে প্রতিবাদ ওঠে। এক মহিলা সুরক্ষার কাচের উপর রঙ ছিটিয়ে দেয়। কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে পন্থা দর্শনার্থীদের জন্য একটি দিন ধার্য করে। অন্য এক ঘটনায় জাপানের নারী মুক্তি আন্দোলন 'মোনালিসার কাছ থেকে জনসাধারণকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য' জাপানি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের নিন্দা জানায়।^{২১}

জাপানে এই প্রদর্শনীর সময় ছবিটার ব্যাপক বাণিজ্যিক প্রসার ঘটে। ১৯৬৩ সালেও এ বাণিজ্য ছিলো শৈশবাহ্বায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণটি কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী পাগলামীর সৃষ্টি করেছিলো মোনালিসা আদলের জন্য। ফরাসি অভিনেত্রী মিশেলে মেসিয়ে প্যারিসের হেয়ারড্রেসার ডেফোজে'র নতুন চুলের স্টাইলের জন্য পোজ দিলো।^{২২} আমেরিকান হেয়ার ড্রেসার মাইকেল কাজান ব্যবহার করলেন অভিনেত্রী সুজান স্ট্রাসবার্গকে তার নিজের সংস্করণের জন্য।

এবারের টোকিও সফরের এটা প্রসুটিত হয়ে উঠে। দর্শনার্থীদের কাছে সুভেনির বিক্রি হতে থাকে। আগের বছর চিনারা দুটো পান্ডা পাঠিয়েছিলো জাপানি চিড়িয়াখানায়। তখন নরম খেলনা বিক্রি করে বেশ পয়সা কামানো হয়। ব্যবসার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পান্ডা আর মোনার কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং বিপুল পরিমাণে মোনালিসা পুতুল, পোস্টার ও কার্ড বিক্রি হতে থাকে, এর ফলে প্রহেলিকাময় হাসির দেখা মেলে সবখানেই।^{২৩}

মোনালিসার জাপান সফরের সঙ্গে কম্পিউটারের প্রথম দিনকার ব্যবহারের দৈবাৎ একটা মিল তৈরি হয়। জাপানিরা দাবি করে বসে, মোনালিসা কি বুকম

কথা বলতে পারতো সেটা তারা তৈরি করতে পারে। একটা বোতাম টিপলে কম্পিউটারের মাধ্যমে লিসা গেরার্ডিনি ব'লে উঠবে : 'হাই, আমার নাম লিসা এবং আমি গিওকোন্দা হিসেবেই পরিচিত।'

টোকিওতে প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে তাঁর আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রী অ্যালান পেইরেফি বলেন, এটা বিশ্বের মধ্যে সেরা জাদুঘর থেকে আসা সেরা তৈলচিত্র। (নিজের দেশের ব্যাপারে বিনয়ী হওয়ার জন্য কারো সংস্কৃতি মন্ত্রী হওয়ার দরকার হয় না)। মোনালিসা, তিনি আরো বলেন, উপস্থাপন করে পশ্চিমা সংস্কৃতির দুই মহান ঐতিহ্য। প্রথমটি হলো আনুষ্ঠানিক সৌন্দর্যের ধ্রুপদ নন্দনতাত্ত্বিক ঐতিহ্য। মোনালিসা ছিলো একজন সুন্দরী মহিলা, তার ভঙ্গি এবং ভূ-দৃশ্যও ছিলো সুন্দর। তিনি আজো বলেন, সে খৃস্টান ঐতিহ্যও উপস্থাপন করে আর সেটা হলো আত্মিক সৌন্দর্য।^{২৪} তার হাসি সন্তুসূলভ। এতো মিষ্টি যে, এই তৈলচিত্রে এমন কিছু আছে যা প্রত্যেকের জন্যেই।

লুভরের কিউরেটররা আবারো সফরের বিরোধিতা করেছিলেন। তারা মতামত দেন, পরিবহনের সময় এটাকে বিশেষ একটা বাক্সে রাখা দরকার, আর প্রদর্শনীর সময় সুরক্ষাকারী কাচের ভেতরে। প্রতিকৃতিটা যখন প্যারিসে ফিরে এলো তখনও বিষয়টা তারা অস্বীকার করতে পারলেন না। প্রতিকৃতিটা লুভরে নতুন ক'রে বসানো হলো একটা বুলেটপ্রুফ বাক্সে, পৃথিবীতে এমনভাবে সুরক্ষিত এটাই একমাত্র শিল্পকর্ম। এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভেনাস দ্য মিলো ও উইংগড ভিক্টোরি ছেড়ে দেয়া হলো সাইকোপ্যাথ আর বর্বরদের করুণার উপর, অন্য সব কিছুর মতোই। লিসা তার দুর্গে একাই থেকে গেলো। শিগগিরই দর্শনার্থীদের জন্য মোনালিসা, ভেনাস দ্য মিলো ও উইংগড ভিক্টোরির দিক নির্দেশনা ক'রে সাইনপোস্ট লাগানো হলো। তা না হলে Joconde-এর পথ দেখাতে দেখাতেই কর্মজীবন শেষ হয়ে যেতো প্রহরীদের।

মোনালিসার প্রথম সফরের প্রায় একই সময়ে ব্যাপক প্রদর্শনীর যুগ শুরু হয়। এটা পরিষ্কার হয়ে আসছিলো যে, শিক্ষা, ভ্রমণ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বৃদ্ধি জাদুঘর ও প্রদর্শনীর পক্ষে কল্যাণকর হয়ে উঠবে। আশংকা করা হতো, টেলিভিশন, সিনেমা ও শিল্পকর্ম নকলের সহজ সুযোগ জাদুঘরকে ধ্বংস ক'রে দেবে, বাস্তবে তেমনটি ঘটে নি। বরং বিদেশের শিল্পকর্ম আর শৈল্পিক ঐতিহ্য দেখে মানুষের মনে ওই দেশে গিয়ে নিজের চোখে সব দেখার আগ্রহ জেগেছে।

ব্যাপক পর্যটন একটা সাম্প্রতিক ব্যাপার । ১৯৪০-এর দশকের শেষ দিকে ৩১ লাখ বৃটিশ শ্রমিক বছরে দু'সপ্তাহ ছুটি পেতো । দশ বছর পর সে সংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ ছাড়িয়ে যায় । ১৯৭১ সালে মাত্র এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত বয়স্ক বৃটিশ নাগরিক বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলো; দশ বছর পর মাত্র এক তৃতীয়াংশ নাগরিকের সে সুযোগ হয় নি ।^{২০} ১৯৬০-এর দশকে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ছিলো ব্যয়বহুল, আর বিদেশী মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পরিমাণের উপরও ছিলো বিধিনিষেধ : ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত অধিকাংশ ইউরোপিয় দেশ মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রথা বিলোপ করে নি । কেবল ১৯৭০ সালের পর বড় আকৃতির জেট বিমান চার শয়েরও বেশি যাত্রী নিয়ে যেতে সক্ষম হয় ।^{২১} ১৯৯০-এর দশক নাগাদ বিশ্বে ভ্রমণ ও পর্যটন একটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে পরিণত হয় । বিশ্বের জিডিপির অন্তত ৬ শতাংশ আসে এ খাত থেকে, তাছাড়া সারা বিশ্বে এ পেশায় নিযুক্ত আছে অন্তত ১২৭ মিলিয়ন মানুষ । একটা বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধির ফলাফল এই : ১৯৫০ সালে আড়াই লাখ আন্তর্জাতিক ভ্রমণ সম্পন্ন হয়েছিলো; ১৯৯৬ সাল নাগাদ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৯২ মিলিয়নে ।^{২২}

এর অধিকাংশই সংঘটিত হয় উন্নত বিশ্বের মধ্যে । যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় পর্যটক রপ্তানিকারক দেশ, তাছাড়া এ খাতে প্রধান উপার্জনকারীও বটে । বিদেশী পর্যটকদের কাছ থেকে ১৯৯৫ সালে তার আয় হয় ৬১ বিলিয়ন ডলার । ফ্রান্স আর ইতালিও বেশ ভালো করে : প্রত্যেকে ২৭ মিলিয়ন ডলার । এরপর জাপান ও যুক্তরাজ্য । ১৯৯৯ সালে ৬০ মিলিয়নেরও বেশি পর্যটক ফ্রান্স সফর করে ।^{২৩} ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরো বাড়বে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, চীন, কোরিয়া ও লাতিন আমেরিকা থেকে নতুন পর্যটকদের আগমন ঘটছে উল্লেখযোগ্য হারে ।

তথাকথিত সাংস্কৃতিক পর্যটন থেকে লাভবান হয়েছে ইউরোপের শিল্প সমৃদ্ধ রাজধানীগুলো : রোম, লন্ডন, ভেনিস, ফ্লোরেন্স এবং অবশ্যই প্যারিস । বেশিরভাগ পর্যটকই কদাচিৎ একই শহরে বেশিদিন থাকে এবং গাইডবুক অনুসরণ করে । প্যারিসে প্রথম আগমনকারীর জন্যে আইফেল টাওয়ার এবং লুভরে না যাওয়াটা ব্যতিক্রমী ঘটনাই বটে । ১৯৬০'র দশকে লুভরে বছরে প্রায় দশলক্ষ দর্শনার্থীর আগমন ঘটেছে, সেটা বেড়ে ১৯৮০'র দিকে দাঁড়ায় প্রায় ত্রিশ লাখে ।^{২৪} আর ১৯৯৮ তে এটা দ্বিগুণ হয়ে ষাট লক্ষ্যে পৌঁছায়—যা ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল গ্যালারি আর বৃটিশ মিউজিয়ামের চেয়ে বেশি, যারা মাত্র এক পেনি প্রবেশ মূল্য নিয়ে থাকে ।

দর্শনার্থী কারা? তারা বেশিরভাগই তরুণ-তরুণী : তেষ্ট্রি শতাংশের বয়স পয়ত্রিশের নিচে, চল্লিশ শতাংশের বয়স পঁচিশের নিচে। আবার সংখ্যায় নারীরাই অধিক; আটাল্ল শতাংশ। অর্ধেকের একটু কমসংখ্যকের বেলায় লুভরে আসার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। ১৯৯৮-তে ৩৯ শতাংশ সাবালক ফরাসি জনগোষ্ঠী এবং ৭১ শতাংশ প্যারিসবাসী লুভরে গিয়েছে।

তাদের কেউ কেউ মোনালিসা পরিদর্শন না করে জাদুঘরের অন্যান্য মূল্যবান শিল্পকর্ম চাক্ষুষ করেছিলো। কিন্তু প্রথমবার প্যারিস ভ্রমণের কথা একবার কল্পনা করা যাক। কতো অল্প সময়ে কতো কিছু করতে হয় : আইফেল টাওয়ার, ক্যাফে, রেস্তোরাঁ, সাইন নদী, শো, শপিং, আর যাবতীয় সাংস্কৃতিক বিষয়। বিদেশী পর্যটকরা গড়ে তিন ঘণ্টা ব্যয় ক'রে লুভরে, অন্তত, জরিপে তেমনটাই দাবি করা হয়।

কারো কারো কাছে মোনালিসা একটা নিরাশ হওয়ার মতো বস্তু : এতো ছোটো, চারপাশে এতো মানুষ! অন্যদের কাছে এ এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা, যেমন মেরির মনে হয়েছিলো। ইয়র্কশায়ারের রথারহ্যামে নিকটবর্তী সুইনটনের ষোলো বছরের মেয়ে মেরি ১৯৭৮ সালে লুভর সফর করেছিলো।

কিউরেটরকে সে লেখে :

আমি এই ছবিটির মধ্যে দেখেছি সব বয়সের নারীদেরকে, বালিকারা পুতুল নিয়ে খেলছে, পোশাক পড়ছে, নারীদের ভালোবাসার মানুষেরা, তাদের বাচ্চারা, গৃহস্থালী শিল্পকর্ম, তাদের নিজেদের দক্ষতা, সহজ-সরল জিনিস যা নারীরা ক'রে থাকে, রান্না-বান্না, সেলাইর কাজ, কাপড় বুনন, এবং লেসের কাজ-কর্ম। কোনো উল্টাপাল্টা এবং অসুন্দর কিছু নেই...সেটা ছিলো খুবই চমৎকার একটি প্রকাশ যা আমার মনে হয়েছিলো এটি দেখার জন্যে আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কোনো হৈচৈ আর জটিলতা নেই সেখানে...এটা খুবই সুন্দর একটি প্রকাশ যা দেখতে আমাকে এতোটাই কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিলো যে, আমার কল্পনা আমার সাথে চালাকি করেছিলো।^{১০}

এর বিশ বছর পর, ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে ওয়াশিংটন ডিসির আরেক তরুণী জিনা শ একটা ওয়েব সাইটে (www.epinons.com) লেখে :

আমি মুগ্ধ হবার প্রস্তুতি নিয়ে লুভরে গিয়েছিলাম...আমাকে এতোটা মস্তমুগ্ধ করে ডেকেছিলো যে, আমি চোখ সরাতে পারি নি... অবশেষে আমি বুঝতে পেরেছিলাম কেন এই তৈলচিত্রটি কিংবদন্তি, অমর।

আমর মনে হয়েছিলো আমি কাজটির সাথে, শিল্পীর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলাম। আর এটা দেখে আমার মনে হয় নি, আমি আমার কোনো ছবি অথবা ভিডিও দেখছি।

লাতিন আমেরিকান এক মহিলা কবি রোলারিও কাস্তেয়ানোস নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন 'Looking at the Mona Lisa' শীর্ষক কবিতায় :

আমি সেই সব মাখামোটা মহিলা দর্শক নই, যারা ট্রাভেল এজেন্সির দ্বারস্থ হয় একটা প্যাকেজ টুরের জন্যে।^{১১}

কপির ব্যাপক পুনরুৎপাদন আর প্রচুর সখ্যক পোস্টকার্ডের দৌলতে মোনালিসা এখন প্রত্যেকের বেডরুমেও শোভা পেতে পারে। যারা ক্যানভাসে তেলরঙে 'যথাযথ' কপি পেতে আগ্রহী তাদের জন্য রয়েছে পেশাদার নকলকারীরা। এমন একজন তো দাবি করেছেন, ২৫৫ বার তিনি মোনালিসা এঁকেছেন।^{১২}

১৯৬০-এর দশকে অ্যাভি ওয়ারহল ব্যাপক পুনরুৎপাদন ও সেলিব্টিদের উপর তার দৃশ্যমান মন্তব্য শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর মেরিলিন মনরো (*Twenty-five Colored Marilyns*, ১৯৬২), এলভিস প্রিসলি (১৯৬৪), ক্যাম্পবেলস সুপ স্টনস সেসবেরই উদাহরণ। মোনালিসা আমেরিকা সফর তাকে উৎসাহ জোগায় *Thirty are Beter than One* (৪৪ নম্বর ছবিটি দেখুন) ছবিটি আঁকতে।^{১৩}

ওয়ারহলের উপর এবং মোনালিসাকে ব্যবহার বা অপব্যবহার করা হয়েছে যেসব ছবিতে সেগুলোর উপর দুশামের প্রভাব খুঁজতে যাওয়াটা পরীক্ষায় ফেলার মতো ব্যাপার। এটা ঠেকানো উচিত। ১৯১৯ সালে দুশামের *L.H.O.O.Q.* শিরোনামের কাজটিকে উঁচু সংস্কৃতি ধ্বংসের একটা উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ১৯৬০-এর দশকে এসে মোনালিসা আর উঁচু

সংস্কৃতির রইলো না, বরং একটা জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক আইকনে পরিণত হয়ে গেলো সেটা। ওয়ারহল উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, লিসা পরিণত হবে এলভিস ও মেরিলিনের মতো। মিডিয়াও তাকে সেভাবেই ব্যবহার করবে। শয়ে শয়ে শিল্পী মোনালিসাকে তাদের থিম হিসেবে ব্যবহার করেছেন, তারা এ কাজের মাধ্যমে আসলে কোনো কিছু ধ্বংস করছিলেন না। তারা মোনালিসাকে ব্যবহার করতেন নিজেদের এবং নিজেদের কাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে—আবার এর ফলে বিশ্বসেরা শিল্পকর্ম হিসেবে মোনালিসার অবস্থান আরো শক্ত ও বিস্তৃতও হয়েছে।

কেউ কেউ শুরু করেছিলেন তুলনামূলকভাবে বেশ আগেই। ১৯৪৮ সালে জ্যঁ দুবুফে আঁকেন *La Joconde* (এখন সেটা সংরক্ষিত আছে জেনেভার গ্যালেরিয়ে দানিয়েল ভারেন্নে গ্যালারিতে)। কলোম্বিয় ফার্নান্দো বোতেয়ো *Mona Lisa Age Twelve* আঁকেন ১৯৫৯ সালে, এবং আবারো এই থিমে ফিরে আসেন ১৯৭৮ সালে তাঁর *Mona Lisa* (৪০ নম্বর ছবিটি দেখুন) শিরোনামের কাজটিতে।

পপ আর্টের সকল অগ্রপথিকই মোনালিসা রূপান্তর করেছেন যার যার মতো করে : রবার্ট রুশেনবার্গের শিরোনামহীন মোনালিসা (আনুমানিক ১৯৫২ সালে আঁকা, কালেকশন ইথেন রেডনার স্কাল, নিউ ইয়র্ক) এতোটাই সফল হয়েছিলো যে, মোনালিসা নিয়ে প্রচুর সংখ্যক কাজ করতে হয়েছিলো তাঁকে। সেগুলোর মধ্যে জাপানে একগুচ্ছ সিরামিকের কাজও ছিলো, যার একটির শিরোনাম ছিলো *Pneumonia Lisa*। ১৯৬০ সালে শুরু হয় ম্যাগ্নিটের পালা। তাঁর *La Joconde* (৪৫ নম্বর ছবিটি দেখুন) বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে *Joconde*-কে উপস্থাপন করে না—সেটার প্রয়োজনও ছিলো না, যেহেতু আমরা জানি সেটা কেমন দেখায়। পুরোভাগের কেন্দ্রে রয়েছে ম্যাগ্নিটের নিজস্ব ধরণের মেঘলা আকাশ, একটা আকৃতির মধ্যে তা বন্দি। দুটো ভাঁজযুক্ত পর্দার (আরেকটি পৌণপুনিক থিম) পাশেই; এক দিকে, তলার কাছাকাছি, একটা বল—সেটা কি কোনো মুখ? হাসি? যোনি? না কি এমন কিছু যা আরো প্রহেলিকাময়?

হাঙ্গেরিয় শিল্পী সান্দোর বোর্থনিক আরো বেশি চিত্তাকর্ষক মোনালিসা উপস্থাপন করেন (*Mona Lisa in the Twentieth century*, ১৯৫৩), কাঁধ-পর্যন্ত চুল, লম্বা কালো দস্তানা ও আবরণহীন কাঁধ, এসপ্রেসো কফি পানরত, পটভূমিতে স্কাইস্ক্র্যাপার—চারটি সেটের একটি অংশ, সেকালের অনুকরণে একটা মোনালিসা ও ভ্যান গগের অনুকরণে একটা মোনালিসাসহ।

১৯৬৪ সালে রুমানিয় শিল্পী দানিয়েল স্প্যায়েরি একটা শিল্পকর্ম তৈরি করেন, তাতে দেখা যায় একটা চেয়ারের গায়ে ঠেশ দিয়ে রাখা আছে একটা ইস্ত্রি করার বোর্ড, তার উপর একটা ইস্ত্রি। আর যে বস্তুটা ইস্ত্রি করা হবে সেটা মোনালিসা। ধরে নেয়া হয় ইস্ত্রি করার বোর্ডটি একজন রেমব্রান্ট, যেমন পুরো নির্মাণটির শিরোনাম যোগ করা হয় *Using a Rembrandt as an Ironing Board*।^{৩৪} এখানে যে কোনো মানুষের মাস্টারপিসের ক্ষেত্রে 'রেমব্রান্ট' একটা প্রতীক হিসেবে বোঝানো হচ্ছে, মোনালিসার ক্ষেত্রেও তাই—একটা লক্ষ্যস্থল আর একটা পয়েন্ট যা প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেই শনাক্ত করেছিলো ফিউচারিস্ট ও দাদাইস্ট গোষ্ঠীর শিল্পীরা। জনপ্রিয় শিল্পী জেসপার জন্স চূপ থাকতে পারেন নি। ১৯৬৮ সালে তিনি *Color Numeral No. 7* শিরোনামে একটা লিপোগ্রাফ তৈরি করেন, সেটা ছিলো মোনালিসার একটা প্রতিক্রম, এবং ১৯৮৪ সালে তিনি আরেকটি লিপোগ্রাফ তৈরি করে *Racing Thoughts* শিরোনামে যেখানে শিল্পীর জীবন ও তাঁর শিল্পের উপর প্রভাব থেকে নেয়া বিভিন্ন প্রতিক্রমের পাশাপাশি মোনালিসার জায়গা পায়। জন্স অনেক বছর পর্যন্ত শিল্পের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর অভিমতের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে মোনালিসাকে ব্যবহার করেন। ১৯৬২ সালে টম ওয়েলসলম্যান বার থ্রেট আমেরিকান লুডস শীর্ষক সিরিজে এক পাশে মোনালিসাকেও জায়গা দিয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে বৃটিশ জনপ্রিয় শিল্পী পিটার লেক সিক্ক-স্কিনের উপর অন্যান্য ছবির মাঝখানে মোনালিসার একটা কোলাজ তৈরি করেন।

১৯৬৫ সালে মোনালিসার এই জোয়ারে একটা সত্যিকারের হিম্মানি সম্প্রপাত ঘটে যায়। এরিকো কাজের *The Revenge of Mona Lisa* (দু'পাশের অবয়ব যুক্ত), মার্ক ক্রুসের *Le deu de la Joconde*, লোর্দেস কাস্তোর *Le Contour de la Joconde* এবং ওডমুনডুর এরো, রবার্ট ফিলিও, জ্য জ্যাক লেবেল, পিটার ক্র্যাসেন, মিলভা ম্যালিওন, জাক মেনারি ও আরো অসংখ্য শিল্পীর কাজসহ এটা ঘটে।^{৩৫}

১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে লন্ডনের নিকোলাস ট্রেডওয়েল গ্যালারি মোনালিসা অনুপ্রাণিত সাম্প্রতিক শিল্পকর্মের একটা প্রদর্শনী করে। *The Mona Lisa Show*-তে প্রায় ত্রিশজন শিল্পী অংশ নেন।^{৩৬} সত্যিকারের অগ্রপথিকরা, যদিও সব শিল্পী হয়তো এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না, কেউ দুশাম বা ওয়ারহল ছিলেন না, তারা ছিলেন মজাদার পোস্টকার্ডের নকশাকার, প্রতিকৃতিটা চুরি হয়ে যাওয়ার পর এসব পোস্টকার্ডের সমাদর বেড়ে গিয়েছিলো। বস্তুত ট্রেডওয়েল গ্যালারিতে প্রদর্শিত অসংখ্য কাজ মোনালিসাকে

উচ্চমূল্যে তুলে ধরার পোস্টকার্ডগুলোর থেকে তেমন আলাদা কিছু ছিলো না। তাকে দেখা যায় ভেড়ার চামড়ার কোট পরা অবস্থায় উলের হেডস্কার্ফ ও রোদচশমা, গলায় বুলগু একটা ক্যামেরা; পেছন থেকে দেখা যায় মোজা পরা অবস্থায়; আর এক তরুণী 'পাংক' হিসেবে (রিচ করা চুর, অনাবৃত বুক, এক জোড়া কালো বুট পায়ে)। একটা মোটর সাইকেলের দু'দিকে দু'পা ফাঁক ক'রে বসা আর উর্ধ্বাঙ্গে সি-থ্রু ব্লাউজ; একটা বিশাল আকৃতির আপেলসহ যার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে তার মুখের বেশির ভাগটা (*Magrita Lisa*); স্বমেহনরতা (*Kiss me Lisa*); একটা গাড়ির পেছনের আসনে বসা, দেখা যাচ্ছে, রিয়ার-ভিউ মিররে; ছোট্ট বালিকা হিসেবে, যে তার স্নিকার্স দেখাচ্ছে (*Mona Lolita*); সূর্যস্নানরত একজনের পাশে রাখা একটা বোতলের গায়ে লেবেল হিসেবে (*Just Another Product*); লেহন উপ-ভোগরতা (*Well, What do you Think she had to Smile About?*); লিওনার্দোর সঙ্গে বিছানায় (*Leo and Mona*)।

এসব কাজের অনেকগুলোই যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন। জর্জ কাস্টালডো *Misguided Mosteripeces* শিরোনামের পোস্টকার্ড সিরিজে (১৯৯৪) রঙ যোগ করেন, অন্য দিকে রিক মায়ারোভিৎস তাকে পরিণত করেন এক গরিলায় (*Mona Gorilla*, ১৯৭১) জ্যাক পয়রিয়ের *Dos de la Joconde* (১৯৯১, ৫১ নম্বর ছবিটি দেখুন) শিরোনামের কাজটিতে মোনালিসা শিল্পকর্মটির কাঠের প্যানেলের পেছন দিকটা দেখানো হয়েছে। যেখানে অদেখা ও কল্পিত পুণরুদ্ধারকর্মী তার অসমাপ্ত মধ্যাহ্নভোজ রেখেই চলে গেছে : *baguette, camembert*, এক বোতল ওয়াইন। ১৯৯০ সালে মিশরিয় শিল্পী আরিস আর্চিবভ চলচ্চিত্র পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গের বহির্বিশ্বের প্রাণী নিয়ে নির্মিত *E.T* নামক চলচ্চিত্রের ওই প্রাণীর সদৃশ্য ক'রে মোনালিসাকে আঁকেন। তার যথার্থ নামকরণ করা হয় *Mona Futura* এবং বড় আকৃতির মিশরিয় দুল পরিয়ে দেয়া হয় তার কানে। তিউনিসিয় শিল্পী আলিসা সেটাকেন্ট একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর আঁকা মোনালিসা পুরোপুরি তিউনিসিয় পোশাকে ও আরো বড় কানের দুলে সজ্জিত। ফরাসি চিত্রকর জঁ অ্যাকো বিভিন্ন শিল্পীর স্টাইল অনুসরণ ক'রে মোনালিসাকে আঁকেন, যাদের মধ্যে ছিলেন গগো, পিকাসো, মোদিগলিয়ানি ও লেগার। ১৯৮৫ তে গ্রেগ কনস্টানটিন তাঁর *লিওনার্দোর লস অ্যাঞ্জেলেস ভ্রমণ* নামক কার্টুন সিরিজে দেখিয়েছেন 'লিও এবং লিসা তাদের ভল্ভো গাড়িতে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' ২০০০ সালের এপ্রিলে লন্ডন শহরে সাচি প্রদর্শন করে

‘Ant Noises’ যা তাঁর আগের বিতর্কিত ‘Sensation’-এর একটি এনাগ্রাম ছিলো (এনাগ্রাম : একটি শব্দের অক্ষরগুলো নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বানানো, অনুবাদক)।^{৯০}

আরেকটি রেকর্ড গড়ার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় ফরাসি ইলেক্ট্রনিক পেইন্টার আরতুস পিক্সেলের এক ঘোষণায়। তিনি ২০০৩ সালে ১০০১টি মোনালিসা সংস্করণ তৈরি করবেন বলে ঘোষণা দেন। যার নাম হবে ‘ভিভা মোনালিসা!’ প্রদর্শনী।

পাঠক তাঁর ছবিগুলো WWW.arkonet.Fr/vivamonalisa/ এ দেখতে পারেন। ১৯৮৫ সালে তিনি এরকম উনিশটি মোনালিসা প্যারিসের ফোরাম ডে হল-এ উপস্থাপিত করেন। তাঁর মতে, তিনি এই ছবিটি বেছে নিয়েছেন, তার কারণ ‘এটা পৃথিবীর দুই অথবা তিনটি ব্যাপক পরিচিতি পাওয়া চিত্রকর্ম’।^{৯১}

কেউ ভাবতে পারে প্রশংসিত মাস্টারপিসগুলোর বিকৃতসাধনের ফলে বর্তমানে আর কাউকে শক্ দেয়া যায় না, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। ১৯৯৬ সালে লোকরোনার সন্নিহিতে কনজারভাতোই রিজিওনাল ডেল আফিশিতে একটা বিজ্ঞাপন ব্যবহার করা হয়েছিলো, যার নাম ছিলো *লা জোকোন্দে দান তু সে এতাত্* (‘মোনালিসা ভয়াবহ অবস্থাতে,’ ১৯৯৪)। সেখানে মোনালিসাকে ধূমপানরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে। এর ফলে রাজ্য প্রেসিডেন্টের অবস্থাও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। তরুণদের মধ্যে ধূমপানের আসক্তি বাড়তে এই মোনালিসা প্রভাব রাখবে তাই তিনি জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন পোস্টারটি সরাতে। স্বাভাবিকভাবেই জাদুঘর এবং পোস্টারটি আরো বেশি পরিচিতি পেয়ে যায়, যা তারা নিজেরাও আশা করে নি।^{৯২} ১৯৯৯ সালের এপ্রিল-মে’তে লন্ডনের হোয়াইট কিউব গ্যালারি জাপানি শিল্পী ইয়াসুমাখা মরিমুরা’র তিনটি নতুন কাজ উপস্থাপন করে। তাদের ঘোষণাপত্র মতে, এটা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসাকে মৌলিকভাবেই রূপান্তরিত করবে। সেইসব ছবির মধ্যে একটি ছবি ছিলো গর্ভবতী মোনালিসা (১৯৯৮, ৫৯ নম্বর ছবিটি দেখুন), আসল ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করলেও এক নগ্ন গর্ভবতী মেয়েকে ব্যবহার করা হয়েছিলো তাতে।

১৯৬০’র দশকে মোনালিসাকে নিয়ে ছবির সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় তিনশ’তে, এই তথ্যটি জানা যায় পৃথিবীর সবচাইতে বিখ্যাত জোকোন্দেবিদ জঁ মারগাতের মাধ্যমে।^{৯৩} অনুলিপি করা সৃষ্টি করার চেয়ে অনেক সহজ। এরকম কাজও ধীরে ধীরে শিল্প হয়ে ওঠে। আর লুভর হলো টেম্পেটের বিশাল এক

ডাটা ব্যাংক। সমালোচক বার্নার্ড বলেছেন, জাদুঘরগুলো অনেকটা গবাদিপশুর খামারের মতো।^{৪২} থিয়েরি দ্য দুভে দুশাম সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছেন, 'লুভর হলো মোনালিসা ব্যাংক। সব শিল্পীই, বিশেষ করে আঁভাগার্দরাও এই ব্যাংক থেকে ঋণ করেছে।'^{৪৩}

চিত্রকলার এস্টাবলিশমেন্টরা মোনালিসার বহুসংখ্যকতার ব্যাপারে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে নিশ্চুপ এবং উদ্ভিগ্নতার মাধ্যমে। লর্ন ক্যামবেলের রেনেসাঁ পোর্ট্রেটস্ (১৯৯০)-এ ২৬৬৭টি ছবির মধ্যে মোনালিসা ছিলো না। বার্লিংটন ম্যাগাজিনের এক সমালোচক লিখেছিলেন : 'এই বইটি হলো রেনেসাঁ পেইন্টিংয়ের একমাত্র বই যাতে মোনালিসার উল্লেখ নেই।'^{৪৪} মিউজিয়াম নিউজ নামের আর্ট-ম্যাগাজিন চিত্রকলা ব্যবহার করে নির্মিত বিজ্ঞাপন ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো।^{৪৫} সেই রকমই একটি বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়েছিলো মোনালিসা তার নাকে সান-ট্যান ক্রিম মেখে আছে অতিবেগুনী রশ্মির ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে।^{৪৬}

সেইসময় যারা বিজ্ঞাপন নির্মাণ করতো তাদের জন্যে ব্র্যান্ড নেমের অনুপস্থিতিই ছিলো 'শিল্পকলা' বৈশিষ্ট্য অর্জনের একমাত্র পথ। পপ আর্টিস্ট রসেনবার্গ দাবি করেন যে, 'টাইম স্কোয়ার হলো আমেরিকার মহান শিল্প কর্ম।'^{৪৭} সেই সময় জনসাধারণের মধ্যে এমন ধারণা গোঁড়ে বসেছিলো যে, সাধারণ জনগণ প্রয়োজনের চেয়ে বরং তাদের ইমেজের জন্যেই পণ্য কিনে থাকে। বিজ্ঞাপন স্ট্র্যাটেজিস্ট ফ্রেডরিক জেমসেন ২০০০ সালে এ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এটা হলো সত্যিকারের 'ফ্রয়েডিয়-মার্ক্সিয়'।^{৪৮} তারা যা বিক্রি করবে তার সাথে যৌনতার সংযোগ ঘটাতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলো : কেবলমাত্র কসমেটিক্স আর কাপড়চোপড়ই নয় বরং গাড়ি, কম্পিউটার এমনকি ঘাসকাটার যন্ত্রের বেলায়ও। বিক্রির জন্যে যখন পণ্যকে উপস্থাপন করা হয় তখন সেটাকে কামজ করা হয় : 'আপনি জিন্স কিনছেন না, কিনছেন যে মডেল এটাকে তার পাছায় জড়িয়ে বিজ্ঞাপন করেছে তাকে।'^{৪৯} বিজ্ঞাপন ওয়ালাদের দরকার চট করে চেনা যায় এমন প্রতীকের ব্যবহার করা, যতো বেশি বৈশ্বিক হবে ততোই ভালো। আর সেক্ষেত্রে মোনালিসা'র চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে। ১৯৯১ সালে এনথ্রপোলজিস্ট সাইন হাইওয়েল জানান যে, নেপালের পাহাড়ি এলাকায় কাজ করার সময় তিনি এক লজের দেয়ালে মোনালিসার অনুলিপি দেখেছেন। তিনি এমন দাবিকে বাতিল করে দেন যে, মহান শিল্প সাংস্কৃতিক সীমানাকে অতিক্রম করে। এক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করেন, সেই ছবির পাশেই ছিলো সুইডিশ গ্রুপ এ্যাবা, মাইকেল জ্যাকসন আর নেপালের রাজার ছবি।^{৫০}

বিজ্ঞাপন শিল্পে শিল্পকলার ব্যবহারের উদ্দেশ্য খুব সাদামাটা : পণ্যকে জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো। অবশ্য কিছু কিছু বিজ্ঞাপন নির্মাতার উদ্দেশ্য একটু মহৎও ছিলো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞাপন নির্মাতা আর্নেস্ট এলমো ক্যালকিনের কথা, যিনি ১৯২০'র দশকে বলেছিলেন, বিজ্ঞাপন-শিল্প 'লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে শিল্পকলাকে উন্মোচন করার সুযোগ তৈরি ক'রে দেয়।'^{৭১}

বিজ্ঞাপনে শিল্পকলার ব্যবহার প্রাথমিককালে নির্ভর করতো ব্যক্তিগত রুচির উপর। বৃটেনের পিয়ার্স সাবানের প্রস্তুতকারক টমাস জে ব্যারেট এক নতুন ধরনের প্রচারণা চালিয়েছিলেন। তিনি লন্ডনের প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় মঞ্চ অভিনেত্রী লিলি ল্যাংট্রিকে তাঁর পিয়ার্স সাবানের প্রচারণার জন্য রাজি করাতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর এই মহান অর্জনটি জন এভারেট মিলেইর বাবল্‌স (১৮৮৬)-কে ব্যবহার ক'রে অর্জিত হয়েছিলো। এই ছবিটাতে দেখানো হয়েছিলো এক কোঁকড়া চুলের সুন্দর বাচ্চাছেলে বসি করতে উদ্যত, সে চেয়ে আছে সাবানের বুদবুদের দিকে। মিলেই যদিও বৃটেনে খুব জনপ্রিয় এবং সফল ছিলেন তিনিও নিজের কাজের ব্যাপক প্রচারণার লোভনীয় ব্যাপারটাকে এড়াতে পারেন নি। কিন্তু শিল্পজগৎ থেকে তিনি শত্রুভাবাপন্ন প্রতিক্রিয়া লাভ করেন। এমনকি মিলেইর মৃত্যুর তিনবছর পরও দ্য টাইম পত্রিকায় এ নিয়ে বিতর্ক চলেছিলো।^{৭২} কিন্তু পিয়ার্স সোপ বাবল্‌সকে আজকের দিনে বিখ্যাত ক'রে তুলেছে, আর ছবিটাও পোস্টকার্ড আর জিগ্‌শ' পাজলে ঠাই পেয়েছে।^{৭৩}

ব্যারেট ছিলেন অগ্রপথিক। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও ১৯৩০'র আগ পর্যন্ত বিজ্ঞাপন শিল্পে দৃশ্যকল্প (ভিজুয়াল) থেকে লিখিত শব্দের উপরেই বেশি জোর দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু ছবি স্বাক্ষার শব্দের চেয়ে বেশি কথা বলতে পারে এই বোধটি সেইসময় থেকেই উন্মোচন লাভ করে।^{৭৪} বিজ্ঞাপনওয়ালা প্রায়শই রাজনীতিবিদদের মতো স্ববিরোধী বার্তা দিয়ে থাকে : পণ্যটি নতুন, আধুনিক, তার চেয়েও বড় কথা অন্যসব কিছুর চেয়ে ভালো।

১৯৬০-এর দশক থেকে, যখন বিজ্ঞাপনশিল্প বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন থেকেই বিজ্ঞাপন নির্মাতাদের কাছে প্রিয় চিত্রকর ছিলেন সুপরিচিত শিল্পীরাই : ম্যাগারিত, পিকাসো এবং দালি।^{৭৫} তবে পুরনো মাস্টারদেরকেও ব্যবহার করা হতো : মাইকেলএ্যাঞ্জেলোর ডেভিড লিভাইসের জিপ্স পরেছে। এরকম নানান উদাহরণ দেয়া যাবে।

মোনালিসা বিজ্ঞাপন নির্মাতাদের অনেক প্যারামিটারের সাথেই খাপ খেয়ে গিয়েছিলো। যদিও বিষয়টা নতুন কিছু নয়। এটা নির্ধারিত উচ্চগুণাগুণ সম্পন্ন কিছু উপস্থাপিত করতো, যেহেতু এটা স্বয়ং উচ্চসংস্কৃতির প্রতিভূ হয়ে উঠেছে।

দুশাম এবং অন্যেরা একদিন যে বিকৃত সাধন করে আমোদিত হয়েছিলেন, বিজ্ঞাপন নির্মাতারাও সেই পথ অনুসরণ করে এতে আধুনিকতা সংযোগ করে। আর যেহেতু ছবিটা সীমাহীনভাবেই ব্যাপক পরিচিতিসম্পন্ন, তাই অনিবার্যভাবেই মোনালিসা বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়েছে বার বার।

১৯১১ সালে মোনালিসা চুরির আগে খুব কম বিজ্ঞাপনেই এর ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। ১৯১০ সালে মিলান কেন্দ্রিক মাসোনি এ্যান্ড মেরোনির চামড়ার বেটের বিজ্ঞানে এর ব্যবহার হয়েছিলো।^{৭৬}

চুরির ঘটনার পর থেকেই বিজ্ঞাপনে মোনালিসার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তুর (১৯১১)-এর এক কাপড়ের দোকান এবং ইতালির গিওকোন্দা বোতলজাত পানি (১৯১৫)-এর বিজ্ঞাপনে মোনাকে ব্যবহার করা হয়।

১৯৬০-এর দশক থেকে মোনালিসাকে এয়ার ইন্ডিয়ায় প্যারিসগামী ফ্লাইটে (১৯৬২), চকোলেটে, শ্যাম্পেনে, পিটারসন রাম-এ (১৯৮৬), স্পেনিশ অরেঞ্জপানীয় নারায়ানাদা কামেরা-তে (১৯৯০), মোনালিসা উইগ-এ (আমেরিকা, ১৯৬৬) ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়।

মাদ নামের বৃটেনের সবচাইতে বড় কসমেটিক প্রসাধনী বিক্রেতা মোনালিসাকে উপস্থাপিত করে মুখে ফেসিয়াল ক্রিম মাখা অবস্থায়, আর ছবিটার নিচে ক্যাপশনে লিখে দেয়া হয়, 'সে যে হাসছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। সে জানে চমৎকার ত্বকের গোপন রহস্যটা কি।' মোনার ছবি ব্যবহার করা হয়েছিলো সুইস চকোলেট জুস-এ।^{৭৭} এমনকি জরায়ুর অভ্যন্তরের একটি ডিভাইসের পণ্যে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। পণ্যটির নাম মোনালিসা-সিইউ ৩৭৫।^{৭৮}

বিজ্ঞাপনে মোনালিসাকে কতোবার ব্যবহার করা হয়েছে সেটা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। জ্যামারগাতের আনুমানিক হিসেবে ১৯৭০'র দশকে প্রতি বছর তেইশবার ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৮০'র দশকে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় দ্বিগুণে আর ১৯৯০'র দশকে তা আরো বেড়ে দাঁড়ায় চূয়ান্নতে।

চুরির ঘটনার পরপর বিভিন্ন জিনিসের সাথে মোনালিসাকে যুক্ত করে দেয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। এটার শুরু হয় মোনালিসা পুতুলের মধ্য দিয়ে (১.৭৫ ফ্রাঁ মূল্যের) যা পরবর্তীতে ১৯১১ সালের ইলাস্ট্রেশন-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় বছরের সেরা খেলনা হিসেবে বিবেচিত হয়। মোনালিসা'র উদ্ধারের পর কেক-টিন-এর বিজ্ঞাপনে মোনাকে ব্যবহার করা হয়। কভারের ছবিতে মোনাকে দুটো বাচ্চা কোলে নেয়া অবস্থায় দেখানো হয়, আর একটি বাচ্চাকে দুধপান করাতেও দেখানো হয় সেখানে। ছবির ক্যাপশনে লেখা হয় 'নয় মাস অনুপস্থিতির পর জোকোন্দে ফিরে এসেছে'।^{৭৯} মোনাকে এতো বেশি ব্যবহার করা শুরু হয়ে যায় যে, সুগন্ধী প্রসাধনেও তার ব্যবহার বাদ যায় নি।^{৮০}

মোনালিসা কার্টুনিস্টদের কাছেও সহজ একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে। দ্য এমিস দ্য মোনালিসা নামের স্বঘোষিত আন্তর্জাতিক জোকোন্দে-ভক্ত সংগঠন মোনালিসা'র কার্টুনের সংখ্যা তালিকাবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়েছিলো।^{৬১}

কিন্তু বিশ্বব্যাপী এই কর্মযজ্ঞ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট না পাওয়াতে তাদের প্রচেষ্টাটি থেমে যায়। তবে সাম্প্রতিককালে আমাদের হাতে যে ডাটা রয়েছে তাতে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে মাত্র পনেরো কি বিশটি কার্টুন মোনাকে নিয়ে করা হয়েছিলো। ১৯৪৫-৬৫ পর্যন্ত সংখ্যা খুব একটা বাড়ে নি। কিন্তু তার পরই বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছরে সীমাহীন সংখ্যক কার্টুন আঁকা হয় মোনাকে নিয়ে।^{৬২}

প্রায় সবাইকেই যেনো 'মোনালাইজ' করা হয়েছে : জ্যাকি ওনাসিস থেকে স্টালিন, টনি ব্র্যয়ার পর্যন্ত। হিলারি ক্লিনটন, মেক্সিকান প্রেসিডেন্ট কার্লোস সালিনাস, আর ইতালির প্রায় সব প্রধানমন্ত্রী, সর্বশেষ সিলভিও বারলুসকোনি অবধি।^{৬৩} বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীদের থেকে পৃথিবীর প্রায় সব রাজা-রাণী 'মোনালাইজ' হয়েছেন। চলচ্চিত্র তারকারাও বাদ যায় নি এ থেকে।

এমনকি মাও সে তুংয়ের মতো ঐতিহাসিক রাজনৈতিক চরিত্রকেও বিভিন্নভাবে 'মোনালাইজ' করা হয়েছে ১৯৭৯ সালের দিকে।

নিউইয়র্কার পত্রিকা মনিকা লিউনিক্সিকে মোনালিসা হিসেবে উপস্থাপন করেছিলো ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়।

অনেক ফরাসি রাজনীতিবিদও একই রকম ঘটনার শিকার হয়েছেন। আন্দ্রে মার্লো এবং অবশ্যই শার্ল দ্য গল।^{৬৪} এমনকি মিশেল রকর্দ, এডিথ ফ্রেমোয়া, রেমন্ড বেয়ার আর এদুয়ার্দ বালাদুরও 'মোনালাইজ' হয়েছেন।^{৬৫}

মোনালিসা'র ওয়াশিংটন ভ্রমণের পরপর ডাকটিকেট সংগ্রহকারীদের কাছেও তার কদর বেড়ে যায়, যদিও ১৯৫২ সালে পশ্চিম জার্মানিই প্রথম মোনার উপর ডাক টিকেট তৈরি করেছিলো। এরপরই বাকিরা মোনার ওপরে ডাক টিকেট বের করতে শুরু করে।^{৬৬}

ডাক টিকেটের পরই পোস্টকার্ডে মোনাকে দেখা যায়। বিভিন্নভাবে মোনাকে পোস্টকার্ডে ব্যবহার করা হতে থাকে। তবে বেশির ভাগ পোস্টকার্ডগুলোই ছিলো হাস্যরসাত্মক। ১৯৯২ সালে বৃটিশ কার্টুনিস্ট স্টিভ বেস্ট শত বছরের প্রহেলিকা আর রহস্যের সমাধান দেন নিজের মতো করে। তিনি তাঁর কার্টুনের ক্যাপশানে লেখেন : 'মোনা হাসার চেষ্টা করছে না, সে আসলে তার নিঃশব্দ পাদটা লিওনার্দোর কাছে পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষা করছে।'।

মোনালিসাকে অসংখ্য ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যঙ্গ পত্রিকা *I' Assisette au beurre*-ই প্রথম তাকে কভারে ব্যবহার করার দাবিটি করতে পারে। ১৯০২ সালে তারা মোনাকে তাদের পত্রিকার কভারে ব্যবহার করে। এরপর থেকে ইতালিয়, ফরাসি, ব্রিটিশ, আমেরিকান, প্রভৃতি দেশের পত্র-পত্রিকায় কভারে মোনাকে ব্যবহার করা হয়। ৮০'র দশকের পরে এই প্রবণতাটি বেড়ে যায়।

১৯১২ সালে মোনালিসা নামে দুটো গেমের অস্তিত্বও পাওয়া যায়। আর ৫০'র দশকের পর এরকম গেমের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পঞ্চাশে। কিছু কিছু গেম সাধারণ বোর্ড গেম, কিন্তু অনেকগুলোই সুয়েডো-সাইকোলজিক্যাল টেস্ট গেম ছিলো (মোনালিসার জন্য একটা টুপি নির্বাচন করতে বলার মধ্য দিয়ে বাছাইকারীর যৌনতা সম্পর্কে জানা)। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গেম শিক্ষামূলকও ছিলো।

মোনালিসা পর্দার কাপড় দেখা যায় সায়গনে, ১৯৯৫ সালে। ১৯৭৬ সালে এক আমেরিকান বার্ন-পেইন্টার তাকে একটি গোলাঘরে আঁকেন।^{৬৭} আর কুয়েতি টেলিফোন কোম্পানির টেলিফোনের ডায়ালে তার ছবি দেখতে পাওয়া গেছে ১৯৮৩ সালে। আর্মেনিয়ার এক প্রসিদ্ধ চার্চে মোনালিসার ছবি ঝুলিয়ে রাখতে দেখা গেছে। কর্তৃপক্ষ তাকে ভুলবশত ম্যাডোনা ভেবেছে হয়তো।^{৬৮}

প্রিন্সেস ডায়নার মৃত্যুর পর জনসাধারণের পুষ্পার্ঘ্য দানের মধ্যে মোনালিসার একটি পোস্টকার্ড পাওয়া গেছে।^{৬৯}

১৯৮৩ সালে জাপানি শিল্পী তাদাহিকো ওগাওয়া টোস্ট দিয়ে মোনালিসার অনুলিপি তৈরি করেন, তিনি এর নাম দেন মোনা ইন টোস্ট।^{৭০} মিউনিখ কেন্দ্রিক শিল্পী ক্রিস্টিনা ডেভিড ৩৫ পাউন্ডের বিনিময়ে আপনার আঙুলের নখে মোনালিসা এঁকে দেবেন, যদি আপনি চান।^{৭১} 'ল্যান্ড-আর্টিস্ট' উইল এ্যাশফোর্ড ১৯৮৯ সালে বিশাল এক মোনালিসা আঁকেন (৬১ মিটার×৪৩ মিটার) ক্যালিফোর্নিয়ার বিস্তীর্ণ ঘাসের প্রান্তরে ঘাসের সাহায্যে।^{৭২}

মোনালিসা ফ্যাশ্যাদেবকেও আকর্ষণ করে। ১৯৮১ সালে লিও মেকুসা নামের এক ব্যক্তিকে নিয়ে সবাই বেশ মেতে ওঠে কারণ সে মোনার প্রেমে পড়েছিলো। সে ব্যবসাবাগিজ্য সব বেঁচে দিয়ে লুভার মিউজিয়ামের গার্ডের চাকরি নিয়ে নেয় এই আশায় যে, প্রতিদিন মোনাকে দেখতে পাবে। বিশেষ করে একান্তে। তার এই মোনা মোহের কথা সে তার স্ত্রীকে বলেছিলো। তার স্ত্রী অ্যাঞ্জেলা সৌখিন এক চিত্রশিল্পী ছিলো। নিজের স্বামীকে টিটকারি মারার জন্যে নাকি স্বামীর রোগ তার মধ্যেও গঁড়ে বসার কারণে, সে মোনালিসার

বিভিন্ন ভঙ্গীতে চল্লিশটিরও বেশি ছবি এঁকে ফেলেছিলো। সেইসব ছবির মধ্যে একটি ছিলো তার স্বামী লিও'র সাথে মোনা। লিও লুভরের গার্ডের পোশাক পরে মোনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৯৭ সালের ৭ই নভেম্বরে তার ছবিগুলোর একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যার নাম দেয়া হয় 'মোনা মারি, লা জোকোন্দে এত্ মোয়ে'।^{১০}

ফরাসি 'পারফর্মেন্স আর্টিস্ট' গুরলানের কাণ্ডটিকে ভয়ংকরই বলা যায়। ১৯৯০ সালে সে মোনালিসার মতো যাতে নিজেকে দেখায় সেজন্যে প্রাস্টিক সার্জারি করিয়ে ছিলো। তার অপারেশনের ভিডিও রেকর্ড সম্প্রচার করার ইচ্ছে ছিলো, তাও আবার লাইভ এবং সেটা বিশ্বব্যাপী। কিন্তু প্যারিসের কনটেম্পোরারি আর্টস ফেস্টিভ্যালের আয়োজকরা এতে বাধ সাধে।^{১১}

যদি নিউইয়র্ক টাইম'র কথা সত্যি হয় তবে গুরলানের অনেক আগে ১৯৭৫ সালের ৬ই জানুয়ারিতে এক জাপানি মহিলা রিকো ইশি মোনালিসার মতো হবার জন্য প্রাস্টিক সার্জারি করিয়ে ছিলেন।

অসংখ্য চিঠি আর কবিতা কেবল 'মোনালিসা, লুভর, প্যারিস' ঠিকানায় চলে আসে। ১৯৯৪ সালে ইংল্যান্ডের ম্যাজেস্টিজ প্রিজন থেকে একটি চিঠি পাঠানো হয় মোনালিসার কাছে। চিঠিটার শুরু হয়, 'প্রিয় মোনা, তোমার বাবা বলছি....'^{১২} কেউ কেউ তার কাছে নিজেদের খবর জানিয়ে পোস্টকার্ড নিখে পাঠায় যেনো সে তাদের বহু দিনের চেনা বন্ধু।

মোনালিসার পরিচয় উদ্‌ঘাটন অথবা তার মধ্যে লুকিয়ে রাখা গুণ কোড উদ্ধার করা হয়েছে বলে অনেকেই দাবি করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ড্যান ব্রাউনের আলোড়নসৃষ্টিকারী উপন্যাস *দ্য দা ভিক্স কোড-এ* এরকম অনেক গুণ কোডের কথা উল্লেখ করা হলে ব্যাপারটি সারা বিশ্বে নতুন করে মোনালিসা উন্মাদনা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে (অনুবাদক)। আধুনিক বিশ্বে গোয়েন্দারা হলো গল্প উপন্যাসের নায়ক। তাদের আগে, রূপকথা আর মিথলজিতে যে ধাঁধার সমাধান করতো সে-ই ছিলো নায়ক। মোনালিসা, আমরা দেখেছি, সেও অনেক রহস্যের সৃষ্টি করেছে। আর যে ব্যক্তি দাবি করে সে এসব রহস্যের কোনো একটি সমাধান করেছে সঙ্গে সঙ্গেই সে সবার নজরে চলে আসে, বিখ্যাত হয়ে ওঠে। আর এখন পর্যন্ত এ রকম ঘটনা নিয়মিত বিরতি দিয়েই ঘটে যাচ্ছে 'হাসির রহস্য উদ্‌ঘাটিত' এই শিরোনামে।

মোনালিসা রহস্যের একটি উৎস হলো এর সিটারের পরিচয় (প্রথম অধ্যায় দেখুন) আমার অভিমত হলো, এ ব্যাপারে এতো অপর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে যে, কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না। আমরা কখনই জানতে পারি

নি—পারবোও না মনে হয়—তারপরও লোকে অনুসন্ধান বন্ধ করবে না জানি।

একটি জনপ্রিয় তত্ত্ব হলো মোনালিসা আসলে লিওনার্দোর নিজেরই ছবি। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এমন দাবি করা শুরু হয়, আর সেটা বর্তমানেও চলছে। ১৯১৩ সালে পেইন্টার মরিস ভিউয়েল দাবি করেন, চেহারার নিচের দিকের অংশটি মহিলার, কিন্তু উপরের অংশটি পুরুষের। যেকোনো পুরুষের নয় : 'সেই চাহনিটা হলো ভিক্টর নিজেরই।' ^{৭৬} ১৯৫২ সালে লুভরের ল্যাবরেটরির পরিচালক মাদাম ম্যাগদালিন আওয়ার্স ছবিটা এক্সরে করালে এই ধরনের ধারণা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ^{৭৭}

লিওনার্দো'র পাঁচশত বছর জন্মপূর্তির বছরে চিত্রসমালোচক জর্জ ইসারলো দাবি করেন যে, মোনালিসা ছিলেন ট্রান্সভেস্টাইট বা উভলিঙ্গ। কলেজের এক নাটকে এক ছেলেকে মেয়ের পোশাকে অভিনয় করতে দেখে তিনি এমন সিদ্ধান্তে পৌছান। ^{৭৮} তিনি তাঁর এই মতামতকে একটু বইতে উপস্থাপন করেন ১৯৫৬ সালে। ^{৭৯} ইসারলোর দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালে নিউইয়র্ক জার্নাল'র *Sexology* মোনালিসার কোকড়ানো চুলে এবং দেখতে অল্পবয়সী মেয়েলী পুরুষের মতো ক'রে একটা ছবি ছাপায়। ১৯৮৬ সালে আমেরিকার নিউজার্সির বেল ল্যাবরেটরির কম্পিউটার আর্ট সাইন্টিস্ট লিলিয়ান শোয়ার্জ প্রমাণ সহকারে উপস্থিত করেন যে, মোনালিসা হলো লিওনার্দোর নিজেরই তরুণ বয়সের ছবি। ^{৮০} এই খবরটি ডেইলি টেলিগ্রাফ রিপোর্ট করে বড়বড় শিরোনাম সহকারে, 'মোনালিসা লিওনার্দোরই প্রতিচ্ছবি' (১৯ ডিসেম্বর ১৯৮৬)। প্রখ্যাত আর্ট হিস্টোরিয়ান এবং ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল গ্যালারির কিউরেটর প্রফেসর এস জে ফ্রিডবার্গ তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত ক'রে বলেছিলেন, 'মোনালিসা এইসব বাজে মন্তব্য থেকে বেঁচে থাকবে।' ^{৮১}

মোনালিসা হয়ে উঠলো একটি খেলনা যা নিয়ে যে-কেউ খেলতে পারে। ফরাসি-কানাডিয় শিল্পী সুজান গিরো ১৯৯৩ সালে মোনালিসার হাসিটিকে প্রসারিত ক'রে আঁকেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো লিওনার্দোর সমকামীতাকে ইঙ্গিত করা। প্যারিসে তাঁর এই ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছিলো। ^{৮২}

৭০'র দশকে ফটোকপি মেশিন দিয়ে কোনো ছবিকে বিকৃত করা যেতো, কিন্তু সেগুলো খুব একটা ভালো হতো না। তবে কম্পিউটার আসার পর বিশেষ ক'রে 'ইমেজ মরফিং' টেকনিক প্রয়োগ ক'রে ইচ্ছেমতো কোনো ছবিকে বিকৃত বা রূপান্তরিত করা খুব সহজ হয়ে ওঠে। এই টেকনিক প্রয়োগ ক'রে কোনো অবয়বকে 'ঘোরানো' পর্যন্ত যায়। লিওনার্দোর মোনালিসাকে এভাবেই মুখোমুখি অবস্থায় আনা হলো। ^{৮৩}

সান ডিয়েগোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন আসমুস কম্পিউটার ব্যবহার ক'রে দাবি করেন যে, অরিজিন্যালি মোনালিসা একটা নেক্লেস পরেছিলেন।^{৮৪} ১৯৯২ সালে এক ফরাসি আর্ট স্টুডেন্ট কম্পিউটার ব্যবহার ক'রে মোনালিসাকে 'সরিয়ে' দিয়ে লিওনার্দোকে একজন ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টারে রূপান্তরিত ক'রে ফেলে। সে এজন্যে পুরস্কারও জিতে নেয়।^{৮৫} এরকম কাজ অবশ্য তারও আগে, ১৯৬৫ সালে ইতালিয় শিল্পী সুইদো বারাসি ক'রে ছিলেন। তিনি মোনালিসার পেছনের ভূ-দৃশ্য উদ্ধাও ক'রে এঁকেছিলেন। ছবিটির শিরোনাম দেয়া হয়েছিলো, ল্যান্ডস্কেপবিহীন মোনালিসা।

বিজ্ঞাপনে মোনালিসা'র ব্যবহারের অনেক আগে মোনালিসা উন্মাদনার শুরু হয়েছিলো। ১৯৫৯ সালে স্বঘোষিত 'জোকোন্দেলোজি' জ্যঁ মারগাত একটি ট্রিটিজ অব জোকোন্দোলজি প্রকাশ করেন, যাতে প্রথমবারের মতো বিভিন্ন ধরনের মোনালিসা সংগ্রহ করা হয়েছিলো।^{৮৬} ১৯৫৭ সালে হেনরি গ্রুয়েল এবং জ্যঁ সুইয়ো এক ফরাসি টিভি ডকুমেন্টারি তৈরি করেন মোনালিসা প্রীতিকে ব্যঙ্গ ক'রে : চৌদ্দ মিনিট সেন্সর ক'রে সেটা সম্প্রচার করা হয়েছিলো। আর এটাকে গণমাধ্যমে একটি মাস্টারপিসকে অশ্রদ্ধা করার প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।^{৮৭} লুভরের বাইরে তিনটি বিকৃত মোনালিসার বিশাল ছবি লাগানোর সময় গুটিং ইউনিটের ওপর ক্রোধান্বিত পর্যটকরা চড়াও হয়েছিলো।^{৮৮} তারপরও এই ডকুমেন্টটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার জিতে নিয়েছিলো।

১৯৯০ সালে ইতালি বিশ্বকাপে আয়োজকরা টুর্নামেন্টের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন মোনাকে। তার হাতে অবশ্য একটা ফুটবল ধরিয়ে দেয়া হয়েছিলো। বৃটিশ টিভি চ্যানেল চ্যানেল ফাইভ তাদের নারীর চরমপুলক বিষয়ক এক অনুষ্ঠানে মোনালিসার ছবি ব্যবহার করে। মোনালিসা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও অংশ নেয়। তার হাসিকে ফরাসি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের কাছে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস গোপন সংকেত হিসেবে ব্যবহার করে : 'লা জোকোন্দে, এদ সোঁয়া সুরি' (জোকোন্দে হেসে যাচ্ছে)। পরবর্তীতে ফরাসি ফিল্মব্যাপ কালচারাল ওয়ার্কাসরা (সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, প্রমুখ) তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লুভরের মোনালিসার পাশে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। কেউ কেউ ছবিটার পাশে নিজেকে শেকলে বেঁধে রাখে।^{৮৯} ১৯৯৫ সালে ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীরা মোনালিসার প্রতিকৃতি ব্যবহার করে সরকারের কৃচ্ছতা নীতির বিরুদ্ধে।^{৯০} সেক্স ইন্ডাস্ট্রিও মোনালিসাকে বাদ দেয় নি। ১৯৫৭ সালে প্যারিসের এক নাইটক্লাব একটা শোয়ের নাম দেয় জোকোন্দে ফলি, যাতে

নর্তকী মোনালিসার পোশাক পরে নাচতে শুরু করে একে একে সব পোশাক খুলে ফেলে।^{১১} একটা ওয়েবসাইট আছে যেখানে মোনালিসার সার্ভিস পাবার কথা বলা হয়েছে; সে ১৯৭০ সালে জন্মেছে, বড় হয়েছে ওয়াশিংটনের টাকোমা'তে : 'এই অনিন্দ্য সুন্দরীর হাসিতে কোনো রহস্যময়তা নেই—সে যৌন সঙ্গমের কথাই ভাবছে...এক দক্ষ যৌনসঙ্গী সে, তার সাথে দারুণ সঙ্গম করতে সক্ষম পুরুষের জন্য অপেক্ষা করছে'।^{১২}

তথাকথিত 'রহস্যময় হাসি'—যেমনটি আমরা দেখেছি, সেটা উনিশ শতকীয় আবিষ্কার, সেই হাসি বিংশ শতাব্দীর শিল্প ইতিহাসবেত্তা আর সমালোচকদের বিষয় না হয়ে বিজ্ঞানের মানুষদের বিষয় হয়ে উঠলো। এই প্রবণতা খুব সম্ভব ১৯৫৫ সালে শুরু হয়েছিলো যখন জেনোয়ার এক দৈনিক পত্রিকা রিপোর্ট করে, স্থানীয় এক ডেন্টিস্ট নাকি বলেছেন, মোনালিসার স্মিত হাসিটির আসল কারণ দাঁতের ব্যথা। একই বছর, 'লন্ডনের একজন সমালোচক' ঘোষণা দেন যে, ১৯৫৯ সালে প্রখ্যাত লিওনার্দোয়ান ডঃ কেনেথ ডি কিয়েলের ধারণা মোনালিসা গর্ভবতী ছিলো। যারা গর্ভবতী মহিলাদের বসার ভঙ্গী ভালো করে লক্ষ্য করে তারা এটা বুঝতে পারবে।^{১৩} থায়রয়েড গ্রান্ডের স্কীতির জন্যে ঘাড়টা ভরাট হয়ে গেছে। রহস্যময়তা আর প্রহেলিকা তো অনেক দূরের কথা, সে আসলে গর্ভবতী হয়ে তৃপ্তির হাসি হাসছে।^{১৪} তাঁর বক্তব্য হলো 'লিওনার্দো মাতৃত্বের আদর্শ ছবিটি এঁকেছেন'।^{১৫}

ডঃ এতিয়ে সেইগরে ১৯৬২ সালে আরো কঠিন কথা বলেছেন : যদিও 'সাধারণ দৃষ্টিতে মোনালিসা একজন নারী, তবে এটা পরিষ্কার যে, তার চোখ ট্যারা'।^{১৬} ডেনমার্কের মুখাবয়বের সার্জন ড. এফ বেকার ক্রিস্চেনসেনের মতে হাসির কারণ হলো মুখের মাংসপেশীর একটি রোগ।^{১৭} ১৯৭৫ সালে এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট তিনি লুভরে পাঠান যার শিরোনাম ছিলো, 'মোনালিসার রহস্যময় হাসি,' একই নামে তিনি একটি জার্নালও প্রকাশ করেন।^{১৮} ডঃ নিয়েলসন দাবি করেন, লিওনার্দো একজন নিউরোটিক ছিলেন, যিনি নিজের মায়ের হাসিটি মোনালিসার মুখে এঁটে দিয়েছেন—ঠিক একই কথা পয়ষটি বছর আগে সিগমুন্ড ফ্রয়েডও লিখে গিয়েছিলেন।

চিকিৎসাবিদদের আগ্রহ যতোই বাড়তে লাগলো মোনালিসার স্বাস্থ্যও ততোই খারাপ হতে শুরু করলো। ১৯৮৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ফেসিয়াল বিশেষজ্ঞ ডঃ কেডাল এ্যাডোরের মতে লিওনার্দো কখনই মোনালিসা আঁকতে গিয়ে শেষ করতে পারেন নি, তার কারণ 'ক্রমাগত চোখের পলক ফেলা'র রোগটির জন্য।^{১৯}

পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারতো। ১৯৯১ সালে লিওঁ'র প্রফেসর জ্যাক কমতের দিকে সংবাদপত্রের মনোযোগ আকর্ষিত হলো : মোনালিসা ছিলো *hemiplegic* (মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতজনিত রোগ); তার মস্তিষ্কের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তার ডান হাত এবং ডান কাঁধও প্যারালাইজড হয়ে যাওয়ার জন্যেই সে এভাবে বসেছে, এছাড়া তার উপায়ও ছিলো না।^{১০১}

ডেন্টিস্টরা আবারো পিছু নিলো। ১৯৯২ সালে এক দাঁতের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জোসেফাই বোরকোঙ্কি অভিমত দেন যে, যাদের সামনের দাঁত পড়ে গেছে তারাই মোনালিসার মতো হাসে, এটা অতি সাধারণ ব্যাপার। কোনো রহস্যের হাসি নয়, বরং সামনের দাঁতের অনুপস্থিতির ফলাফল এটি।^{১০২}

হতে পারে হাসিটির উৎস হলো দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার একঘেয়েমিজনিত (কয়েক বছরেরও হতে পারে)। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে ইতালিয়ান ডাক্তার ফিলিপ্পো সুরানো আবিষ্কার করেন, মোনালিসার রহস্যময় হাসিটির কারণ হলো একধরনের রোগ, যাতে রোগী মনের অজান্তে বা ঘুমের ঘোরে নিজের দাঁত কামড়ে থাকেন।^{১০৩}

হয়তো এসব কিছুতেই অল্পবিস্তর সত্য রয়েছে। দাঁতের চিকিৎসাবিজ্ঞান ষোড়শ শতাব্দীতে খুব একটা উন্নত পর্যায়ে ছিলো না। খুব কম লোকেরই দাঁত ঝকঝকে সাদা ছিলো—যার কারণে খুব কম ছবিতেই তখন দাঁত দেখা যেতো। হয়তো লিসার বেলাতেও তাই ঘটেছে।^{১০৪}

ইন্টারনেটের দ্রুত বর্ধনশীলতার যুগে অবশ্যম্ভাবীভাবেই মোনালিসাও সেখানে ঠাই পেয়েছে। WWW.monalisamania.com নামের একটি ওয়েবসাইট দর্শকের কাছে 'মোনালিসা তত্ত্ব প্রদান করুন' বলে আহ্বান জানায়। এরকমই মোনালিসা ওয়েবসাইটে একজন ১৯৯৯ সালে পাঠায় নিচের লেখাটি :

এক সন্ধ্যায় আমি আমার নতুন মোনালিসা ডেস্কটপ ব্যাক গ্রাউন্ডের দিকে সম্রমের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম, তখন আমার কাছে মনে হলো তার সাথে হলিউডের চিত্র তারকা মাইকেল ডগলাসের অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে...সে হয়তো জানে প্রাস্টিক সার্জারি করে তার (মোনা) মতো চেহারা করতে পারলে সেটা তার ক্যারিয়ারের সাহায্যে আসবে।^{১০৫}

অন্য অনেকের মতো আমিও প্রায়শই ভাবি, 'কেন সে?' এটাই আমার মনে হয় একমাত্র রহস্য যা সমাধান করা যায়। এটা কোনো আধ্যাত্মিক সমস্যা নয়। এতে শিল্প অথবা মানব হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করারও দরকার হবে না। এটা ঐতিহাসিক সমাধান, যা ইতিহাসবেত্তাদের অতি সাধারণ পদ্ধতি ব্যবহার করেই সমাধান করা যায় : প্রমাণ বা আলামত হিসেব করে সেগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আর কি। এতে খুব একটা বিশেষজ্ঞের জ্ঞানেরও প্রয়োজন নেই।

মোনালিসা কেন বিখ্যাত হয়ে উঠলো এই প্রশ্ন করা শুরু হয় তার খ্যাতির বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এই ধারণা গঠনের মধ্য দিয়ে। কোনো একক কারণ অথবা ব্যাখ্যা আমাদেরকে যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ উত্তর দিতে পারে না। লিওনার্দোর আঁকা বলে এটা একটি বিরাট ব্যাপার, সন্দেহ নেই। কিন্তু লুকরেজিয়ান ক্রিভেল্লি, জিনার্ভা দ্য বেঞ্চি এবং সিসিলিয়া গ্যালারিনি—এরা সবাই লিসা গেরার্দিনির চেয়েও বেশি সুন্দরী ছিলো (নিদেনপক্ষে সৌন্দর্যের প্রথাগত হিসেবে)—এদের ছবিও লিওনার্দো আঁকেছেন। কিন্তু বিখ্যাত হাসিটি জুটলো কেবল মোনালিসার বেলায়। ১৯১১ সালের চুরির ঘটনাটি মোনালিসাকে একটি গ্রহণযোগ্য পরিচিতি দিয়েছিলো সত্যি, কিন্তু অন্য অনেক ছবিই তো চুরি হয়েছে, সেগুলোতো তেমন খ্যাতি পায় নি। বিজ্ঞাপনে এর ব্যবহারও খ্যাতির একটি কারণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু বিজ্ঞাপন নির্মাতারা তো ছবিটা বিখ্যাত হয়ে না থাকলে ব্যবহারই করতো না। তার মানে, ছবিটা আগে বিখ্যাত হয়েছে, বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়েছে পরে। আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না, মোনালিসাকে লিওনার্দোর অনেক সমসাময়িক শিল্পীও মাস্টারপিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এঁদের মধ্যে রাফায়েল আর ভাসারিও আছেন। খুব কম ছবিই ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুলিপি করা হয়েছে। শিল্পীরা অনেক আগেই জানতো ছবিটা বিশেষ কিছু, আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের সার্টিফিকেট দেবার আগেই।

কোনো কিছুর কারণই একক কিছু হতে পারে না। আজকে মোনালিসার যে অবস্থান সেটা ইতিহাসের পথপরিক্রমায় অসংখ্য লোকের অবদানে নির্মিত হয়েছে : লিওনার্দো, যিনি ছবিটা আঁকেছেন; ফ্রান্সেসকো গিওকোন্দা, যে ছবিটা আঁকতে তাঁকে নিয়োগ দিয়েছিলো, রাজা প্রথম ফ্রান্সোয়া; যিনি লিওনার্দোকে ফ্রান্সে নিয়ে আসেন। তারপর আসে তাদের কথা, যারা লুভরকে একটি রাজ প্রাসাদ থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাদুঘরে রূপান্তরিত করেছে; যেসব বুদ্ধিজীবী মোনালিসাকে নিয়ে লিখেছেন, রহস্যময় হাসির ধারণার প্রবর্তন করেছেন,

তাদের কথাও এসে যায়। ভিসেনজো পেরুজ্জিয়াও অবদান রেখেছে ছবিটা চুরি ক'রে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে। আঁদ্রে মার্লো আর শার্ল দ্য গল ছবিটাকে ফরাসি সাংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসেবে অভিহিত করেও বিশাল ভূমিকা রেখেছেন। যেসব পত্রিকা তাকে নিয়ে লিখেছে, যারা তাকে নিয়ে গান গেয়েছে, আর যারা তাকে বিকৃত ক'রে মজা পেয়েছে, সবাই তাকে এই অবস্থানে আসতে কম বেশি সাহায্য করেছে।

জনপ্রিয় এবং উচ্চমার্গীয় দুটো শিল্প ধারার মধ্যে যে দূরত্ব ছিলো মোনালিসা সেই দূরত্বকেও ঘুচিয়ে দিয়েছে। এটা একই সাথে ক্লাসিক এবং জনপ্রিয়।

তাছাড়া, কোনো কিছুই পরিসংখ্যান নয়। আমরা যা পড়ি, যা দেখি, যে অভিজ্ঞতা লাভ করি, সেসবই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলে দেয়। এই কাজটি যখন আমি শুরু করি তখন আমি মোনালিসাকে বিশেষ কোনো সুন্দর পেইন্টিং হিসেবে দেখি নি। এখন আমি বুঝি, এটা আসলেই সুন্দর। আমার মনে হয় আমি জানি কেন সে এতো বিখ্যাত। অবশ্য আমি এখনও জানি না সে কেন হাসছে। কিন্তু সেটা তো অন্য কেউও জানে না।

. . .

নোট

প্রথম অধ্যায়

১. জিনজার দাত্তো, Taking Mona Lisa's Temperature, *Artnews*, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ: ৯৯-১০১
২. কেনেথ ক্লার্ক, 'Mona Lisa', *Burlington Magazine*, মার্চ ১৯৭৩, পৃ: ১৫০
৩. পল বারোলস্কি, 'Mona Lisa Explained', *Notes in the liistory of Art*, ভলি:-১৩, নং ২ ১৯৯৪, পৃ: ১৫-১৬.
৪. লিবিড, পৃ: ১৫
৫. গিওর্গি ভাসারি, *Le Vite de' piu eccellenti pittori, sciltorie* নিউটন, রোম, ১৯৯১, পৃ: ৫৬৪
৬. আর্নেস্ট গমব্রিচ, *The story of art*, ফেইডন, লন্ডন, ১৯৮৯, পৃ: ২২৭-৮
৭. নিয়েলসেন, CRA survey, ইন্ড্রো প্যার গ্রি শুদি সুল্লা পাবলিকা ওপিনিওন, মিলান, ১১-১৩ ফেব্রু: ২০০০
৮. *Report in Cotinaissance des arts*, জুন, ১৯৭৪
৯. *Paris Match*, ১৩ জুলাই ১৯৮৪
১০. *See Hamburg Abenblatt*, ২৬ অক্টো: ১৯৮৯
১১. ফ্রেদিরোকো জেরি, *Derriere l'image*, Rivages, প্যারিস, ১৯৮৮, পৃ: ১৫৩
১২. *Nuances*, নং-১৮, অক্টো: ১৯৯৮
১৩. ভাসারি, পৃ: ৫৬৪
১৪. মেয়ার সেপিরো, Leonardo and Freud : An Art-Historical Study, *Journal of the History of Ideas*, ভলি: ১৭, এপ্রিল, ১৯৫৬, পৃ: ১৬৫
১৫. উমবার্তো একো, *Opera aperta*: বোমপিয়ানি, মিলান, ১৯৯৫, পৃ: ৩৫-৩৬
১৬. Leonardo da Vinci, *Leonardo on Painting*, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, মার্টিন কেন্স, লন্ডন, ১৯৮৯, পৃ: ১৪৯
১৭. বালদাসার কস্তিলিওন, *Il cortegiano*, মনদাদোরি, মিলান, ১৯৯১, পৃ: ৪৭
১৮. জ্যাকব বুকহার্ড, *The Civilization of the Renaissance in Italy*, ফেইডন প্রেস, লন্ডন, ১৯৬০, পৃ: ২১৯-২১
১৯. লিবিড, পৃ: ২১০
২০. ড্যানিয়েল আরাসে, *Leonardo da Vinci: The Rhythm of the World*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৭, পৃ: ৪০৮
২১. ই.এইচ গমব্রিচ, *Portrait of the Artist as a Paradox*, নিউ ইয়র্ক রিভিউ অব বুকস, ২০ জানু: ২০০০, পৃ: ৮
২২. রেমন্ড বায়ার, *Leonard de Vinci: La Grace*, ফেলিক্স এলকান, প্যারিস, ১৯৩৩, পৃ: ২০০
২৩. লিবিড, পৃ: ২১৫-১৬
২৪. এটা ইউজিন মার্টিনের নিজস্ব মতামত; দেখুন তাঁর *Leonard de Vinci: l'Artiste, le penseur, le savant*, Hachette বইটি, প্যারিস, ১৮৯৯, পৃ: ৪১৭-১৯
২৫. ব্যদেকার, *Paris et ses environs*, লিপজিগ এক প্যারিস, ১৯১৪, পৃ: ১১৯
২৬. আন্দ্রে শার্ল কুপিয়ে, 'La "Joconde" est-elle le portrait de "Mona Lisa"?'', *Les Arts*, জানু: ১৯১৪
২৭. ভাসারি, পৃ: ৫৫৫

২৮. ফ্রাঙ্ক জোলনার, *Leonardo's Portrait of Mona Lisa del Giocondo*, *Gazette des beauxarts*, মার্চ ১৯৯৩, পৃ:১৩২
২৯. লিবিড, পৃ:১১৮
৩০. ভাসারি, পৃ:৫৬৪
৩১. জোলনার, পৃ:১১৫-৩৮
৩২. লিবিড, পৃ:১২০
৩৩. কেনেথ ক্লার্ক, *Leonard da Vinci*, পেন্সাইন, ১৯৮৯, পৃ:১৭২
৩৪. মার্টিন কম্প, *Leonard da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man*, ডেট, লন্ডন, ১৯৮১, পৃ:২৬৮-৭০
৩৫. জেরোমে দ্য বাসানো, *'Le Mythe de La Joconde'*, *Bulletin de l'Association Leonard de Vinci* সংখ্যা, মার্চ, ১৯৭৮, পৃ:২১
৩৬. জোলনার, পৃ:১২২
৩৭. ফ্রান্সোয়া ভিয়াস্তের ড্রইং, প্যারিস, ১৯৯৯
৩৮. মুনজ, পৃ:৩৭১
৩৯. ভিয়েস্তে, পৃ:২৩
৪০. রেমন্ড জাইড-এর *Monna Lisa Monna Bella*, *Parnassus* সংখ্যা, জানু: ১৯৪৬, পৃ: ৭, ১০, ২২, ২৩; হিদেমিচি তানাচার *Leonardo's Isabella d'Este: A New Analysis of the Monna Lisa in the Louvre*, *Annali dell'Istituto Giapponese di Cultura*, রোম, ১৯৭৬-৭৭
৪১. এডোলফো ভেনচুরি, *La pittura del cinquecento*, মিলান, ১৯২৫
৪২. কার্লো ভেচি, *Leonardo*, রোম, ১৯৯৮, পৃ:২৫৭
৪৩. লিবিড, পৃ: ৩২৪-৩৬
৪৪. ভাসারি, পৃ: ৫৬৫
৪৫. কার্লো ভেচি, *La Gualanda*, *Accademia Leonardi Vinci*, ভলি:৩, ১৯৯০, পৃ:৬৪
৪৬. লিবিড, পৃ:৩৩৫-৩৬
৪৭. কার্লো পেরিরিস্তি, *Leonardo: A Study in Chronology and Style*, টেমস এবং হাডসন, লন্ডন, ১৯৭৩, পৃ:১৩৫-৩৭
৪৮. কার্লো পেরিরিস্তি, *Storia della Gioconda di Leonardo da Vinci con nuove congetture sulla persona ritratta*, *Bibliothèque d'humanisme et Renaissance*, ভলি:১৮, ১৯৫৬, পৃ:১৭১-৮২
৪৯. *Il Giornale dell'Emilia*, দেখুন, ১ নবে: ১৯৫৩
৫০. www.italica.rai. এ দেখুন
৫১. স্তাদাল, *Histoire de la peinture en Italie*, Gallimard Folio, গালিমাদ ফলিও, প্যারিস, ১৯৯৬, পৃ:২০৭

৫২. অর্দ্র চাঞ্চেল, *Un cardinale del Rinascimento in viaggio per l'Europa, Laterza*, বারি, রোম, ১৯৯৫
৫৩. চাঞ্চেল, পৃ: ৭৫, ৮৫
৫৪. *the Catalogue raisonne des oeuvres de Leonard de Vinci au Musee du Louvre et dans les collections francaises*, লুভ্র, প্যারিস, ১৯৫২, পৃ: ১০১
৫৫. জেনিস সেইল এবং গ্রাজিওস সিরোনি, 'Salai and Leonardo's Legacy', *Barlington Magazine*, ফেব্রু: ১৯৯১, পৃ: ৯৮-১০০
৫৬. কাসিনো'র বর্ণনা, ১৯৯৫
৫৭. কল্প রিয়ারিক্স, পৃ: ১২৩
৫৮. মার্টিন কেম্প, পৃ: ২৬৪
৫৯. সেল এবং সিরোনি, মিলান, ১৯৯১, পৃ: ৯৫-১০৮
৬০. আলেক্সান্দ্রে ভেজ্জেন্সি, *Leonardo da Vinci: Arte. e scienza del' universo*, ১৯৯৬, পৃ: ১৬৭
৬১. সেল এবং সিরোনি, পৃ: ১০২
৬২. ফাদার পিয়েরে ড্যান-এর কাছ থেকে নেয়া, ১৬৪২
৬৩. সিলভি বিস্তাইন, 'La joconde et le in Connaissance des arts', ১৯৯১, পৃ: ৬২-৬৯
৬৪. গ্যাব্রিয়েল সেইলে, *Leonard de vinci*, প্যারিস, ১৮৯২, পৃ: ৪৭৩
৬৫. জেনিস সেল, *Leonard dc Vinci, Reunion des musees nationaux*, প্যারিস, ১৯৯৩, পৃ: ৩২
১. ড্যানিয়েল আরাসে, *Le Dtail: Pour unne histoire rapprochce de la peinture*, শাম ক্রামারিও, প্যারিস, ১৯৯৬, পৃ: ৬৮-৭২
২. *Journal des arts*, ২৮ আগস্ট, ১৯৯৮
৩. এই সব পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে মাদদালিন আওয়ার্স। এগুলো লুভ্র কোডার-এ পাওয়া যাবে।
৪. উদাল, পৃ: ২০৭
৫. জাঁ পিয়েরে কুজিন, 'Quand Monna Lisa fait sa toilette', *Paris-Match*, ৩ জুন, ১৯৯৭
৬. মার্টিন কেম্প, পৃ: ২০৭
৭. *Leonardo on Painting*, পৃ: ১৪৭
৮. পাওলো বার্নিনি, *Women under the Gaze: a Renaissance Genealogy*, জলিউয়-২১
৯. মার্টিন কেম্প, পৃ: ২৬৬
১০. কার্লো স্তারনাজি, *Leonardo in terra di Arezzo*, ১৯৯৫, পৃ: ৭, ২৪
১১. মার্টিন কেম্প, পৃ: ২৬৬
১২. ডেভিড এলান ব্রাউন, *Leonardo and the Idealized Portrait in Milan*,
১৩. ভাসারি, পৃ: ৮১
১৪. চার্লস হোপ, *A Wind from the West, New York Review of Books*, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ: ১১-১৩
১৫. জন পোপ হেনেসি, *The Portrait in the Renaissance*, ১৯৬৬, পৃ: ৬০
১৬. জারোয়া ফিলিপজাক, *New Light on Mona Lisa: Leonardo's Optical Knowledge and his*

- Choice of Lighting', *Art Bulletin*, ১৯৭৭
১৭. ভিনসেন্ট পোমারিদি, *La Joconde*, Prat/Europa, প্যারিস, ১৯৮৮, পৃ:৫৮
১৮. লিসা জারদিন, *Worldly Goods: A New History of the Renaissance*, লন্ডন,, ১৯৯৭, পৃ:১০-১১
১৯. *Le Monde*, ২৯ জুন, ১৯৯১
২০. ভিনসেন্ট পোমারিদি, পৃ:৩৯, ৪৩
২১. *Leonardo on Painting*, পৃ:৮৮
২২. কার্ল জেসপারস, *Leonardo, Descartes, Max Weber.- Three Essays*, লন্ডন, ১৯৬৫, পৃ:৯
২৩. *Leonardo on Painting*, পৃ:৮৭
২৪. আর্নস্ট গমব্রিচ, *The Story of Art*, অক্সফোর্ড, ১৯৮৯, পৃ:২২৮
২৫. বরোলস্কি, পৃ:১৪
২৬. লুবা ফ্রিডম্যান, 'Raphael's Perception of the Mona Lisa', *Gazette des beaux-arts*, ১৯৮৯, পৃ:১৭১
২৭. স্নেইডার এবং ফ্রাম, পৃ:১৬
২৮. পোপ-হেনিসি, 'The Portrait in the Renaissance', পৃ:৫১২
২৯. লুবা ফ্রিডম্যান, 'Raphael's Perception of the Mona Lisa', *Gazette des beaux-arts*, ১৯৮৯, পৃ:১৬৯-৮২
৩০. লিবিড, পৃ:১৭২
৩১. কক্স রিয়ারিক, পৃ:১১৪
৩২. মেরি আতোয়া ফ্লোরি, *Documents du Minutier Central concernant les peintres les Sculpteurs et les graveurs au XVIIe siecle (1600-1650)*, ভলি:১, প্যারিস, ১৯৬৯
৩৩. NAAF 1892, পৃ:১৯৮, লুভর ফোন্ডার
৩৪. মিরেলি রমব্যদ, *Documents du Minutier central concernaijt l'Histoire de l'art (1700-1750)*, ভলি:২, প্যারিস, ১৯৭১, পৃ:৭৮১
৩৫. ই দাসিয়ের'র *Catalogue de la vente Gaignat (1769)*
৩৬. ফিলিপ ফেল, 'In Praise of Imitation: Leonardo and his Followers', *Gazette des beaux-arts*, জুলাই-আগস্ট ১৯৯৫, পৃ:১
৩৭. ডেভিড এলান ব্রাউন, *The Young Correggio and his Leonardesque Sources*, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮১
৩৮. ফিলিপ ফেল, পৃ:৮
৩৯. কক্স রিয়ারিক, পৃ:১০০-১
৪০. মুনজ, পৃ:২১
৪১. এফ. এ ফ্রয়ার, *Voyage autour du salon carre au Musee du Louvre*, প্যারিস, ১৮৬১, পৃ:২২২
৪২. রজার দ্য পাইল, *Abrege de la vie des peintres avec*

des reflexions stir leurs ouvrages. ১৯৬১

৪৩. লেপিসি, *Catalogue des tableaux*
tiu Roy, প্যারিস, ১৭৫২
 ৪৪. *Musee du Louvre*, প্যারিস, ১৯৯২

তৃতীয় অধ্যায়

১. দেখুন *Diderot and D'Alenibert, Enclycopedie*
 জেনেভা, ১৭৭২, ভলি:৯, পৃ:৭০৬
২. এন্ড্রু ম্যাকক্লেলান, 'The Musee du Louvre as Revolutionary Metaphor During the Terror',
Art Bulletin, জুন ১৯৮৮, পৃ:৩০০
৩. *Memioires du Louvre*, প্যারিস,
 ১৯৮৯, পৃ:১৭০-৭১
৪. জার্মেইন বাজিন, *Tresors de la*
peinture au Luvre, প্যারিস,
 ১৯৬২, পৃ:৭৮
৫. *Nfotices des principaux*
tableaux tecneillis datis la
Loinbardiepartes, ডিসে: ১৭৯৭
৬. জার্মেইন বাজিন, *The Museum age*,
 ব্রাসেলস, ১৯৬৭
৭. *Significant Minor Poetry series*,
 ১৮১৬, নতুন সংস্করণ ১৯৭৮, নিউ ইয়র্ক
৮. জন সি. ইয়ুডেন্স, *Classical Tour*
Through Italy, লন্ডন, ১৮১৩, পৃ:৬০
৯. জার্মেইন বাজিন, *The Museum age*,
 ব্রাসেলস, ১৯৬৭, পৃ:১৭৭
১০. লিবিড, পৃ:১৭১
১১. জঁ পিয়েরে কুসিন, *An Louvre*,
d'apres les maitres, ১৯৯৩, পৃ:৩১
১২. ইউজিন দেলাক্রোয়া, *journal*

1822-1863, প্যারিস, ১৯৮০, পৃ:৭৩৭

১৩. কুসিন, *Delacroix copie*
১৪. কুসিন, 'd'Apr&s les
 Florenitines', *libid.*, পৃ:২৭৪-৭৫
১৫. ইউজিন দেলাক্রোয়া, পৃ:৩৮৪
১৬. জঁ পিয়েরে কুসিন, *Autour de la*
Joconde, পৃ:৪১২-১৫
১৭. কুসিন, 'd'Apr&s les
 Florenitines', পৃ:২৭৫
১৮. দুপয়, পৃ:৪৪-৪৫
১৯. লিও লাগারানজ, *Du Ramg des*
femmes dans les arts, *Gazette*
du beaux-arts, অক্টোবর ১৮৬০,
 পৃ:৪০-৪৩
২০. শামফুরেরি'র *l'Artiste*, ১৮৪৪, পৃ:২১০
২১. ডোমিনেক পুলোয়া, *La Visite au*
Musee, *Gazette du beaux-*
arts, মে-জুন ১৯৮৩, পৃ:১৮৯
২২. জেরার্ড মনিয়, *l'Art et ses*
institutions en France:De la
Revoulution a nos jours, প্যারিস,
 ১৯৯৫, পৃ, ১৩৩
২৩. ব্রেক, পৃ:১২২
২৪. এমিল জোলা, 'এদুয়ার্দ মনে (১৮৬৭)
২৫. এমিল জোলা, *l'Assomoir*, পৃ:৮৮-
 ৮৯
২৬. পুলোয়া, পৃ:১৮৯
২৭. মেরি এ্যান দুপয় 'Le copiste a
 l'oeuvre', পৃ:৪৪-৪৭
২৮. পিয়েরে অর্থা, 'লেতাভ মেসিনি'
Gazette du beaux-arts, মে-জুন
 ১৯৬৮, পৃ:৩০৪
২৯. রাসেল এম জোন্স, 'আমেরিকান পেইন্টার
 ইন প্যারিস', ১৯৯২, পৃ:৭৩

৩০. ক্রেমেন্ট দ্যরিস, 'The Musee du Louvre', ১৮৪৯
৩১. লো ক্যাবিনেট দ্য লামাতিউর সেকেন্ড রিপোর্টটির অংশ বিশেষ দেখুন
৩২. 'মিনেস্ট্রে দাল ইনতেরিউর,' প্যারিস, ১৮৪৯, পৃ:১০৮
৩৩. জার্মেইন বাজিন, 'লা পেইনতিউর অ্য লুভ্র,' প্যারিস, ১৯৬৬, পৃ:৬১
৩৪. ভিল্লাত, পৃ:১০৪
৩৫. কেনেথ ক্লার্ক, 'এনাদার পার্ট অব দি উড', লন্ডন, ১৯৭৬, পৃ:৪৭
৩৬. চার্লস ক্রেমেন্ট, মাইকেল এন্জ, লিওনার্দো দা ভিন্চি, রাফায়েল, পৃ:২২০-২২
৩৭. ভ্যালেরিয়া রামাকোয়েন্সি দোনাতো, 'আই দিকাদেসি এ লা গিওকোন্দা', ১৯৭৭, পৃ:৭০-৯৮
৬. রেমন্ড লেবেণ্ডয়ে, 'লে আতিস্তে ইতালিয়েন্স', ১৯৫৩, পৃ:২১৩
৭. ই.এইচ গমব্রিচ, নিউ লাইট অন ওল্ড মাস্টার, শিকাগো, ১৯৮৬, পৃ:১২৫
৮. ব্যারি বুলোয়া, 'ওয়ার্ডার প্যাটার্ন রেনেসাঁ প্যুয়ান্ড লিওনার্দো দা ভিন্চিস রিপুটেশন ইন দি নাইটিং সেঞ্চুরি', ১৯৭৯, পৃ:২৬৮
৯. ফ্রম দুচ্চিও টু পিকাসো নামক একটি বই থেকে নেয়া
১০. এন্তলো হলো তথাকথিত 'মিলান মেনুক্রিপ্ট'।
১১. জে.বি বুলোয়া, দ্য মিথ অব দি রেনেসাঁ ইন নাইটিং সেঞ্চুরি রাইটিং, ১৯৯৪, পৃ:১৭৩
১২. বার্টোল্ড জাইল-এর লো ইনজেনিউরস দ্যালা রেনেসাঁ বইটি দেখুন, ১৯৭৮, পৃ:১৯৩
১৩. রিচার্ড স্কফিল্ড, 'লিওনার্দোস মিলানিজ আর্কিটেকচারস', ১৯৯১, পৃ:১১১-৫৭

চতুর্থ অধ্যায়

১. মার্টিন কেম্পের 'ক্লার্ক'স লিওনার্দো' দেখুন, পৃ:৭
২. শিয়েরার ওয়েস্ট-এর ইটালিয়ান কানচার ইন নর্দান ইউরোপ ইন এইটিং সেঞ্চুরি, গ্রন্থটি দেখুন, ১৯৯৮
৩. চার্লস ক্রেমেন্ট, মাইকেল এন্জ, লিওনার্দো দা ভিন্চি, রাফায়েল, পৃ:৪৭-৪৮
৪. আর্নল্ড হোসার, দ্য সোশ্যাল হিস্টোরি অব আর্ট: ভলি-২, ১৯৯৯, পৃ:৬০
৫. চার্লস হোপ, 'ইন লরেনজো'স গার্ডেন', ১৯৯৯, পৃ:৬৫
১৪. জাইল, পৃ:১৪১
১৫. কমারিয়া ভিস্তোরিয়া ক্রনোলি, 'দ্য স্কালপটোর', ১৯৮১, পৃ:১০২
১৭. গমব্রিচ, পৃ:৪৩
১৮. ভাসারি, পৃ:৫৬৫
১৯. লিবিড, পৃ:৫৫৯
২০. এই বক্তব্যটি লিওনিদ এম. বাতকিন-এর লিওনার্দো দা ভিন্চি বই থেকে নেয়া, রোম, ১৯৮৮, পৃ:১৯৩
২১. আইভর বি. হার্ট, দ্য ওয়ার্ড অব লিওনার্দো দা ভিন্চি, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬১

২২. কেউ কেউ মনে করেন এটি লিওনার্দোর আসল ছবি থেকে সালাই খুব বাজেভাবে কপি করেছিলেন।
২৩. চার্লস এইচ গিবস-স্মিথ, এভিয়েশন, লন্ডন, ১৯৮৫, পৃ:৮
২৪. মারিও দ্য মিচেলি, লিওনার্দো দা ভিন্সি, মিলান, ১৯৯১, পৃ:৫
২৫. ইন্ট্রোডাকশন ইন ব্রিজিও বইটি দেখুন, পৃ:১৪-১৫
২৬. সার্জ ব্রামলি, লিওনার্দো দা ভিন্সি, প্যারিস, ১৯৮৮, পৃ:৩৩
২৭. ক্রেমেন্ড, পৃ:১৭৪
২৮. বাতকিন, পৃ:২১০
২৯. স্তঁদাল, পৃ:২২০-২১, প্যারিস, ১৮৬৪
৩০. স্তঁদাল, পৃ:১৮১
৩১. বাতকিন, পৃ:২৮
৩২. আনা মারিয়া ব্রিজিও, 'দ্য পেইন্টার', পৃ:৩৫
৩৩. লিওনার্দো অন পেইন্টিং, পৃ:৫২-৬৮
৩৪. লিবিড, পৃ:১৩-১৫
৩৫. জার্দিন, ওয়ার্ল্ডলি ওডস, পৃ:২৪২
৩৬. মাইকেল এ্যাঙ্কোলোর একজন বংশধর।
৩৭. ভাসারি, পৃ:৫৬৩
৩৮. ভাসারি এই কথাটি লিবিডে উল্লেখ করেছেন, পৃ:৫৫৮
৩৯. বুকহার্ড, পৃ:৮১
৪০. লিবিড, পৃ:৮৪
৪১. এডগার কুইনেট, লো রেভলুশন দ্য ইতালি, প্যারিস, ১৯০৪, পৃ:১৩২
৪২. জুল মিশেল, উভার্স কম্প্রিভ, ১৯৭৬, পৃ:৮৩
৪৩. লিবিড, পৃ:৫২; অল্প বয়সে তিনি মধ্যযুগ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ছিলেন।
৪৪. লিবিড, পৃ:৫৪
৪৫. জর্জ এলিয়ট, 'ব্রাদার্স ইন ওপিনিয়ন', ১৮৪৬
৪৬. আরসিন হুসে, হিস্টোয়ে দ্য লিওনার্দো দা ভিন্সি, প্যারিস, ১৮৬৯, পৃ:৮
৪৭. এফ. এ ফ্রয়ার, *Voyage autour du salon carre au Musee du Louvre*, প্যারিস, ১৮৬১, পৃ:১৫
৪৮. ব্যদেকার, প্যারিস এ্যান্ড ইটস এনভায়োরোন, ১৯০০, পৃ:১১১
৪৯. হুসে এটি বিবৃত করেছেন, পৃ:২২৯
৫০. ক্রেমেন্ড, পৃ:২৩৮
৫১. সেইলেন্স, পৃ:১৬৯
৫২. স্তঁদাল, পৃ:২২৪
৫৩. আলফ্রেড দুমেইনেল, লা আর্ভ ইতালিয়েন, প্যারিস, ১৮৫৪, পৃ:১৩৪
৫৪. রেনে বোনাফেন, লা কোয়েস্টন দ্য লা জোকোন্দে, লিও, ১৯০৮, পৃ:২৫৯
৫৫. দ্য মিচেলি, পৃ:২৪
৫৬. বি. কুরেত, ১৯৫২
৫৭. রেমন্ড উইলিয়ামস, কালচার এ্যান্ড সোসাইটি, লন্ডন, ১৯৮৭, পৃ:৮৪
৫৮. পিটার গের দ্য নেকেড হার্ট দেখুন, লন্ডন, ১৯৯৬, পৃ:১০২-১২
৫৯. লিবিড, পৃ:১৫৩-৪
৬০. লিওনার্দো অন পেইন্টিং, পৃ:৩৮
৬১. আর্নস্ট ক্রিস এক ওটো কুর্জ, লিজেড, মিথ এ্যান্ড ম্যাজিক ইন দি ইমেজ অব দি আর্টিস্ট, লন্ডন, ১৯৭৯
৬২. রেমন্ড মোল্যা, 'লা জেনেসিস দ্য লা রারেতি আরতিস্টিক', ১৯৭৮, পৃ:২৪১
৬৩. ক্রনো এস. ফ্রেই এবং ওয়ার্নার ডব্রিউ পোয়ারিখ, মিউজেক্স এ্যান্ড মার্কেট, ১৯৮৯, পৃ:১০৩
৬৪. জন রাসেল ট্রাইলর এবং ব্রায়ান ক্রক, দ্য আর্ট ডিলার, লন্ডন, ১৯৬৯, পৃ:১৩৭
৬৫. আর্দ্রে মার্গো, লে জয়ে দু সাইলেন্স, প্যারিস, ১৯৫১, পৃ:৩৭০

৬৬. ইয়েভ্‌স রেনোয়ার্দ, 'লিওনার্দো দা
ভিক্সি এত লা ফ্রান্স', ১৯৭৯,
পৃ:২৫
৬৭. মিশেলে, পৃ:৪৩৫
৬৮. দ্য মিশেলে দেখুন।
৬৯. রবার্তো পাওলো সিয়াদি,
'লিওনার্দো ইলাস্ত্রেতো', ১৯৯৭,
পৃ:২৯
৭০. স্তঁদাল, পৃ:১২১
৭১. জে. ডব্লিউ গ্যোতে, ইতালিয়ান
জার্নি, ১৯৭০, পৃ:৩৭৫
৭২. সিয়াদি, পৃ:৩০
৭৩. লিমাজিন দা লিওনার্দো প্রদর্শনীর
ক্যাটালগ
৭৪. সিয়াদি, পৃ:৩৩
৭৫. ফেদরিকো ভোগনেলি,
'লিওনার্দো', পৃ:৬৪
৭৬. ভিক্সি জাদুঘরে রাখা আত্মপ্রতিকৃতি
৭৭. দ্য মিচেলি থেকে উদ্ধৃত, পৃ:১৮
৭৮. রিচার্ড টার্নার, ইনভেস্টিং
লিওনার্দো, লন্ডন, ১৯৯৫, পৃ:৯০
৭৯. লর্ড তারলিন্দেন, লিওনার্দো দা
ভিক্সি দাঁ লা গ্রাভুয়ের ফ্রান্সে,
পৃ:৩৬৪
৮০. চার্লস ডিকেন্স, পিকচারস ফ্রম
ইটালি, ১৯৯৮, পৃ:৯৫
৮১. এলিস সুইনবার্নের কাছে লেখা
চিঠি, ৩১ ডিসে: ১৮৬৩
৮২. নিকোলাস বয়েল-এর গ্যোতে
থেকে উদ্ধৃত, ১৯৯১, পৃ:৫১২
৮৩. গ্যোতে, ইতালিয়ান জার্নি, পৃ:১৬৬
৮৪. টার্নার, পৃ:৯৫
৮৫. মার্সেল প্রাউস্ট, 'আপ্রেস লা
ওয়েরে', প্যারিস, ১৯৭১, পৃ:২৭৫
৮৬. কেনেথ ক্রাফ, লিওনার্দো দা ভিক্সি,
পৃ:১৪৪
৮৭. বাতকিন, পৃ:১৪৭
৮৮. আকাদিমিয়া লিওনার্দি ভিক্সি থেকে
অনুবাদ করা হয়েছে।
৮৯. স্তঁদাল, পৃ:১৮১
৯০. উয়েভ্‌স ইতাইম-এ দেখুন,
১৮১১
৯১. স্তঁদাল, দ্য লাস্ট সাপার-এর ওপর
মন্তব্য, পৃ:১৭১
৯২. লিবিড, পৃ:১৭৫
৯৩. লিবিড, পৃ:২০৯
৯৪. এই দৃষ্টিভঙ্গীটি আমি স্তঁদাল-এর
কাছ থেকে নিয়েছি।
৯৫. লিবিড, পৃ:৫১৫-২০
৯৬. লিবিড, পৃ:৫১৭
৯৭. লিবিড, পৃ:৫২৩
৯৮. লিবিড, পৃ:৫২৪
৯৯. লিবিড, পৃ:৫২৭-৪৭
১০০. লিবিড, পৃ:৫৫৭
১০১. লিবিড, পৃ:৫৪৯
১০২. সি. ডব্লিউ থমসন, স্তঁদাল ক্লাব,
১৯৭১
১০৩. ফ্রিস্চিনা টোরেন, 'লিওনার্দো'স
লাস্ট সাপার ইন ফিজি', লন্ডন,
১৯৯১, পৃ:২৬১
১০৪. চার্লস ল্যাথ, 'লাইনস অন দি
সেলেব্রেটেড পিকচার বাই
লিওনার্দো', লন্ডন, ১৮৩৬
১০৫. ফেলেশিয়া ডোরোথিয়া ব্রাউন
হেমাঙ্গ, দ্য ওয়ার্কস অব মি.
হেমাঙ্গ, লন্ডন, ১৮৩৯
১০৬. থিওফাইল গতিয়ে-এর ভয়েজ
অন ইতালিয়ে দেখুন, প্যারিস,
১৮৭৫, পৃ:৫৮

পঞ্চম অধ্যায়

১. চার্লস ব্রা, 'লা জোকোন্দে দ্য লিওনার্দ দে ভিঞ্চি' গ্রাভি পার কালামাস্তা, *Gazette du beaux-arts*, ফেব্রু: ১৮৫৯, পৃ:১৬৪
২. আর্দ্রে চাস্তেল, 'Un Tableau difficile', ১৯৮৮, পৃ:৯১
৩. হেনরি ফটিলন, 'Les Graveurs de la Joconde,' প্যারিস, ১৯৩১, পৃ:৮৩
৪. ব্রা, পৃ:১৬৫
৫. মারিও পাজ-এর রচনা লা কার্নে লা মোর্টে এ ইন দিয়াভোলো নেত্রা লেতাচ্চুরা রোমান্তিকা, ফ্লোরেন্স, ১৯৬৬
৬. সারাফ্ এফ. ম্যাথুস গ্রিয়েকো, 'দ্য বডি, এপিয়োরেন্স এ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি', ম্যাসাচুসেট, ১৯৯৩, পৃ:৬৫
৭. ফ্রান্সোয়া বোরিন, 'জাজিং বাই ইমেজ', পৃ:১৯৩
৮. আলকোয়া ব্রামিরেজ, উইমেন ডিফেইম্ড এ্যান্ড উইমেন ডিফেন্ডেড, অক্সফোর্ড, ১৯৯২, পৃ:১০০
৯. ক্যারোলাইন ল্যারিংটন, উইমেন এ্যান্ড রাইটিং ইন মিডিয়েভেল ইউরোপ, লন্ডন, ১৯৯৫, পৃ:২২৭
১০. ওলগয়েন হুফটন-এর দ্য প্রসপেক্ট বিফোর হার দেখুন, লন্ডন, ১৯৯৫, পৃ:৩০৮-৯
১১. প্রাজ, পৃ:১৭৩
১২. এডমুন্ড এত জুল দ্য গনকোর্ড, *জার্নাল: ১৮৫১-১৮৬৩*, প্যারিস, ১৯৫৬, পৃ:৭১৯
১৩. মার্সেল সোয়াভেজ কর্তৃক প্রবর্তিত।
১৪. সেন বিগুভ, ভোলাণ্ডে, ১৮৩৪, পৃ:২০৯
১৫. বাম দিয়েক্স্ট্রার আইডল অব পারভারসিটি থেকে উদ্ধৃত, ১৯৮৬, পৃ:১৩
১৬. শার্ল বোদলেয়ার
১৭. থিওফাইল গতিয়ে, ১৮৫২
১৮. গুস্তাভ ফ্রবার্ট, ১৮৫৩
১৯. প্রাজ, পৃ:২২৯
২০. জুল রেনার্ড, *জার্নাল: ১৮৮৭-১৯১০*, প্যারিস, ১৯৬৫, পৃ:৫১০
২১. প্রাজ থেকে উদ্ধৃত, পৃ:২২৯
২২. এ্যান হিগোলেত, 'ইমাজিনি দি দোন্নি', রোম, ১৯৯৮, পৃ:২৯৩
২৩. জুল বারবি দাউরেভেল্লি, *লো ডায়াবোলিক্স*, প্যারিস, ১৯৭৩, পৃ:২৫
২৪. জে. কে হুইজম্যান, *এ্যা রিবোয়া*, ১৯৭৮, পৃ:১০৬
২৫. লুভরের কিউরেটর সিলভি বিগুয়ে এটা অনেছেন এবং রিপোর্ট করেছিলেন।
২৬. গুস্তাভ প্রাশে, ইতুদে সুর লার্ড এত্ লা পোইজি এন ইতালি, ১৮৫০, পৃ:৮৫৪
২৭. ম্যাক্সিম দু কাম্প, *থিওফাইল গতিয়ে*, প্যারিস, ১৮৯০, পৃ:৮০
২৮. গতিয়ের'র ওপর বোদলেয়ারের একটি লেখা, লা আরতিস্তে পত্রিকায়, ১৮৫৯, দেখুন।
২৯. মাইকেল ক্রিফোর্ড স্পেন্সার, দ্য আর্ট ক্রিটিসিজম অব থিওফাইল গতিয়ে, জেনেভা, ১৯৬৯, পৃ:২৩৮
৩০. থিওফাইল গতিয়ে, *সালোয়া দ্য ১৮৪৭*, প্যারিস, ১৮৪৭, পৃ:১৫৩
৩১. রবার্ট স্নেল, *থিওফাইল গতিয়ে: এ রোমান্টিক ক্রিটিক অব ভিজুয়াল আর্ট*, ১৯৮২, পৃ:১২৭
৩২. লিওনার্দো অন পেইন্টিং দেখুন, পৃ:১৪৪
৩৩. আনিতা ক্রকনার, দ্য জিনিয়াস অব দি ফিউচার, নিউ ইয়র্ক, ১৯৭১, পৃ:১
৩৪. গতিয়ে-এর মন্তব্য
৩৫. ইমা এত্ কামিয়ে সংগ্রহ থেকে নেয়া।
৩৬. থিওফাইল গতিয়ে, *লে রোমান দ্য লা মমি*, প্যারিস, ১৯৯৭

৩৭. থিওফাইল গতিয়ে, রিসিট ফ্যান্টাসটিক, পৃ:২৩৮
৩৮. লিবিড, পৃ:১২৪
৩৯. থিওফাইল গতিয়ে, মাদামোয়াঙ্জেল মণিয়া, পৃ:২২৮-৯
৪০. লিওনার্দো অন পেইন্টিং দেখুন, পৃ:২৬-২৭
৪১. ভার্নন লি'র সুপার ন্যাচারাল টেইনস দেখুন, ১৯৯৭, পৃ:৪
৪২. থিওফাইল গতিয়ে, রিসিট ফ্যান্টাসটিক, পৃ:৬১-৬২
৪৩. থিওফাইল গতিয়ে, স্পিরিত, পৃ:৮৪
৪৪. থিওফাইল গতিয়ে, ভয়েজ এন ইতালিয়ে, পৃ:৬৯
৪৫. থিওফাইল গতিয়ে'র এক্সপোজিশন দ্য ১৮৫৯ দেখুন, পৃ:১২৯
৪৬. মরিস অবার্ট, সুজেনির দু সালোয়া দ্য ১৮৫৯, পৃ:২১৯
৪৭. থিওফাইল গতিয়ে, লো বুয়ো আর্ট এন ইউরোপ, ১৮৫৫, পৃ:১৬৫
৪৮. থিওফাইল গতিয়ে'র লা প্রেসেতে লেখা আগস্ট ১৮৫০'র প্রবন্ধটি দেখুন।
৪৯. থিওফাইল গতিয়ে'র লো মনিতিউর ইউনিভার্সেল এ লেখা থেকে উদ্ধৃত।
৫০. থিওফাইল গতিয়ে, লে দিউ এত লে দেমি দিউ দে লা পেইনতিউর, পৃ:১৪
৫১. গতিয়ে'র, ভয়েজ এন ইতালিয়ে, পৃ:৩৪৪
৫২. জোয়ানা রিচার্ডসন, থিওফাইল গতিয়ে: হিজ লাইফ এ্যান্ড টাইম, ১৯৫৮, পৃ:৪৯
৫৩. থিওফাইল গতিয়ে, কুরেসপন্ডেন্স জেনারেইল ১৮৬৮-১৮৬৯, পৃ:২০-২১
৫৪. লো মনিতিউর ইউনিভার্সেল দেখুন।
৫৫. গতিয়ে, 'লে ক্যারিকেচার দ্য লিওনার্দো দ্য ভিক্সি,' আর্টিস্টে পত্রিকার ১৮৫৭ সালের ১২ এপ্রিল সংখ্যা।
৫৬. থিওফাইল গতিয়ে'র গাইদ দ্য লাম্যাচিউর অও মিউজি দু লুজর, পৃ:২৬
৫৭. লিবিড, পৃ:২৭
৫৮. থিওফাইল গতিয়ে, লে দিউ এত লে দেমি দিউ দে লা পেইনতিউর, থেকে উদ্ধৃত।
৫৯. লিবিড, পৃ:২৪-২৫
৬০. থিওফাইল গতিয়ে, মাদামোয়াঙ্জেল মণিয়া, থেকে উদ্ধৃত।
৬১. এডগার কুইনেট, লে রেভুলুশন দি ইতালি, ১৯০৪, পৃ:১৩৩
৬২. প্রাজ, পৃ:১৮৯-৯০
৬৩. এ্যান হিগোন্নেত, 'লে দোন ইলে ইমাজিনি,' পৃ:২৮২
৬৪. জোসেফ লাবেলি, ক্যাটালগ দে লা গ্যালারি দু মিউজি দু নেপোলিওন, ১৮২৮
৬৫. জুল ভার্ন, মোনালিসা, প্যারিস, ১৯৯৫
৬৬. এইচ. তেইন, নুভোয়া এসিয়া দ্য ত্রিনটিক এত দিইস্তোয়ের, ১৯০১, পৃ:৩৫২

৬৭. ক্রেমেন্ড, পৃ:২২০
৬৮. ফ্রয়ার, পৃ:৪২-৪৬
৬৯. দিমিত্রি মেরেজকোভস্কির দ্য রিসারেকশন অব গডস উপন্যাস, ১৯০০
৭০. হুসেই, ইস্তোয়া দ্য লিওনার্দ দা ভিক্তি, পৃ:১২৭
৭১. সেইলস, পৃ:১৪২
৭২. এটি কার্লো প্রেদেসির অতিমত ।
৭৩. কেনেথ ক্লার্ক, মোনালিসা, পৃ:১৪৯
৭৪. স্তেফান মিশোয়াদ, পৃ:১৩০
৭৫. থিওফাইল গতিয়ে'র গাইদ দ্য লাম্যাচিউর অও মিউজি দু লুভর, পৃ:২৮-২৯
৭৬. লিবিড, পৃ:২৮
৭৭. জ্যঁ জ্যাক ক্রশো, কনফেশনস, পৃ:২৮
৭৮. রামাচিওস্তি দোনাতো থেকে উদ্ধৃত ।
৭৯. সেইলস, পৃ:৪৭১
৮০. আদ্রঁ মার্লো, লে মিরোয়ে দে লিষেস, পৃ:৬২১
৮১. সেইলস, পৃ:১৪১
৮২. ব্যদেকার, প্যারিস এ্যান্ড ইটস এনভায়োরেনস, ১৮৭৮, পৃ:১০৩
৮৩. লিবিড, পৃ:৯৬
৮৪. ব্যদেকার, প্যারিস এ্যান্ড ইটস এনভায়োরেনস, ১৮৭৮, পৃ:১০০
৮৫. জ্যঁ দ্য ফ্রাদঁরিসি, ফেমে এত্ দেসেস, ১৯০৩
৮৬. গতিয়ে, ত্যাবলিউ দ্য সিজ, প্যারিস ১৮৭০-১৮৭১, পৃ:১০০
৮৭. এনসাক্রোপিদিয়া ইতালিয়ানাতে 'লিওনার্দো' এন্ট্রি দেখুন ।
৮৮. এম. রেজেপিনস্কা'র 'লেডি উইথ দি আরমাইন' সংস্করণটি দেখুন ।
৮৯. ওয়াল্টার প্যাটার, দ্য রেনেসাঁ, পৃ:৭১
৯০. মুনজ, পৃ:১৯৬-৯৮
৯১. ওসভান্ড সাইরেন-এর লিওনার্দো দা ভিক্তি দেখুন ।

৯২. দুমেনাইল, আর্ত ইতালিয়েন, পৃ:১২৩
৯৩. ক্রেমেন্ড, পৃ:২২১
৯৪. মিশেলে, পৃ:৮৩
৯৫. লিবিড, পৃ:৮৪
৯৬. হেইডেন হোয়াইট, মেটাহিস্টোরি, পৃ:১৪০
৯৭. জুল মিশেলে, জার্নাল, ১৮৬১
৯৮. মিশেলে'র একটি রিভিউ
৯৯. তেইন, ভয়েজ এন ইতালিয়েন, পৃ:২২৬
১০০. তেইন, নুভোয়া এসেইয়া দা ভিক্তি, পৃ:৩৫১
১০১. হুসেই, ইস্তোয়ে দ্য লিওনার্দ দা ভিক্তি, পৃ:৩৩২
১০২. লিবিড, পৃ:৩৩৪
১০৩. পিয়েরে মার্সি থেকে উদ্ধৃত ।
১০৪. জর্জ স্যাভ, লা জোকোন্দে, পৃ:১৯৪
১০৫. প্যারিস ম্যাচ পত্রিকা থেকে নেয়া, ১৯৯৭
১০৬. দ্য ফ্রাদঁরিসি, পৃ:২৭
১০৭. সেইলস, পৃ:৪৭২
১০৮. লিবিড, পৃ:৪৭১-৭২
১০৯. লিবিড, পৃ:৪৭২
১১০. জেসপারস, লিওনার্দো, দেকার্ত, ম্যাক্স ওয়েবার, পৃ:১১

ষষ্ঠ অধ্যায়

১. দ্য অক্সফোর্ড বুক অব মডার্ন ভার্স ১৮৯২-১৯৩৫,
২. মার্ক জেফরিজ, 'দ্য মোনালিসা এ্যান্ড দি সিঙ্কল অব আইডিয়াজ,' ১৯৯৩, পৃ:২০
৩. ক্লার্ক, মোনালিসা, পৃ:১৪৮
৪. প্রাজ, পৃ:২২৭
৫. ওয়াল্টার প্যাটার, দ্য রেনেসাঁ, পৃ:৭৯-৮০
৬. রিটা সেভেরি, মিথ অব লিওনার্দো, ১৯৯২, পৃ:১০০

৭. গুস্তাভ ফ্রবার্ট, লা তেনতেশন দ্য সেইন্ত আতোয়া, ১৯৬৭, পৃ:১৩২
৮. এলু উইলটন, সিগোলিজম ইন বৃটেন, পৃ:১৮
৯. এই সব ছবিগুলো দ্য এইজ অব রসেন্তি তে তালিকাবদ্ধ করা আছে।
১০. রামাচিওন্ডি দোনাতোতে দেখুন।
১১. জার্মেইন ডাক্সেস্ট, ওয়াস্টার প্যাটার, পৃ:১৯২
১২. বিলি এলু, ওয়াস্টার প্যাটারস রিডিং, পৃ:৩৩৫
১৩. লিবিড, পৃ:৭৮, ১৮৯ ১৯৫
১৪. ব্যারি বুলোয়া, পৃ:২৭৯
১৫. প্যাটার, রেনেসাঁ, পৃ:৭৬
১৬. ক্রেমেত্ত, পৃ:২২১
১৭. প্যাটার, পৃ:৬৮
১৮. পার্সি বিলি শেলি, কম্পিউট পয়েটিক্যাল ওয়ার্কস, পৃ:৫৮৩
১৯. জর্জ স্যাভ, লা জোকোন্দে
২০. উমবার্তো ইকো, ফোকালত পেডুলাম, ১৯৮৮, পৃ:১৭
২১. সনেট অব দি উইংলেস আওয়ার্স এর সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত।
২২. ই. কোবহাম ব্রিউয়ার, দ্য ডিকশনারি অব ফ্রেইজ গ্র্যান্ড ফ্যাবল, ১৮৯৪
২৩. জে. বি বুলোয়া, পৃ:১৭৩
২৪. বেইল সেন্ট জন, দ্য লুডর, ১৮৫০, পৃ:৩২৮
২৫. ব্যাদেকারের গাইড দেখুন।
২৬. জে. বি বুলোয়া থেকে উদ্ধৃত।
২৭. জন রাসকিন, দ্য সেসটাস অব আগলেইয়া, ১৯০৫, পৃ:১২৯
২৮. টিম হিলটন, জন রাসকিন, পৃ:৪১, ২১০, ২৩৬
২৯. ব্যাদেকারের প্যারিস গাইড ইনম্যান, পৃ:১৬৯
৩০. প্যাটার, পৃ:৬৪
৩১. রসেন্তির কাছে লেখা সুইনবার্নের চিঠি, ১৮৬৯
৩২. সুইনবার্নের 'শার্ল বোদলোয়ার'
৩৩. বোদলোয়ার ইন ইংলিশ থেকে উদ্ধৃত।
৩৪. প্রাজ থেকে উদ্ধৃত, পৃ:২০২
৩৫. ডেভিড জি. রিদ্, সুইনবার্ন
৩৬. সুইনবার্নের কালেক্টেড পয়েটিক্যাল ওয়ার্কস, ১৯৩৫, পৃ:৩৩৮
৩৭. মার্গারেট অলিফান্ট, প্যাটারস হিস্টোরি অব রেনেসাঁ, পৃ:৬০৪
৩৮. মার্গারেট অলিফান্ট-এর চিঠিসমূহ দেখুন।
৩৯. ডব্রিউ জে কোর্টহোপ, মডার্ন কালচার, ১৮৭৪, পৃ:৪১১
৪০. আটলান্টিক মাস্টার্স 'রিসেন্ট লিটেরেচার' দেখুন।
৪১. রিচার্ড এলমান, অস্কার ওয়াইল্ড, পৃ:৮০
৪২. মার্সেল ব্রায়ো, লিওনার্দো দা ভিন্সি, ১৯৫২, পৃ:৪৬৫

৪৪. সি. পুয়েলি, 'লিওনার্দো ইল ভল্তো দেগ্লা গিওকোন্দা,' ১৯৫৯, পৃ:৪৭
৪৫. কেনেথ ক্রার্ক, 'ইন্ট্রোডাকশন টু ওয়াস্টার প্যাটার্নস দ্য রেনেসাঁ, ১৯৬১, পৃ:১১
৪৬. ক্রার্ক, 'মোনালিসা,' পৃ:১৪৮
৪৭. রিচার্ড বি. কার্পেটার, 'দ্য মিথিক্যাল ন্যাচার অব লিওনার্দো দা ভিন্সিস মোনালিসা,' ১৯৬৩, পৃ:৫০২
৪৮. ওয়েবস্টার শিথ, 'অবজারভেশন অন দি মোনালিসা ল্যান্ডস্কেপ,' আর্ট বুলেটিন, ১৯৮৫, পৃ:১৮৪
৪৯. গিয়ান কার্লো ময়রিনো, 'লিওনার্দো দা ভিন্সি,' ১৯৯২, পৃ:২৭১
৫০. ফ্রান্সেস পারভিস, 'লা ফেমে ইউনিভার্সেল,' ১৯৬৬, পৃ:৩১
৫১. জি. কে চেস্টারটন, 'দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ ইন লিটরেচার,' লন্ডন, ১৯৩৮, পৃ:৭১
৫২. কলিন্স, 'দ্য ওয়ার্কস অব অস্কার ওয়াইল্ড,' লন্ডন, ১৯৪৮, পৃ:৯৬৭
৫৩. লিবিড, পৃ:৯৬৮
৫৪. সমারসেট মম, 'ক্রিসমাস ইলি ডে,' পৃ:২১৩
৫৫. সমারসেট মম, 'অব হিউম্যান বভেজ,' পৃ:২৮০
৫৬. লিবিড, পৃ:৩০১
৫৭. মার্সেল প্রাউস্ট, '১৮৯৮ সালের ২৩ মার্চের চিঠি,' মাদাম দদেয়াকে লেখা।
৫৮. সলোমন রিনাথ, 'লা ত্রিস্তে দ্য মোনালিসা,' ১৯০৯, পৃ:১৭-২২
৫৯. এলম্যান, পৃ:৪৯, ৪৬৯
৬০. লিবিড, পৃ:২৫২
৬১. 'দ্য ওয়ার্কস অব অস্কার ওয়াইল্ড,' পৃ:৭১৭
৬২. লিবিড, পৃ:৯৬৭
৬৩. 'দ্য ফিক্স,' পৃ:৮১২
৬৪. 'হিউম্যানিটাইড,' পৃ:৭৮৮
৬৫. 'দ্য ফিক্স উইদাউট এ সিফ্রেট,' পৃ:২১৫
৬৬. সেভেরি থেকে উদ্ধৃত, পৃ:১০২
৬৭. লে পয়সেস দ্য শার্ল কোরান, পৃ:২৮
৬৮. 'হেনরি জেমস'স মোনালিসা,' ১৯৮১, পৃ:১০৫-৮
৬৯. হেনরি জেমস, 'দ্য ম্যাডোনা অব দি ফিউচার এ্যান্ড আদার টেম্পস,' ১৮৮১, পৃ:২৩
৭০. লিবিড, পৃ:১০৭
৭১. হেনরি জেমস, 'দ্য এ্যান্থাসেডর,' পৃ:১৭৩
৭২. জেমস জয়েস, 'এ পোর্ট্রেট অব দি আর্টিস্ট এজ এ ইয়ংম্যান,' পৃ:১৭১
৭৩. লিবিড, পৃ:২২৩
৭৪. হিউ কেনার, 'ও, এন ইমপনিকল পারসন,' পৃ:১০০
৭৫. লিবিড, ২১৪
৭৬. এলসওর্ড ম্যাসন এবং রিচার্ড এলম্যান, 'দ্য ক্রিস্টিক্যাল রাইটিং অব জেমস জয়েস,' পৃ:৭৯
৭৭. স্টেফান মার্লমে, '১৭ মে ১৮৬৭ সালের চিঠি।
৭৮. মার্সেল প্রাউস্ট, 'রাসকিন এ নটরডেম ডেমিয়েস,' পৃ:৬৫
৭৯. এলিমের বোর্হেস, 'লে প্রেসিডুয়েল দে দিও,' পৃ:৬৮
৮০. জাঁ লোরোয়া, 'ড্রেস ক্রসি,' পৃ:৭৬
৮১. লোরোয়া, পৃ:২৯
৮২. লিবিড, পৃ:৫৯
৮৩. ই. এম. ফস্টার, 'এ ক্রম উইথ এ ভিউ,' পৃ:১০৭-৮
৮৪. রেনে বোনাফেন, 'লা কোয়েন্সেন দ্য লা জোকোন্দে,' পৃ:১২-১৩
৮৫. লিবিড, পৃ:২৩-২৪
৮৬. লিবিড, পৃ:২৯-৩৩
৮৭. জে. পাব্লিন্ড ভেসিয়ে, 'লে সুরি দে লা জোকোন্দে,' ১৯০২

৪৮. লিবিড, পৃ:১১০
৪৯. ফিগারো এবং স্তাম্পা সেরা, ২৯
মার্চ ১৯৬১
৫০. কমেদিয়া ইলাস্ত্রে, ৫ জানু: ১৯১৪
৫১. চাসোঁয়াঁ সুর না জোকোন্দে,
ডিসে: ১৯১৩
৫২. লুভর ফোন্ডার দেখুন।
৫৩. হইজম্যান, এ রিবোয়া, পৃ:১৪৩
৫৪. সাটার ডে রিভিউ, ২৬ ডিসে:
১৯১৩
৫৫. রবার্তো লর্থগি, 'লো দিউ লাইস,'
পৃ:২১
৫৬. বার্নার্ড ব্রেনসন, দ্য স্টাডি এ্যান্ড
ট্রিনটিসিজম ইন ইটালিয়ান আর্ট,
পৃ:১-৮
৫৭. লিবিড, পৃ:১৩
৫৮. টি. এস এলিয়ট, দ্য স্যাক্সরেড
উড, পৃ:৪৯
৫৯. সমারসেট মম, ক্রিসমাস হলি ডে,
পৃ:২১৩
৬০. এই মতটির সাথে আমি ভিন্নমত
পোষণ করি।
৬১. ব্যদেকার, প্যারিস গাইড, পৃ:১১৯
৬২. ব্যদেকার, প্যারিস গাইড,
পৃ:১২০
৬৩. লারুজি ইউনিভার্সাল, ১৯২২,
পৃ:১২৪১
৬৪. লো ফিগারো, ১৩ ফেব্রু: ১৯৭৯
দেখুন।
৬৫. ইমানুয়েল বর্শিয়ে, কমেস্ত ওই
রেফ্রু না জোকোন্দে, ১৯২৬
পৃ:৭
৬৬. এল. রজার মাইলস, লিওনার্দো
দা ভিন্সি এত লো জোকোন্দে,
১৯২৩, পৃ:১০৬
১. আর্দ্রে দোদারে'র
*introduction to Gabriele
D'Annunzio, Portrait de
Loyse Baccaris,
Editions du Sagittaire
de Simon, ১৯২৫, পৃ:১৫*
২. লিবিড, পৃ:৩১-৩২
৩. দোনাতেল্লা, দানুনজিও, পৃ:৫২৫
৪. দা সান্তি, পৃ:৭৫
৫. দানুনজিও, 'L'uomo che
rubò a Gioconda',
৬. ফ্রেই এবং পোমারিশনে, পৃ:১০৪
৭. পি. জি কনোডি, নিউ ইয়র্ক
টাইমস, ১৫ ফেব্রু: ১৯৭৪
৮. জন আর. আয়ার, মনোথ্রাফ অন
লিওনার্দো দা ভিন্সি'স
মোনালিসা,' পৃ:৪৬
৯. হেনরি এফ. পুলিৎজার, *হোয়্যার
ইজ দ্য মোনালিসা?*
১০. লিবিড, পৃ:৯
১১. জর্জ পিয়েরকুয়েন, দু মুরোয়াঁ
পোর না জোকোন্দে, প্যারিস,
১৯৮৫, পৃ:১২৪
১২. লুভর ফোন্ডার, ৭৭৯
১৩. 'Nouvelles
connaissances et
considerations ati sujet
du tableau
Leonardesque dit "La
Colombine" Bulletin de
l'Association Leonard
de Vinci, বরিস লক্ষি
১৪. 'রিচমন্ড মোনালিসা'র সাথে
এটাকে গুলিয়ে ফেলবেন না।
১৫. *Il Moniento*, ২৭ আক্টো:
১৯৪৬

অষ্টম অধ্যায়

১৬. কইনার্দ, পৃ:১৪১
১৭. সেইমুর রিট, *The Day they Stole the Mona Lisa*, পৃ:১১
১৮. রবার্ট নোয়াহ, *The Man who Stole the Mona Lisa*
১৯. মার্টিন পেজ, *The Man who Stole the Mona Lisa*
২০. লিবিড, পৃ:২২
২১. উলফ ম্যানকোভিচ, *গিওকোন্দা*
২২. লিবিড, পৃ:৭০
২৩. লিবিড, পৃ:১১৬
২৪. স্তেফান রাবেলেই, *মার্সেল এ্যাণ্ড দি মোনালিসা*
২৫. ক্রিস গ্রিনহাফ, *Stealing the Mona Lisa*, পৃ:১১-১২
২৬. রামসেই মটোগোমারি, *The Mona Lisa is Missing!*
২৭. বরিস বার্গম্যান, *Un Tatami pour Mona Lisa*, *Le Castor Astral*, পৃ:১৫৮
২৮. লরেন চারনিনি, *La Joconde assassinee*, পৃ:৫৪
২৯. লিবিড, পৃ:১৩৩
৩০. মাইকেল নোয়ার, *l'Otage*
৩১. জ্যঁ দুপোয়, *Natacha*
৩২. জ্যঁ মার্গাত, *Petit traite de focondologie* দেখুন।
৩৩. সিরিল ভারলিয়ে, *The Theft of the Mona Lisa*
৩৪. ভিক্টোর গোলানচ, *Who Goes Here?*
৩৫. লিবিড, পৃ:২৪৫-৪৭
৩৬. ফিলিপ্পো টোমাসো মারিনেন্সি, *Manifesto del Futurismo*
৩৭. ইরিনা কস্তাচ, *Mona Lisa and the Futurists*
৩৮. দেখুন কমিদিয়া ইলাস্ট্রে, এপ্রিল ১৯০৯, পৃ:২৩৫
৩৯. আরদেন্তো সোফিচ্চি, *গিওরনেইল দি বোর্দো*, পৃ:১৪৭
৪০. এলদা আদামোভিচ, *Surrealist collizge in Text and Image*, পৃ:৭৫
৪১. লিবিড, পৃ:১৬০
৪২. ড্যানিয়েল গ্রোজেনোফ্ফি, *Hydiopathes and Company'*
৪৩. *Les Expositions burlesques d Bruxelles de 1870 a 1914'*, *Bulletin Bruxelles* নুভর ফোন্ডার ৭৭৯
৪৪. হান্স বেণ্টিং, *Le Fetiche de l'art au XX siecle: Le Cas de la loconde'*, পৃ:৯৬
৪৫. পিয়েরে বর্দু, *The Field of Cultural Production*, পৃ:২৫৯
৪৬. এ্যান দারোনকোর্ট এবং কিনস্টোন ম্যাকশাইন, *Marcel Duchamp* পৃ:১৬
৪৭. টি. এইচ রবজনসন-গিবনস্, *Mona Lisa's Mustache*, পৃ:১৭৮
৪৮. পিয়েরে কাবান, *Entretiens avec Marcel Duchamp*, পৃ:১২২
৪৯. *L.H.O.O.Q.*, জ্যাক জে. স্পেকটোর-এর *Duchamp's Androgynous Leonardo: "Queue" and "Cut" in L.H.O.O.Q.'*
৫০. ক্লার্ক, 'মোনালিসা', পৃ:১৫০
৫১. জ্যঁ গ্রাতানি, *La joconde et Platini*, ১৯৮৫

৫২. সালভাদোর দালি, 'Why they Attack the Mona Lisa', পৃ:১৬৬
৫৩. আর্দ্রে জিদ, *Les FauxMonnayeurs*, পৃ:১২২৯
৫৪. কাবান, পৃ:১২২-৩২
৫৫. ওয়ানার স্মালেনবার্গ-এর *Fernand leger*, দেখুন, পৃ:১৩০
৫৬. ফার্নান্দ লেগার, *Le Nouveau realisme continue*, পৃ:৫৫-৭৫
৫৭. ফার্নান্দ লেগার, *Fonctions de la peinture*, পৃ:২৮২
৫৮. লিবিড, পৃ:২৮২
৫৯. আমি নাজিম হিকমতের *La joconde et Si-ya-Ou*, এর ফরাসি অনুবাদ ব্যবহার করেছি।
৬০. বা জিন, *মোনালিসা*
৬১. সেভেরি, পৃ:১০৩
৬২. রেমন্ড সুপোয়া, *Autour de la Joconde*
৬৩. Theatre Arts, VOI.35, No.5 দেখুন।
৬৪. জর্জ স্পিজয়ুলার, *Les Amours de Francois ler et de la joconde*
৬৫. লিবিড, পৃ:৪৭
৬৬. লিবিড, পৃ:২৪৫
৬৭. মিশেলে, পৃ:৮৩
৬৮. ওর্তেগা গ্যাসেট, 'La Gioconda', পৃ:৫৫৩
৬৯. *La Semaine*, পত্রিকার ৪ নং:১৯৪৩ সংখ্যা দেখুন।
১. লরি স্নেইডার এবং জ্যাক ডি. ফ্রাম, *Visual Convention, Simile and Metaphor in the Mona Lisa*, in *Storia dell'arte*, পৃ:১৫
২. লুভর ফোন্ডার দেখুন।
৩. সালভাদোর দালি, *Why they Attack the Mona Lisa*
৪. *Paris-Match*, ৯ ফেব্রু: ১৯৫৭
৫. এই তথ্যটি টিনএজ মিউটেট নিন্জা টারটল-এর ওয়েবসাইট থেকে নেয়া।
৬. এদুয়ার্দ শুফেল্ড, *My Life in Chess: The Search for La Gioconda*, পৃ:১৮৯
৭. জেমস হাসকিন্স, *Nat King Cole*
৮. বিগ এল পাবলোর *Hot Charts 1950* দেখুন।
৯. Mona Lisa, fille etrange que veut dire ton sourire si troublent? Mona Lisa, Mona Lisa, mon belle ange, ces mysteres attire a toi tons les amants. Malgre moi mozi aniouit toi s'abbandone ... Dans un beau jardin parmis les fleurs tine fille au doux sourire, ,iffollent tous les coeurs, niais elle vit sans amour.'

১০. নেইল জর্ডান এবং ডেভিড লিল্যান্ড-এর চিত্রনাট্য মোনালিসা দেখুন।
১১. বব ডিলানের *Visions of Johanna* দেখুন।
১২. ডি. এইচ লরেন্স-এর *The Lovely Lady*, পৃ:১১-১২
১৩. স্টেলা গিবনস, *Westwood, or The Gentle Powers*, পৃ:৩৯
১৪. লরেন্স ডুরেইল, *Justine*, পৃ:১১১
১৫. মেরি ম্যাকার্থি, *The Croup*, পৃ:১৬-১৭
১৬. জ্যঁ পল সার্ত্রে, *Words*, পৃ:২৯
১৭. সার্জ রাফোলোভিচ এবং এইচ এম মোয়াঁ, *La joconde.- Le Roman d'amour de Leonard de Vinci et de Mona Lisa*, পৃ:৫৫
১৮. গাই ফ্য, *Le Sourire de la joconde*, পৃ:৮
১৯. সান আন্তনিও, *Paissez-moi la*
২০. ড্যানিয়েল ওদিয়ে, *Gioconda*, পৃ:১৩
২১. আলবেয়ার বশিয়ে, *La joconde aux encheres*, পৃ:১৬
২২. জোসেলিন জাভারজুক, *l'Escapade de Mona Lisa*,
২৩. ক্যাথারিন তানোয়া, *Le Secret de la joconde*
২৪. প্যাট হাচিস, *The Mona Lisa Mystery*
২৫. জেমস মায়হেক, *Katie and the Mona Lisa*
২৬. জামিলা গ্যাভিন, 'Mona', in Michael Morpurgo (ed.), *Muck 'n' Magic*
২৭. ই. এল কনিংবার্গ, *The Second Mrs Gioconda*, পৃ:১৩৭
২৮. পিয়েরে লা মিউর, *The Private Life of Mona Lisa*
২৯. দমিনিক রাদরিজ্জানি, *La Joconde fantôme vue de l'orchestre: Mona Lisa daiis la band dessin &e', in Mona Lisa: Un certain sourire ... :Anthologie d'unc obsession*, পৃ:৫৭
৩০. জোসেফ ম্যাকআলিয়ের, *Passion's Fortune: The Story of mills and and Boon*, পৃ:২৮৩
৩১. জর্জিনা হার্ডি, *Aimez-vous la Joconde?*
৩২. যারা গিবসনের কাজের সাথে পরিচিত নন তারা মিরিয়াম গ্রেজার-এর *What is Within Now Seen Withou": Romanticism, Neuroromanticisni, and the Death of the Imagination in William Gibson's Fictive World*, in *Journal of Popular Culture*, VOL.23 দেখতে পারেন।
৩৩. উইরিয়াম গিবনস, *Mona Lisa Overdrive*, পৃ:২৪৬, ১৮১

দশম অধ্যায়

১. হারমান লেবোভিক, *Mona Lisa's Escort.-Andre Malraux and the Reiiiveittion of French Culture*
২. নিকোলে হার্ভে, তৎকালীন আমেরিকায় নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন যে, মালোর্ উক্তরটি তৎকালে ছিলো না।
৩. ফিগারো পত্রিকায় ৮ ডিসে: ১৯৬২ সালের সাক্ষাৎকারটি দেখুন।
৪. প্যারিস ম্যাচ-এর ২২ ডিসে: ১৯৬২ সংখ্যা দেখুন।
৫. প্যারিস প্রেসে-এর ১৫ ডিসে: ১৯৬২ সালের সংখ্যা দেখুন।
৬. এটি লেবোভিক-এর সাথে সংশ্লিষ্ট।
৭. নিউ ইয়র্কর -এর ১৯৬৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা দেখুন।

৮. মার্গো, *Le Miroir des limbes*, পৃ:৬২২
৯. টাইম, ৮ জানু: ১৯৬৩
১০. এলমার কেটস-এর সেবা *Bulletin de l'association Leonardo de Vinci*, ৫ অক্টো: ১৯৬৩ সালের চিঠি দেখুন।
১১. ইমিগিনেইর, *Imaginaire du tourisme culturel*, পৃ:১০৪
১২. মেরি ম্যাকার্থি, 'Living with Beautiful Things', পৃ:১১৩-১১৪
১৩. জাটস, কুলসেরিয়ার জাতীয় সৈনিক, ২৪ মার্চ: ১৯৭৯
১৪. *Connaissance des arts*, পত্রিকার সম্পাদকীয় 'La joconde au pays du sourire', এপ্রিল ১৯৭৪
১৫. *Connaissance des arts*, নভেম্বর ১৯৭২
১৬. লুভরের মিজব তথ্য।
১৭. ওয়াশিংটন পোস্ট-এ পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় ২২ মার্চ ১৯৯২
১৮. আট বুকওয়ার্ড, 'Getting Through the Louvre with the Best'.
১৯. লে মন্ডে পত্রিকার ২০-২১ এপ্রিল ১৯৭৪
২০. জায়েইম বাজিস-এর *The Museum Age* দেখুন।
২১. ম্যাকার্থির 'Living with Beautiful Things' দেখুন।
২২. *France-Soir*, ১৫ জানু: ১৯৬৩
২৩. রবার্ট উইলস, 'La joc arrive Tokyo', *Le Monde*, ১৮ এপ্রিল ১৯৭৪
২৪. French Ministry of Cultural Affairs এর কুন্সটিন, ১ মে ১৯৭৪
২৫. ডার্ক কন্টিনেন্ট, *Dark Continent: Europe's Twentieth Century*, পৃ:৩০৫
২৬. ডে. ক্রিস্টোফার হুগস-এর, *The Business of Tourism*, পৃ:৩০
২৭. লিবিং, পৃ:৪১
২৮. অমিগো, পৃ:৩৭
২৯. *Les Visiteurs du Louvre* এর সেরা তথ্য।
৩০. লুভর কেন্দ্র, ৭৭৯
৩১. রোসলিন্ডের 'Looking at the Mona Lisa' কবিতা।
৩২. সেরা জার, 'Les Randonnees de Mona Lisa', in *Bulletin de l'Association Leonard de Vinci*
৩৩. ড্যান্স কেল অসেক ফাই ফ্রেন্সিসের কাছে ফিরে এসেছিলেন।
৩৪. *Copier Creer* পত্রিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল।
৩৫. ১৯৭৮ সালে ফ্রেন্সিসের জার্মানিতে প্রদর্শনের সময় এসবের অনেকগুলোই দেখানো হয়েছিল।
৩৬. মিকেলানজেল প্রিওরেল প্যল্যাট-তে ফ্রেন্সিসের ক্যাটালগ দেখুন।
৩৭. ওয়েব কমন্স-এ, *Leonardo Visits Los Angeles*
৩৮. *Independent on Sunday*, ৩০ জানু: ২০০০
৩৯. *Yvarel Mona Lisa* প্রদর্শনের ক্যাটালগ দেখুন।

୫୦. ଚୈବ ଡିଆର ଡିଭିଡେଣ୍ଡ, *Les Accros de Mona Lisa*
୫୧. ସରକାରୀ ଏହି ଡକ୍ଟର ନିବନ୍ଧ ।
୫୨. ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ, 'Les Dividendes de l'action Mona Lisa', Copier Creer, ୭-୦୦୫
୫୩. *Cousu de fil d'or*, Beuys Warhol, Klein, Duchamp, ମିନିଷ୍ଟ, ୭-୦୦୫
୫୪. କର୍ମ ଡକ୍ଟର, *Burlington Magazine*, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୯୧
୫୫. କର୍ମ ଡକ୍ଟର, *Romance to Ritual: Mona Lisa Images for the Modern World*, in *Visual Resources*
୫୬. ମିନିଷ୍ଟ, ୭-୨୦୦
୫୭. ମିନିଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟ ଡେକ୍ ଡକ୍ଟର ।
୫୮. ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର, *Globalization and Strategy*
୫୯. ମିନିଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟ ଡେକ୍ ଡକ୍ଟର ।
୬୦. ମିନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର, *Art and Meaning*
୬୧. ମିନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର, *Advertising, Artists, and the Barriers of Art*
୬୨. ମିନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର, *Early Advertising Art*
୬୩. ଡକ୍ଟର ଏକ ମିନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର, *Advertising in Victorian England 18-37-1901*
୬୪. ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର, *Advertising the American Dream: Making way for Modernity*
୬୫. ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର, *Ceci n'est pas un Magritte*
୬୬. ମିନିଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ।
୬୭. *La Tribune de Geneva* ମିନିଷ୍ଟ ୨୦ ଡେକ୍ଟର: ୧୯୯୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ମିନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ।
୬୮. ମିନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର, ୧୯୯୯
୬୯. ମିନିଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର, *Objets divers*
୭୦. ମିନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର, *Mona Lisa*, ୭-୦୦୧
୭୧. ୧୯୯୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଏକ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ।
୭୨. *Quatre-vingts ans de Jaccodination: La locande dans les caricatures et les dessins satiriques*, ଡକ୍ଟର, ମିନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ।
୭୩. *Corriere della Sera*, ଡକ୍ଟର ।
୭୪. ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର-ଏକ ଡକ୍ଟର, *the Daily Express*, ୨୦ ଡେକ୍ଟର: ୧୯୯୯
୭୫. ଏକ ମିନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର-ଏକ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ।
୭୬. *The American Philologist*, ଡକ୍ଟର ୧୯୯୯
୭୭. *Horizon NO-3, Vol 18*, ୧୯୯୯
୭୮. ଡକ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟ-ଏକ ଡକ୍ଟର, ୧୯୯୯
୭୯. *Independent*, ୨ ଡେକ୍ଟର: ୧୯୯୯
୮୦. ଡକ୍ଟର, ୭-୨୧୭
୮୧. ୧ ଡକ୍ଟର ୧୯୯୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ।
୮୨. ଡକ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ।
୮୩. ୧ ଡକ୍ଟର ୧୯୯୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ମିନିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ।

৭৪. মিচেল নুরিদসানি, 'ওরলান মেটামোরফোসেস এত্ মিস্তি ফিকেশন,' লো ফিগারো, ৯ নভে: ১৯৯০
৭৫. এটা এখন নুভর ফোল্ডার ৭৭৯-এ পাওয়া যাচ্ছে।
৭৬. মরিস ভিউল্লো, 'লিওনার্দো এত্ লা জোকোন্দে,' পৃ: ২৬৩
৭৭. নুভর ফোল্ডার ৭৯৯
৭৮. জর্জ ইজারলো, 'লিওনার্দো দা ভিস্কি,' কমবাত, ২৬ মার্চ ১৯৫২
৭৯. জর্জ ইজারলো, লো ইনদিপেন্দেত্ দা লা পেইনতিউর, বিবলিওথেক দে আর্তস, প্যারিস, ১৯৫৬
৮০. লিলিয়ান সোয়ার্জ, 'লওনাদোস মোনালিসা,' ১৯৮৭
৮১. গ্যাজেত্রা দু ব্যুয়ো আর্তস, মে-জুন ১৯৮৭
৮২. লো ফিগারো, ১৩ অক্টো: ১৯৯৩
৮৩. স্টিভ সিঙ্গার এর একটি গবেষণাপত্র।
৮৪. জন ব্রিলে, 'আর্ট এনালিসিস,' পৃ: ৬৬
৮৫. অনেক পত্রিকাতেই এটি রিপোর্ট হয়েছিলো, বিশেষ করে লো পয়েন্তু -এর ৩০ মে ১৯৯২ সালে।
৮৬. মারগাত, 'পৈতিত ড্রেইত্ দ্য জোকোন্দেলগি' থেকে উদ্ধৃত।
৮৭. জ্যাঁ সুইয়োঁ, 'সুভেনি এত্ তেমনিয়ে,' ২৯ জানু-২৬ মার্চ, টোকিও মিউজিয়ামে প্রদর্শিত ক্যাটালগ।
৮৮. এই তথ্যটি প্রায় সবগুলো ইতালিয় দৈনিকেই ঠাই পেয়েছিলো।
৮৯. ১৩ ফেব্রু: ১৯৯২ সালের লা হিউমেনাইত্ পত্রিকা দেখুন।
৯০. ১৩ ডিসে: ১৯৯৫ সালের লো প্যারিসিয়ে পত্রিকার ছবি দেখুন।
৯১. ৫ নভে: ১৯৫৭ সালের প্যারিস-প্রেসে পত্রিকায় রিপোর্ট হয়েছিলো।
৯২. আপনি খুঁজে পেয়েছেন! আমি এটার সম্পর্কে কোনো নোট দেবো না।
৯৩. ইল লাভোরো নুভো, ১১ আগস্ট ১৯৫৫
৯৪. কেনেথ ডি. কিয়ল, 'দ্য জেনেসিস অব মোনালিসা,' পৃ: ১৩৭
৯৫. লিবিড, পৃ: ১৩৮
৯৬. লিবিড, পৃ: ১৫৯
৯৭. ক্রিনিকে, ১৫ অক্টো: ১৯৬২
৯৮. ইউজেন্সক্রিফতেত্, নং-১৩৭, ১৯৭৫, পৃ: ১০৪৮
৯৯. লিবিড, পৃ: ১৬৬৮
১০০. কেডাল আদুর, 'মোনালিসা সিনড্রম,' পৃ: ১৯৬-৯৯
১০১. জুলিয়ে কোমা, 'লা জোকোন্দে এস্ট এল ইদিওত্?' ইভেনমেন্ট পত্রিকা, ৩১ অক্টো: ১৯৯১
১০২. জোসেফ ই. বোরকোঙ্কি, 'মোনালিসা: দ্য এনিগমা অব দি স্মাইল,' পৃ: ১৭০৬
১০৩. ১ সেপ্টে: ১৯৯৯ সালের গার্ডিয়ান দেখুন।
১০৪. কলিন্স জোন্স-এর 'পুলিং টিথ ইন এইটিঙ্ক সেক্সুরি প্যারিস'-এর ১২৩ পৃ: দেখুন।
১০৫. রবার্ট ব্যারোন-এর ওয়েবসাইট দেখুন।

বাণীঘর প্রকাশনী

পুস্তক তালিকা

বাতিঘর প্রকাশনীর উল্লেখযোগ্য এবং জনপ্রিয় বইয়ের তালিকা :

দ্য দা ডিক্সি কোড : মূল : হ্যান্স ব্রাউন, অনুবাদ : মোহাম্মদ হাজির উদ্দিন, পৃ : ৪৪৮, মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

দু'হাজার বছরের পুরনো একটি সত্যকে চিরতরে নির্মূল করার জন্যে প্যারিসে একই দিনে চারজন প্রখ্যাত ব্যক্তিকে হত্যা করা হলো। সত্যটি জনাজ্ঞানি হয়ে গেলে একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মের ভিত্তি কেঁপে যাবে, হাজার বছরের ইতিহাস লিখতে হবে একেবারে নতুন করে। আর হাজার বছর ধরেই সেই সত্যটি লালন করে আসছে একটি গুপ্ত সংঘ—সেই গুপ্ত সংঘের সদস্য ছিলেন আইজ্যাক নিউটন, ভিক্টর হুগো, বস্টিচেপ্ত্রি আর লিওনার্দো দা ভিন্সির মতো ব্যক্তিবর্গ।

এ দিকে উগ্র ক্যাথলিক সংগঠন ওপাস দাই সেই সত্যকে চিরতরে ধ্বংস করার আগেই গুপ্তসংঘের গ্র্যান্ডমাস্টার তার ঘনিষ্ঠ একজনের কাছে হস্তান্তর করে দেয় আর ঘটনাচক্রে এরকম একটি মারাত্মক মিশনে জড়িয়ে পড়ে হারবার্ডের এক অধ্যাপক এবং সিঙ্ঘোলজিস্ট।

সাম্প্রতিককালের সবচাইতে আলোড়নসৃষ্টিকারী এই উপন্যাসটি পাঠকের মনোজগৎ নাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে।

গডফাদার : মূল : মারিও পুজো, অনুবাদ : মোহাম্মদ হাজির উদ্দিন, পৃ : ৪০০, মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

দুর্বল যখন আদালতের সুবিচার পায় না তখন হাজির হয় এক গোপন বিচারকের কাছে। রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার স্বাদ নিতে আর ব্যবসায়ীরা সাহায্যের জন্যে ছুটে যান তারই কাছে। নিজেই নিজের নিয়ম তৈরি করে সৃষ্টি করেছেন এক জগৎ। সেই জগতে তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। বন্ধুর জন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করতে পিছ পা হন না, শত্রুর কাছে ভয়ঙ্কর এক বিতীষিকা। তিনি বিশ্বাস করেন প্রতিটি মানুষের একটাই নিয়তি থাকে আর সেটা তৈরি হয় ঘটনাচক্রে। সমাজের ভেতর সমাজ আর রাষ্ট্রের ভেতর রাষ্ট্রের যে জগৎ সেই জগতের শক্তিকেন্দ্রে বসে সবার অলঙ্ঘ্য কলকাঠি নাড়েন গডফাদার।

মারিও পুজো'র কালজয়ী এই উপন্যাসটি পাঠকের অবশ্যই পড়া উচিত।

দ্য ডে অব দি জ্যাকেল : মূল : ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

লম্বা সোনালী চুলের এক ইংরেজ। পেশায় ভাড়াটে খুনি। নিজের কাজে বিশ্বসেরা। তার নিয়োগ কর্তারা পর্যন্ত তার নাম জানে না। পৃথিবীর বড় বড় গোয়েন্দা সংস্থা কিংবা সিক্রেট সার্ভিসের কাছেও সে অজ্ঞাত-অপরিচিত। প্রচণ্ড ধূর্ত আর সাহসী। সম্পূর্ণ একা, বিশেষভাবে তৈরি করা একটি রাইফেল নিয়ে ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেবার মিশনে নেমেছে সে। অপ্রতিরোধ্য জ্যাকেলকে থামাবে কে, কিভাবে—কেউ জানে না। এক সময় মনে হয় জ্যাকেলকে থামানোর মতো কোনো শক্তি এই পৃথিবীতে নেই।

ফ্রেডরিক ফরসাইথ'র এই অসাধারণ থ্রিলারটি পড়ে না থাকলে আজই পড়ে নিন, পরিচিত হন মাস্টার স্টোরিটেলার ফরসাইথের সাথে।

সাইলেন্স অব দি ল্যান্ডস : মূল : টমাস হ্যারিস, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

অজ্ঞাতনামা এক সিরিয়াল কিলার একের পর এক তরুণীকে বীভৎসভাবে হত্যা করে চলেছে। প্রবল চাপে দিশেহারা এফবিআই সেই খুনির পরিচয় জানতে তাদের এক এজেন্টকে পাঠায় নয়টি নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত মানুষকে ডক্টর হ্যানিবালা লেকটারের কাছে। দূর্বোধ্য আর ধূর্ত লেকটার তার অসাধারণ মেধার সাহায্যে সেই খুনিকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করবে নাকি চরিতার্থ করবে নিজের উদ্দেশ্য—সেই প্রশ্নের উত্তর পাঠক খুঁজে পাবেন শতাব্দীর সেরা অসাধারণ এই সাইকো থ্রিলারে।

রেড ড্রাগন : মূল : টমাস হ্যারিস, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

ভয়ঙ্কর এক সিরিয়াল কিলারকে ধরার জন্যে মরিয়্যা এফবিআই তাদের সেরা এজেন্ট উইল গ্রাহামকে কুখ্যাত ডক্টর লেকটারের কাছে পাঠায় যে কিনা কিছু দিন আগে তাকে মারাত্মকভাবে আহত করেছিলো। ভয়ঙ্কর সেই খুনির পিছু নিতে গিয়ে উইল গ্রাহাম বুঝতে পারে ধূর্ত খুনি এখন তাকেই টার্গেট করে ফেলেছে আর এ কাজে বন্দী অবস্থায়ও সাহায্য করেছে স্বয়ং ডক্টর লেকটার। বাঁচার একটাই পথ খোলা আছে—সেই ধূর্ত খুনিকে পাকড়াও করা। এক সময় সবাই যখন নিশ্চিত হয় খুনি মারা গেছে তখনই চূড়ান্ত আঘাত হানা হলো—কিস্তি কে, কিভাবে?

এই উপন্যাসের মাধ্যমে ডক্টর হ্যানিবালা লেকটর চরিত্রটির আবির্ভাব ঘটে। এটি বিশ্ববিখ্যাত সাইকো থ্রার সাইলেন্স অব দি ল্যান্সার প্রিকুয়েল।

বর্ন আইডেন্টিটি : ক্লা : রবার্ট লুডলাফ, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৪১২ কৃত : ০৫০.০০ টাকা

তার কোনো অতীত নেই। সম্ভবত ভবিষ্যৎও নেই। তার স্মৃতিভাণ্ডার একেবারেই শূন্য। সে কেবল জানে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ডু-মধ্যসাগর থেকে একদল জেলে তাকে উদ্ধার করেছে। নিজের শরীরে সংযুক্ত থাকা অদ্ভুত একটি কু উদ্ধার হলে নিজের পরিচয় উদঘাটনের জন্যে মরিয়া ওঠে সে আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষমতালালী আর হিংস্র একদল লোক তাকে হত্যা করার জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে। ওদিকে সন্ত্রাসের যুবরাজ কার্লোস দি জ্যাকেলও তাকে খুন করার জন্যে পিছু নেয়—কিন্তু কেন, কিসের জন্যে, তার কিছুই জানে না জেসন বর্ন। একে একে বদলে যেতে থাকে তার পরিচয়, বেরিয়ে আসতে থাকে লোমহর্ষক সব ঘটনা। শেষপর্যন্ত কি জেসন বর্ন এই সব ভয়ঙ্কর লোকের হাত থেকে বাঁচতে পারবে, জানতে পারবে নিজের ভয়ঙ্কর অতীত আর সত্যিকারের পরিচয়—বর্ন আইডেন্টিটিতে পাঠক সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবেন। বর্ন টলোজির এই প্রথম পর্বটি পাঠককে অসাধারণ চরিত্র জেসন বর্ন-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

বর্ন সুপ্লেমিসি : ক্লা : রবার্ট লুডলাফ, অনুবাদ : শিলাদ হাবীব, পৃ : ৪৪৮ কৃত : ০২০.০০ টাকা

জেসন বর্ন আবার ফিরে এসেছে! চায়নার ভাইস প্রিমিয়ারকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। কিন্তু জেসন বর্ন তো নীরবে নিভৃতে আমেরিকায় শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করছে! জানা গেলো তার নাম ব্যবহার করে আরেক খুনি সুদূর প্রাচ্যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে গভীর এক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে। সেই খুনিকে ধামাতে না পারলে পৃথিবীকে চরম মূল্য দিতে হবে। আর এ কাজ করতে পারে কেবল আসল জেসন বর্ন। আবারো তাকে এ কাজ করতে বাধ্য করা হলো—তাকে ফিরে যেতে হলো সেই ধূসর জগতে। কিন্তু যারা তাকে এ কাজ করতে বাধ্য করলো তারা বুঝতে পারলো, তাকে নিয়ে খেলতে যাওয়াটা মোটেও ঠিক হয় নি।

দাণ্ডে ক্লাব : মূল : ম্যাক্সিম গোর্কি, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৪৩২ মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

গৃহযুদ্ধের বিভীষিকা শেষ হতে না হতেই বোস্টন শহরে ঘটতে থাকে ভয়ঙ্কর সব হত্যাকাণ্ড—অভিনব আর বীভৎসভাবে হত্যা করা হয় শহরের গন্যমান্য ব্যক্তিদেরকে। ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে সবগুলো হত্যাকাণ্ডই মহাকবি দাণ্ডের মহাকাব্য ইনফার্নো'র অনুপ্রেরণায় করা হয়েছে। মারাত্মক এক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায় দাণ্ডের সাহিত্যকর্ম। এ দিকে হারভার্ড কেন্দ্রিক দাণ্ডে ক্লাবের কয়েকজন পণ্ডিতব্যক্তি এবং বিখ্যাত কবি লংফেলো এই রহস্যের জট খুলতে নেমে পড়েন—কে খুন করেছে, আর কেনই বা করেছে, সেই প্রশ্নের জবাব পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠেন তারা। যারা দাণ্ডে সম্পর্কে জানেন এবং যারা কিছুই জানেন না উভয়ের জন্যে এই বইটি হতে পারে কৌতুহলোদ্দীপক।

মোনালিসা : মূল : লিওনার্দো দাভিনচি, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩০৪ (১৬ পৃ: রঙিন) মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

কী জন্যে মোনালিসা এ বিশ্বের সবচাইতে বিখ্যাত চিত্রকর্ম? কেন? পাঁচশত বছর ধরে ছবিটা রহস্যের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। লিওনার্দো দাভিনচি অনবদ্য ভঙ্গীতে মোনালিসা'র ইতিহাস, নান্দনিকতা, রহস্য আর আধুনিক বিশ্বে এর প্রভাব বিবৃত করতে গিয়ে শিল্পজগতের যে চিত্র উন্মোচন করেছেন—এক কথায় তাকে অসাধারণ বলতেই হয়। সংগ্রহে রাখার মতো একটি বই।

ওডেসা ফাইল : মূল : ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ২৮৮ মূল্য : ২০০.০০ টাকা

পরাজিত নাৎসিদের গোপন সংগঠন ওডেসার ক্ষমতাশালী কয়েকজন সদস্য বিদেশের মাটিতে বসে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু কাকতালীয়ভাবেই সেই ঘটনায় ঢুকে পড়ে ফ্ল্যান্স সাংবাদিক পিটার মিলার। নিজের জীবন বিপন্ন করে সে ঢুকে পড়ে ওডেসার অভ্যন্তরে। নিতান্তই কি একটি এক্সক্লুসিভ রিপোর্টিংয়ের জন্যে মিলার এমনটি করেছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওডেসার ভেতরে—নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনো ঘটনা।

ফ্রেডরিক ফরসাইথের আরেকটি অসাধারণ থ্রিলার।

ডগ্‌স অব ওয়ার : কুল : ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

আফ্রিকার এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে আবিষ্কৃত হলো প্রাচীনায় সমৃদ্ধ দশ বিলিয়ন ডলারের একটি পাহাড়। বৃটিশ এক ধনকুবের সেই দেশের সরকারকে উৎসাহিত করে পুরো পাহাড়টি কৃষ্ণিগত করার জন্যে একদল ভাড়াটে যোদ্ধাকে নিয়োগ করে। কিন্তু ভাড়াটে যোদ্ধাদের দলনেতা ক্যাপ্টান শ্যাননের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম।

ফরসাইথের এই উপন্যাসটি সত্যিকারের একটি ঘটনা অবলম্বনে যাতে স্বয়ং লেখকও জড়িত ছিলেন বলে গুজব রয়েছে।

দি আফগান : কুল : ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ : নাজিম হোসেন, পৃ : ২৮৮ মূল্য : ২২০.০০ টাকা

আল কায়েদা যখন টুইন টাওয়ারের চেয়েও মারাত্মক একটি আক্রমণের পরিকল্পনা করছে তখনই ঘটনাচক্রে তাদের সেই পরিকল্পনার কথা জেনে যায় বৃটিশ-মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা। কিন্তু কবে, কিভাবে, কোথায় সেই হামলা হবে সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। এসব জানার জন্যে তারা আল কায়েদার অভ্যন্তরে একজন এজেন্টকে অনুপ্রবেশ করায়। এজেন্ট মাইক মার্টিন যখন পুরো ঘটনাটি জানতে পারে তখন তাদেরকে ধামানোর জন্যে তার আর কিছু করার থাকে না। কিন্তু হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্রও সে নয়। কিভাবে ধামানো যাবে—সেই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে আফগান উপন্যাসে।

শ্যাডো ওভার ব্যাবিলন: কুল : ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ : নাজিম হোসেন, পৃ : ৩৫২ মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

সাদ্দাম হুসেনকে হত্যার জন্যে পর্দার আড়াল থেকে একটি শক্তি একদল ভাড়াটে যোদ্ধাকে নিযুক্ত করেছে—আমেরিকা আর বৃটেন অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই সেই খবরটা জানতে পেরে বিস্মিত হয়। তাদের অগোচরে কারা এ কাজ করতে মাঠে নেমেছে? পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়েই তারা নিজেদের টার্গেটকে বাঁচানোর জন্যে সেই ভাড়াটে যোদ্ধাদেরকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হয়। ওদিকে ভাড়াটে যোদ্ধারা বিভিন্ন বাধা পেরিয়ে তাদের কাজে সফল হয়, আবার সাদ্দাম হুসেনও জীবিত থেকে যান। এমনই এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। সবশেষে যখন পাঠক জানতে পারবেন সেই আড়ালে থাকা শক্তির কথা নিঃসন্দেহে অবাক হবেন।

ফার্স্ট ব্লাড : মূল : ডেভিড মোরেল, অনুবাদ : নাজিম হোসেন, পৃ : ২০২ মূল্য : ১৮০.০০ টাকা

ভিয়েতনাম যোদ্ধা র‍্যাঘো । যুদ্ধের বিভীষিকা আর ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থায় ফিরে এসেছে নিজ দেশে । সন্দেহজনক গতিবিধির কারণে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গেলে শুরু হয় এক প্রলয়ংকরী কাণ্ড । অসাধারণ যোদ্ধা র‍্যাঘোকে আটকে রাখার মতো ক্ষমতা রাখে না কোনো পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনী । একের পর এক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে পুরো রাজ্যে হৈচৈ ফেলে দেয় সে । তাকে ধরার জন্যে মরিয়া ওঠে কয়েকটি রাজ্যের নিরাপত্তাবাহিনী । কিন্তু তাকে ধরা কিংবা হত্যা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে । শুরু হয় মানুষ শিকারের এক মহা আয়োজন ।

বিশ্বখ্যাত র‍্যাঘো চরিত্রটি এই উপন্যাসের মাধ্যমেই আবিষ্কৃত হয়েছিলো । পাঠকের জন্যে দারুণ একটি উপন্যাস ।

এ্যাবসলিউট পাওয়ার : মূল : ডেভিড বালসাপি, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩৫২ মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

নিশ্চিতি রাতে গোপন এক অভিসারে নিপুণ হয় প্রচণ্ড ক্ষমতামাণী এক লোক । দুর্ঘটনাক্রমে সেখানে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে সেই বাড়িতে চুরি করতে আসা এক চোর পুরো ঘটনাটি দেখে ফেলে । যখন জানা যায় এই কর্মকাণ্ডের একজন সাক্ষী রয়েছে, শুরু হয় সেই চোরকে নির্মূল করার অভিযান । কিন্তু লুথার হুইটনি দমে যাবার পাত্র নয় । সেও এ বিশ্বের সবচাইতে ক্ষমতামাণী লোকটির বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধের সূচনা করে । বেরিয়ে আসতে থাকে একর পর ঘটনা । অবশেষে লুথার হুইটনি তার মিশনে সফল হয়েছিলো কিনা সেই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে পড়ুন *এ্যাবসলিউট পাওয়ার* ।

পেলিকান বৃফ : মূল : জন গুশায়, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

এক রাতে আমেরিকার সুপ্রিমকোর্টের দু'জন বিচারক খুন হলে তদন্ত কাজ শুরু হয় । আইনের এক ছাত্রি নিতান্তই কৌতূহল আর একাডেমিক কারণে জড়িয়ে পড়ে সেই ঘটনায় । নিজের জীবন বিপন্ন দেখে আত্মগোপনে চলে যায় সে । আরো অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় । এক সময় মনে হয় খুনির সাথে হোয়াইট হাউজের সম্পর্ক আছে, কিন্তু শেষে গিয়ে পাঠক দেখবেন একেবারেই ভিন্ন একটি ঘটনা ।

টু হিস্টোরি অব দি কেলি গ্যাং : মূল: পিটার ক্যারি, অনুবাদ: রাই শিষ্টী, পৃ: ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

উনিশ শতকে অস্ট্রেলিয়ার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে নায়ক বনে যাওয়া কেলি এবং তার দলের সত্যিকারের উপাখ্যান নিয়ে রচিত একটি মর্মস্পর্শি উপন্যাস। লেখক এখানে কেলির বর্ণনায় কাহিনীটি বিবৃত করলেও নিজের দক্ষতারও স্বাক্ষর রেখেছেন। অসাধারণ বর্ণনা আর কৌতুহলোদ্দীপক সব চরিত্র নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনী এগিয়েছে। পিটার ক্যারির এই উপন্যাসটি মর্যাদাপূর্ণ বুকার প্রাইজ এবং কমন্ওয়েলথ রাইটার্স প্রাইজ লাভ করেছে।

কোম্বা : মূল: রবিন কুক, অনুবাদ: প্রিন্স প্রকাশক, পৃ: ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

বোস্টন মেমোরিয়াল হাসপাতালে একের পর এক রোগী অপারেশন থিয়েটারে কোমায় আক্রান্ত হচ্ছে। সুজান হুইলার নামের এক মেডিকেল ছাত্রী হাসপাতালে তার প্রথম কর্মদিবসেই জড়িয়ে পড়ে সেই ঘটনার রহস্য উদঘাটনে। কিন্তু অদৃশ্য একদল লোক তার জীবননাশের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। এ কাজ থেকে তাকে বিরত রাখতে চায় তারা। অদম্য সুজান যখন সেই রহস্য উদঘাটনে সফল হলো তখন দেখা গেলো তার নিজের জীবনটাই বিপন্ন হতে বসেছে। কিন্তু অন্য আরেকজন শেষ মুহূর্তে সমস্ত হিসেব নিকেশ পাল্টে দেয়। মেডিকেল থ্রিলারের জনক রবিন কুকের এই উপন্যাসটি বর্তমানে একটি ক্লাসিক হিসেবে স্বীকৃত।

অ্যাভেঞ্জার : মূল: ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ: ২৫৬ মূল্য : ২০০.০০ টাকা

এক আশ্চর্য চরিত্র ক্যালভিন ডেক্সটার। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরত একজন, নিজের একমাত্র সন্তান মেয়ে আর স্ত্রীকে হারানোর পর বদলে যায় তার জীবন। অ্যাভেঞ্জার নাম নিয়ে শুরু করে নতুন এক মিশন। ওদিকে ধনী এক লোক তার নাতির হত্যাকারী সার্বিয়া-বসনিয়ার এক কুখ্যাত গণহত্যাকারীকে ধরার জন্যে নিয়োগ করে ডেক্সটারকে। শুরু হয় ডেক্সটারের অভিযান।

প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে ভিয়েতনাম, সার্বিয়া থেকে আমেরিকা, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, আল কায়েদা এবং সব শেষে টুইন টাওয়ারের ধ্বংসলীলা—সুবিস্তৃত এক পুট বিধৃত হয়েছে অ্যাভেঞ্জার-এ। পাঠক

ক্যালভিন ডেক্সটারে মুগ্ধ হবেন এবং সত্যিকারের রোমাঞ্চ অনুভব করবেন ।

আইকন : মূল : ফ্রেডরিক ফরসাইথ, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ২২৪ মূল্য : ১৭০.০০ টাকা

এক সময়কার পরাশক্তি বর্তমানে অরাজকতার দ্বারপ্রান্তে । ক্যারিশম্যাটিক এক নেতা দেশবাসীকে নতুন আশার আলো দেখাচ্ছেন, বিশ্ববাসীকে শান্তির অভয় বাণী শোনাচ্ছেন, অন্যদিকে এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি । ঘটনাচক্রে তার পরিকল্পনার কথা জেনে যায় পশ্চিমা বিশ্ব । এই বীভৎস ষড়যন্ত্র থামানোর জন্যে দায়িত্ব দেয়া হয় জেসন মঙ্ককে । যেকোনো মূলে এই ষড়যন্ত্রও থামানোর মিশন নিয়ে মাঠে নামে সে । কিন্তু তারপর...ইতিহাসের এই অনিবার্য গতিপথ কি থামানো যাবে—আইকন-এ আছে সেই প্রশ্নের উত্তর ।

বডি অব এভিডেন্স : মূল : প্যাট্রিসিয়া কর্নওয়েল, অনুবাদ : বশীর বারহান, পৃ : ৩৩৬ মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

প্যাট্রিসিয়া কর্নওয়েল-এর অসাধারণ সৃষ্টি স্কারপেটাকে মোকাবেলা করতে হয় ভয়ঙ্কর এক খুনির, যেকিনা বিখ্যাত এক সাহিত্যিককে হত্যা করেছে । ঔপন্যাসিকার অতীত জীবনের সাথে এই হত্যা রহস্যের সংযোগ রয়েছে । সুতরাং স্কারপেটাকে আগে জানতে হবে নিহতের ব্যক্তি জীবন । আর সেটা জানতে গিয়েই বিপদে পড়ে যায় সে । ভিন্নধর্মী এই মার্জার থলারটি পাঠককে বেশ ভালো আনন্দ দেবে ।

দ্য মানচুরিয়ান ক্যানডিডেট: মূল : রিচার্ড কনডন, অনুবাদ : নাজিম ঘোসেন, পৃ : ৩০৪ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

ভয়ঙ্কর এক পরিকল্পনা—এক সৈনিককে ব্রেনওয়াশ করা হয় অসাধারণ একটি ষড়যন্ত্রের কারণে । তারপর...বাকিটার আশ্বাদ গ্রহণ করতে পাঠককে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে ।

রিচার্ড কনডনের এই মাইলস্টোন থলারটি পাঠকের ভালো লাগবে ।

জুজুধা : প্রিন্স আশরাফ, পৃ : ৩২০ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

দেশীয় প্রেক্ষাপটে নির্মিত চমৎকার একটি থলার । নানান ষড়যন্ত্র আর ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে এর কাহিনী । এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো একটি সাহসী আর ভিন্নধর্মী থলার ।

মে ডে : মূল : ক্রাইভ কাসলার, অনুবাদ : যখদুহ আহমেদ, পৃ : ২১৮ মূল্য : ২০০.০০ টাকা

ক্রাইভ কাসলার'র সৃষ্ট চরিত্র ডার্ক পিট'এর প্রথম অভিযান এটি। পাঠকের ভালো লাগবে।

রেড অ্যালাইন : মূল : অ্যালিয়েস্টার ম্যাকলিন, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ২৭২, মূল্য : ২০০.০০ টাকা

অ্যালিয়েস্টার ম্যাকলিনের টান টান উত্তেজনার অনবদ্য একটি খলার।

হোয়াইটআউট : মূল : কেন ফেলট, অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, পৃ : ১২০ মূল্য : ২০০.০০ টাকা

সুরক্ষিত এক ল্যাবরেটরি থেকে প্রাণঘাতী ভয়ঙ্কর ভাইরাস ছুরি হয়ে গেলে এর নিরাপত্তায় থাকা টনি গ্যালো পিছু নেয় উদ্ধারের জন্যে। এটা কেবল মাত্র অসংখ্য মানুষকেই বিপন্ন করবে না, ধ্বংস করে দেবে তাকে এবং তার প্রিয় একজন মানুষকে। একে একে যখন জট খুলতে থাকে তখন বদলে যেতে থাকে সমস্ত দৃশ্যপট। কিন্তু টনি গ্যালো হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। বিরূপ আবহাওয়া আর নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা শত্রুকে পরাস্ত করে এগিয়ে যেতে থাকে সে।

দ্য নাইট অব দি জেনারেল : মূল : এইচ.এইচ কার্ট, পৃ : ৩৩৬ মূল্য : ২৪০.০০ টাকা

জার্মান অধিকৃত পোল্যান্ডে এক বেশ্যার হত্যাকাণ্ড থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে থাকে এক গোপন ষড়যন্ত্র। হিটলারের সেনাবাহিনীর মধ্যকার এক অজানা কাহিনী উন্মোচিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর লেখা হান্স হেলমুট কার্টের অসাধারণ এই খলারটি পাঠকের অবশ্যই পড়ে দেখা উচিত।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন-এর মৌলিক থুলার :

■ **নেমেসিস :** দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় লেখক পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলেন। সন্দেহের তীর গিয়ে পড়লো লেখকের যুবতী স্ত্রীর ওপর। বেরিয়ে এলো নানান কাহিনী। একে একে সন্দেহের আওতায় চলে এলো অনেক হোমরা চোমরার নাম। হোমিসাইড ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ শুরুতে সফলতা পেলেও এক পর্যায়ে ঘটনার কূলকিণারা করতে গিয়ে হিমশিম খেতে শুরু করলো। পর্দার আড়াল থেকে একটি শক্তিশালী মহল সক্রিয় হয়ে উঠলো তদন্তে বাধা দেবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত জেফরি বেগ যা জানতে পারলো তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কী সেই ঘটনা জানতে হলে পড়ুন নেমেসিস।

■ **ম্যাজিশিয়ান :** উঠতি এক ম্যাজিশিয়ান প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করে যাচ্ছে আর একদল লোক মরিয়া হয়ে উঠছে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্যে। শুরু হলো একটি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। তারপর...বিশ্বাসঘাতকতা আর পাল্টা ষড়যন্ত্র। সব কিছু ভেদ করে ম্যাজিশিয়ান কি পারবে নিজেকে রক্ষা করতে? ভিন্নধর্মী একটি থুলার-ভিন্নধর্মী স্বাদ পাবেন পাঠক।

■ **মেডুসা কানেকশান :** ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের দু'দিন আগে, সুদূর আফগানিস্তানে একটি ঘটনা ঘটে গেলো। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেই আফগানিস্তানে শুরু হলো গোপন একটি অপারেশন। সেই ঘটনা আবার শুরু করলো নতুন আরেকটি ষড়যন্ত্রের। কি সেই ষড়যন্ত্র-জানতে হলে পড়ুন মেডুসা কানেকশান।

আরো যেসব বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে:

- বর্ন আলটিমেটাম-রবার্ট লুডলামের বর্ন সিরিজের শেষ পর্ব
- ফায়ার ফক্স-ফ্রেইগ টমাসের হাইস্পিড থ্রার
- থু মিসটেক্স অব মাই লাইফ-চেতান ভগতের অসাধারণ একটি উপন্যাস। পাঠককে ভিন্নধর্মী স্বাদ দেবে
- এ নাইট এ্যাট দি কনসেন্টার-চেতান ভগতের আরেকটি অসাধারণ উপন্যাস।
- হ্যানিবালা-টমাস হ্যারিসের হ্যানিবালা লেকটার সিরিজের তৃতীয় উপন্যাস
- দি আমেরিকান-হেনরি জেমসের ক্লাসিক উপন্যাস
- ভিক্টোরিয়া ভিলা-আগাথা ক্রিস্টির চমৎকার একটি বই
- জাস্ট এ্যানাদার সাকার-রিচার্ড হেডলি চেজের একটি থ্রার
- আফটার দি ফিউনারেল-আগাথা ক্রিস্টির আরেকটি সেরা কাজ
- নো ওয়ান হিয়ার গেটস্ আউট এ্যানাইড-প্রখ্যাত বক গায়ক জিম মরিসনের জীবনীমূলক উপন্যাস
- কিপ দ্য ফ্রেমিং এলাইড-ম্যাকলিনের আরেকটি চমৎকার থ্রার

ঘরে বসে বাতিঘর প্রকাশনীর বই পেতে চান ?

বাতিঘর প্রকাশনী পাঠকের সুবিধার্থে এবং ৩৫% কমিশনে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের বি.পি (বুক পোস্ট) সার্ভিসের মাধ্যমে আপনার কাম্বিত বই পৌছে দেবে আপনারই ঠিকানায়। বইয়ের নাম এবং আপনার ঠিকানা বাতিঘর প্রকাশনীর ঠিকানায় পোস্টকার্ড কিংবা চিঠিতে লিখে অথবা মোবাইল কোনে মেসেজ করে পাঠিয়ে দিন। তিন চার দিনের মধ্যে আপনার ঠিকানায় বই পৌছে যাবে। বি.পি সার্ভিসের জন্যে পাঠককে আলাদা কোনো চার্জ বহন করতে হয় না। এই সার্ভিস সমগ্র দেশব্যাপী চালু আছে।

বিঃদ্র: বি.পি সার্ভিসের সমুদয় খরচ বাতিঘর প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ বহন করে থাকে, এজন্যে ক্রেতাকে কোনো ব্যয় বহন করতে হয় না, সুতরাং পোস্টম্যানকে বাতিঘর প্রকাশনীর বিল ছাড়া বাড়তি টাকা-পয়সা না দেয়ার জন্যে পাঠককে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাতিঘর প্রকাশনী

৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট, ৩য় তলা)

ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৭১৪৩৯১৩২০

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...



মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন-এর জন্ম
ঢাকায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা
ইনস্টিটিউটে এক বছর অধ্যয়ন
করলেও পরবর্তীতে ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও
সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে
মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

সাড়া জাগানো উপন্যাস দ্য দা
ভিক্সি কোড ছাড়াও তিনি
গডফাদার, দ্য সাইলেন্স অব দি
ল্যান্ডস, ডিসেপশন পয়েন্ট,
আইকন এবং দ্য ডে অব দি
জ্যাকেল সহ বেশ কয়েকটি
উল্লেখযোগ্য অনুবাদ করেছেন।
বাতিঘর প্রকাশনা থেকে শীঘ্রই
বের হচ্ছে জাঁ পল সার্ত্রের
নোবেল বিজয়ী উপন্যাস ডেডস
এবং ওয়েডস ফাইল।

বর্তমানে তিনি নিজের দৈনিক
উপন্যাস লেখার কাজে ব্যস্ত
আছেন।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন পেশায়
ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক।

কী জন্যে মোনালিসা এ বিশ্বের সবচাইতে বিখ্যাত চিত্রকর্ম? কেন?

পাঁচশত বছর ধরে ছবিটা রহস্যের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ডোনাল্ড সাসুন অনবদ্য ভঙ্গীতে মোনালিসার ইতিহাস, নান্দনিকতা, রহস্য এবং আধুনিক বিশ্বে এর প্রভাব বিবৃত করতে গিয়ে শিল্পজগতের যে চিত্র উন্মোচন করেছেন – এক কথায় তাকে অসাধারণ বলতেই হয়।

মোনালিসাকে ঘিরে যে রহস্য বিরাজ করছে তার সবটাই উন্মোচিত হয়েছে এ বইতে – নিঃসন্দেহে সঞ্চারে রাখার মতো একটি বই।

‘সীমাহীন ভাবেই চমকপ্রদ ... উপভোগ্য এবং প্রায়োগিক’

– ক্রেইগ ব্রাউন, মেইল অন সানডে

‘মনোমুগ্ধকর ... দক্ষতা আর রসবোধের সাহায্যে ডোনাল্ড সাসুন অনুসন্ধান করেছেন কিভাবে ষোড়শ শতাব্দীর এক ইতালিয় গৃহবধূ আন্তর্জাতিক এক আইকন – এ পরিণত হলো’

– মাইকেল প্রোজার, সানডে টেলিগ্রাফ

‘সাসুন এমন একটি বই লিখেছেন যা পড়ে আপনি শিল্প, খ্যাতি এবং জ্ঞানের নতুন নতুন দিকের কথা জানতে পারবেন’

– জন ডিকি, দ্য ট্যাবলয়েড

‘এটা কোনো নীরস ইতিহাসের কচকচানি নয়, বরং এটা মনোমুগ্ধকর একটি মহাকাব্য যা পাঁচশত বছর ধরে ঘুরে ফিরছে ... পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও এটা বেশ উপভোগ্য ... সাসুন এমন গভীরতা দিয়ে শিল্পজগতের একটি ছবি একেঁছেন যা পড়ার পর আপনি মোনালিসার দিকে পূর্বের দৃষ্টিতে তাকাতে পারবেন না’

– এন্ড্রু মাস্টারসন, এজ্জ (মেলবোর্ন)

‘এটা খুবই মূল্যবান একটি বই কারণ এতে কেবল মোনালিসা’র গল্পই বলা হয়নি বরং আধুনিক পৃথিবীর যে কোনো অর্জিত খ্যাতির অন্তর্নিহিত কারণটি উদ্ঘাটিত হয়েছে’

– সানডে টাইমস

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984865920-X



9 799848 659204